শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পিতার পক্ষে তার সন্তানকে উত্তম আদবের শিক্ষা দানই উৎকৃষ্ট দান। অর্থাৎ সন্তানকে ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দেওয়াই পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায়

রাফীক বিন সাঈদী

স্বত্ব

মাহদী হোসাইন সাঈদী

মুনাওয়ার হাসনাইন সাঈদী

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাঈদী

অনুলেখক

আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৫

প্রচ্ছদ

মাসউদ সাঈদী

অক্ষর বিন্যাস

শাকিল কম্পিউটার

৩২/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ

আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ১৫০ টাকা মাত্র

Shishoor Proshik-khon Poddhothee by Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-0perated by Rafeeq Bin Sayedee, Copy : Mahdee Hossain Sayedee, Transliteration : Abdus Salam Mitul, Published by Global Publishing network, 66 Paridhash Road, Banglabazer, Dhaka-1100, Frist Edition : 2005 November, Price : 150 TK Only in BD, 6 Doller in USA, 5 Pound in UK.

www.pathagar.com

যা বলতে চেয়েছি

হযরত লুকমান আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তা উল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পরিবারই হলো মানব সন্তানের শিক্ষার সূতিকাগার এবং মানব সন্তানের শিক্ষার সূচনা পরিবার থেকেই করতে হবে। পারিবারিক আচার-আচরণ, ব্যবহার সন্তানের চরিত্রে সবথেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাব হয় স্থায়ী। প্রত্যেক পরিবারে যখন শিশু আগমন করে, তখন শিশুর জীবনের প্রথম দিনগুলোয় বাকশক্তি থাকে না। শিশু তার নিজের প্রয়োজন ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিশু অনুভূতি শক্তিহীন। শিশুর অনুভূতি ক্ষমতা রয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক শব্দাবলীর মাধ্যমে সে প্রভাবিত হয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আচার-আচরণ দ্বারা শিশু সর্বাধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে।

শিশু বাকশক্তিহীন হলেও তার অনুভূতি শক্তি থাকে প্রবল এবং সে হয় অনুকরণ প্রিয়। শিশু যখন পারিবারিক পরিমন্ডলে বড় হতে থাকে তখন থেকেই তাকে তাওহীদের জ্ঞান দিতে হবে। এ জন্য সর্বপ্রথমে তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার গঠন করতে হবে। শিশু যেন পারিবারিক পরিমন্ডলেই তাওহীদের শিক্ষা লাভ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, একটি রাষ্ট্রের প্রথম স্তর হলো পরিবার। মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি হলো পরিবার আর পরিবারের সামগ্রিক তথা বিকশিত রূপই হলো রাষ্ট্র। পিতামাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তথা অনেকগুলো মানব সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি পরিবার। অনেকগুলো পরিবারের সামষ্টিক রূপই হলো সমাজ। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায়, সুসংগঠিত পদ্ধতিতে যে সমাজ গড়ে ওঠে, এসব সমাজের সমন্বিত রূপই হলো রাষ্ট্র।

সুতরাং রাষ্ট্রের ভিত্তিই হলো পরিবার। পরিবার না থাকলে সমাজ থাকে না, আর সমাজের অস্তিত্ব না থাকলে রাষ্ট্রের কল্পনাও করা যায় না। পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি আর সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত সমাজের বাস্তব ফলশ্রুতি হলো রাষ্ট্র। প্রত্যেক পরিবার থেকে আদর্শ মানুষ সরবরাহ করা হলে, সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরিবার থেকে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে, এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোক সংখ্যা গরিষ্ঠ হলে তাদের প্রভাবেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রভাবিত হতে বাধ্য। মুসলিম দেশের প্রত্যেক পরিবার যদি তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার হয় এবং সেই পরিবারে যে শিশু আগমন করবে, সেই শিশুও স্বাভাবিকভাবেই তাওহীদের শিক্ষায় প্রভাবিত হবে।

বর্তমান সমাজের প্রত্যেক পরিবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, পরিবারে যা কিছুর চর্চা হয়, সেই পরিবারে যে শিশু বড় হতে থাকে, সেই শিশুও পারিবারিক প্রভাব মুক্ত থাকে না। পিতামাতা যদি গান-বাজনা, কবিতা-সাহিত্য চর্চা করে, সেই পরিবারের শিশুর

www.pathagar.com

ঝোঁক-প্রবণতাও পিতামাতার অনুরূপ হয়ে থাকে। পিতা বা মাতা যদি চিকিৎসক হয়, তাদের শিশুও বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, খেলার ছলে নিজেকে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। পিতামাতা বা পরিবারের কোনো সদস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য হলে, সেই পরিবারের শিশুও সেই সদস্যকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যদেরকে নামায আদায় করতে দেখলে শিশু বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, পিতামাতার পাশে গিয়ে নামায আদায় করতে থাকে। যে পরিবারে পিতামাতা বিপদের সময় আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযর্গদের ডাকে, মাজারে গিয়ে মানত দেয়, সেই পরিবারের শিশুও এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। শিশু যখন দেখে তার পিতামাতা জড়পদার্থের সম্মুখে গড় হয়ে প্রণাম করছে, শিশুও তা অনুকরণ করে।

এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–প্রত্যেকটি শিশুই প্রকৃতপক্ষে মানবিক প্রকৃতির ওপরই মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতাই তাকে পরবর্তীকালে ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আমাকে গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী শিশু, কিশোর ও যুবক-যুবতীদের চরিত্র গঠন এবং কোরআনের রঙে রঙিন পরিবার গঠন সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করার তাওফীক দিয়েছেন, সেসব আলোচনার সারমর্ম এই গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিনি, পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার এবং সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকার সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কোরআন-হাদীসের আলোকে পিতামাতা নিজেদেরকে কিভাবে গঠন করবেন, সন্তানদেরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিবেন, এ বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কোরআন-হাদীস ভিত্তিক উপকরণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ এবং মানব রচিত মতবাদের উপকরণে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষের চরিত্রে যে বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি হয় এবং এর বাস্তব প্রমাণও এ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আদর্শ নাগরিক তৈরী করা নয়– আদর্শ মানুষ তৈরী করা। আদর্শ মানুষ কিভাবে এবং কোন্ উপকরণের ভিত্তিতে তৈরী হবে, তা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থ পাঠ করে একটি পরিবারও যদি আদর্শ মানুষ তৈরীর কারখানায় পরিণত হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআন-হাদীস ভিত্তিক উপকরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ার তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন– ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

www.pathagar.com

چشم اقوم سے مخفی ہے حقیقت تیری
ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری
کوکب قسمت امکاں ہے خلافت تیری
وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے
مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہوجا
رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہوجا
ہے تنک مایہ، تو ذرے سے بیاباں ہوجا
نغمۂ موج سے ہنگامۂ طوفاں ہوجا

চশমে আকওয়াম সে মাখফী হ্যায় হাকীকত তেরী
হ্যায় আভী মাহফিলে হাস্‌তী কো জরুরাত তেরী।
যিন্দাহ রাখতী হ্যায় যমানেঁ কো হারারাত তেরী
কাওকাবে কিসমাতে ইমকাঁ হ্যায় খেলাফত তেরী।
ওয়াকতে ফুরসত হ্যায় কাঁহা, কাম আভী বাকী হ্যায়
নূরে তাওহীদ কা ইতমাম আভী বাকী হ্যায়।
মেছলে বূ কয়েদ হ্যায় গনচে মেঁ পারীশাঁ হো জা
রখতে বরদোশে হাওয়ায়ে চমনিস্তা হো জা।
হ্যায় তুনুক্ মায়াহ, তু জারে সে বায়াবাঁ হো জা
নোগমায়ে মওজ সে হাঙ্গামায়ে তুফাঁ হো জা।

www.pathagar.com

বাংলা অনুবাদ

বিশ্বের চোখে আজো রয়েছে তোমার স্বরূপ সংগোপন
তোমার বিহনে হবে না খোদার পূর্ণ আত্মা-উন্মোচন।
যুগের জীবন বেঁচে আছে শুধু তোমার লহুর উষ্ণতায়
ভাগ্য-তারকা জ্বলিছে আকাশে তব খেলাফৎ প্রতীক্ষায়।
এখনো তোমার বাকী আছে কাজ, অবসর নেই বিশ্রামের,
পূর্ণ করে জ্বালাও এবার নূরের প্রদীপ তাওহীদের।
কুঁড়ির ভেতরে গন্ধ হয়ে থেকো নাকো আর বদ্ধ-দ্বার,
তোমার গন্ধে আমোদিত হোক আবার ধরার বাগবাহার।
বালুকণা হয়ে থেকো নাকো আর প্রান্তরসম হও বিশাল
মৃদু-সমীরণ হোক তোমার ঝঞ্ঝা-তুফানপ্রাণ-মাতাল

ডঃ আল্লামা ইকবাল (রাহঃ)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ১৩
উদ্দেশ্য নির্ধারণে দুটো দিক ১৪
প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ১৬
প্রশিক্ষণের উপকরণ ১৭
প্রশিক্ষণের ওহীভিত্তিক উপকরণ ২২
মানব রচিত উপকরণের ব্যর্থতা ২৪
ওহীভিত্তিক উপকরণের সফলতা ২৭
ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহারের বাস্তব ফলাফল ৩২
অটল বাস্তবতা ৪৩
প্রশিক্ষকের গুণ-বৈশিষ্ট্য ৪৮
মানব শিশুর প্রথম শিক্ষক তার মা ৫০
আদর্শ স্বামী এবং স্ত্রী নির্বাচন ৫৩
স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাপনের মূখ্য উদ্দেশ্য ৫৬
আদর্শ স্বামী-স্ত্রী ৫৯
দাম্পত্য জীবনে সন্তানের আকাঙ্খা ৬০
সন্তান সম্পর্কে হতাশার কারণ ৬৩
অনাগত সন্তান-স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ৬৮
গর্ভে সন্তান-স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ৭৪
সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে করণীয় ৭৬
শিশু সন্তানকে প্রতিপালন ৭৯
শিশুর আকীকা ৮২
পুত্র সন্তানের খাত্না ৮৪
আকীকা ও খাতনা অনুষ্ঠান ৮৪
শিশুর নামকরণ ৮৫
শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ৮৮
শিশুকে নামাযের প্রতি অভ্যস্থ করে তোলা ৯০
শিশুর অহংবোধ ও পিতামাতার আচরণ ৯৩
শিশুর প্রশংসা করার উপকারিতা ৯৫
সন্তান– সাদকায়ে জারিয়াহ্ ৯৬
শিশুর দৃষ্টিকটু অভ্যাস ৯৬

www.pathagar.com

সন্তানের প্রতি আদর-ভালোবাসা	১০০
আদর-ভালোবাসায় সমতা রক্ষা	১০৩
তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার	১০৫
হযরত লুকমান (আঃ) ও তাঁর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	১০৮
সন্তানের প্রশিক্ষণ ও হযরত লূকমান (আঃ)	১১৩
শরীক বা অংশীদারিত্বের প্রয়োজন নেই	১১৬
শিরক্ সবথেকে বড় জুলুম হবার কারণ	১২১
অধিকার সচেতন করা আল্লাহর নিয়ম	১২৩
পিতা-মাতার অধিকার	১২৮
পিতামাতার সম্মুখে সন্তানের বিনীত আচরণ	১৩১
সর্বপ্রথমে আল্লাহর হক কেনো আদায় করতে হবে	১৩৪
গর্ভধারিণী মাতার অধিকার	১৩৯
মায়ের নেক দোয়া ও অসন্তুষ্টি	১৪৩
পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা	১৪৫
সন্তানের অর্থ-সম্পদ ও পিতামাতা	১৫০
পিতামাতার অবাধ্যতা ঘৃণ্য অপরাধ	১৫২
মৃত পিতামাতার অধিকার	১৫৩
ইসলাম বিরোধী পিতামাতার অধিকার	১৫৭
পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার	১৬৫
সন্তানের প্রয়োজন পূরণ পিতামাতার দায়িত্ব	১৬৮
কন্যা সন্তান মহান আল্লাহর নে'মাত	১৭৪
সন্তান-সন্ততির বিয়ের অধিকার	১৮০
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি একত্রিত করবেন	১৮৩
প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব অর্পণ	১৯০
স্রোতের বিপরীতেই বীরের সংগ্রাম	১৯৫
অহঙ্কার বশে কাউকে অবজ্ঞা করোনা	২০৬
অহঙ্কার সবথেকে ঘৃণিত গুণ	২১১
পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না	২১৫
আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা	২২২
উপদেশ কার্যকর করার পদ্ধতি	২২৭
তরুণ-যুবকদের জন্য সর্বোত্তম উপহার	২৩২

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি সুস্থ মানব শিশুর মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। হতে পারে এই যোগ্যতা পরস্পর বিপরীতমুখী অর্থাৎ কোনোটি ইতিবাচক আবার কোনোটি নেতিবাচক। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক প্রদত্ত মানব শিশুর অভ্যন্তরে যে যোগ্যতাসমূহ রয়েছে, এসব যোগ্যতাসমূহ বিকশিত করার লক্ষ্যে যদি শিশুকে প্রশিক্ষণ ও অনুকূল পরিবেশ দেওয়া না হয়, তাহলে এর কিছুটা নিজস্ব ধারায় বিকশিত হবে অথবা এর বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে শিশু যখন বয়স সন্ধিক্ষণে উপনিত হবে, তখন দেখা যাবে যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিকের মধ্যে সমন্বয় নেই এবং উভয় দিকের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অথবা এটাও অসম্ভব নয় যে, শিশুর মধ্যে যে নেতিবাচক ও ক্ষতিকর যোগ্যতা বিদ্যমান ছিলো তা সক্রিয় হয়ে উঠেছে অথবা ইতিবাচক যে যোগ্যতা ছিলো সেটাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে শিশু মানব জীবনের যোগ্যতম সময়ে উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা-সাধনা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে এবং সফলতা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না। এ জন্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে শিশুকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণহীন মানুষের পক্ষে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা যার বা যাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে তাকে বা তাদেরকে অবশ্যই সেই প্রশিক্ষণই দিতে হবে।

ঠিক এ কারণেই সর্বপ্রথমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। স্বয়ং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী ও আকাশ এবং এর মধ্যস্থিত কোন কিছুই নিছক খেয়ালের বশে সৃষ্টি করা হয়নি। তাঁর এই সৃষ্টি কোন শিশুর খেলনার মতো নয়। শিশুদের মতো মনের বাসনা লাভ ও মন ভুলানোর জন্য কোন খেলনার মতো করে এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়নি যে, শিশু কিছুক্ষণ খেলে তৃপ্তি লাভ করার পরে উদ্দেশ্যহীনভাবে একে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল অথবা অবহেলা ভরে অনাদরে রেখে দিল বা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে দিল। নিজের দেহ থেকে শুরু করে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সাধারণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এমন ধারণা করার কোন অবকাশ থাকে না। বরং তাঁর এ সৃষ্টি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, ঐকান্তিকতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, এ কথা দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং এর প্রতিটি অধ্যায়ে লক্ষ্যও স্থির করা হয়েছে। সৃষ্টিজগতে সাধারণ মানুষ চর্মচোখে যা কিছু

www.pathagar.com

দেখতে পাচ্ছে এবং বিজ্ঞানীগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যা কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন, সবকিছুর ভেতরে প্রতিনিয়ত একটি পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে। উর্ধ্বজগত ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সৃষ্টির নিপুণতা ও বিজ্ঞ-কৌশলীর নান্দনিক নির্মাণ শৈলী দেখে এ কথা ভাবার কোন যুক্তি নেই যে, এসব কিছু শিশুর খেলার ছলে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বরং সৃষ্টিসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির ব্যাপারে গভীর উদ্দেশ্যবাদের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ–

আল্লাহ তা'য়ালা এসব কিছুই স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ইউনুস-৫)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ–لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا–اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ–

এ আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছুই রয়েছে এগুলো আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। যদি আমি কোন খেলনা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হতাম এবং এমনি ধরনের কিছু আমাকে করতে হতো তাহলে নিজেরই কাছ থেকে করে নিতাম। (সূরা আম্বিয়া)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا–

আমি আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগৎ রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি। (সূরা সাদ-২৭)

উদ্দেশ্য নির্ধারণে দুটো দিক

সেই আদিকাল থেকেই পরকালের জীবনকে সামনে রেখে মানব সমাজ পরস্পর বিরোধী দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল মানুষ ভেবেছে পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। আরেক দল যুক্তি প্রদর্শন করেছে, মানুষ পৃথিবীতে যা কিছুই করছে, এর পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিতে হবে। যারা আখিরাতের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী তাই পৃথিবীতে তাদের জীবনধারা হয় এক ধরনের আর যারা অবিশ্বাসী, তাদের জীবনধারা হয় ভিন্ন ধরনের। আখিরাতের জীবনের প্রতি বিশ্বাসীদের জীবনধারা হলো, তারা যে কোন কাজই করুন না কেন, তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের পেছনে এই অনুভূতি সক্রিয় থাকে যে, আল্লাহর কাছে বিচার দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। এই পৃথিবীতে তারা যা কিছুই বলছে এবং করছে, এসবের জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। সে যদি কোন অসৎ কথা বলে এবং

www.pathagar.com

কাজ করে তাহলে তাকে আল্লাহর দরবারে শাস্তি পেতে হবে। এই পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুর পরের জীবনই হলো আসল জীবন। সেই জীবনে তাকে সফলতা অর্জন করতে হবে। এই অনুভূতি নিয়েই সে পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সকল কাজে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে।

আর যারা আখিরাতের জীবনের প্রতি অবিশ্বাসী, পৃথিবীতে তাদের জীবনধারা হলো বল্গাহীন পশুর মতোই। তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন–

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ–

আর এরা বলে, যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (সূরা আস্ সাজদাহ্-১০)

অর্থাৎ এদের বিশ্বাস হলো, মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। নির্দিষ্ট সময়ের পরে একদিন আমরা মৃত্যুবরণ করবো, যার যার নিয়ম অনুসারে আমাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে, আমাদের দেহ যেসব উপকরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, সেসব উপকরণ এই পৃথিবীতেই যখন বিদ্যমান রয়েছে, তখন সেসব উপকরণ পৃথিবীতেই মিশে যাবে। কারো দরবারেও আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে না এবং আমাদের কোন কর্ম বা কথা সম্পর্কে কারো কাছে জবাবদিহি করতেও হবে না। আখিরাতের জীবনের প্রতি অবিশ্বাসীদের এই অনুভূতির কারণে পৃথিবীতে এদের কথা ও কাজের ব্যাপারে কোন নিয়ম অনুসরণ করে না। তার কথায় কার কি ক্ষতি হতে পারে, কে মনে আঘাত পেতে পারে এসব চিন্তা তারা করে না। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য এরা যে কোন কাজই করতে পারে। তার কাজের দ্বারা ব্যক্তি বা দেশ ও জাতি কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হলো, এ চিন্তা এদের মনে স্থান পায় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ

এরা বলে, জীবন বলতে তো শুধু আমাদের পৃথিবীর এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। (সূরা জাসিয়া-২৪)

মানুষ ইন্তেকাল করে এবং আর কোনদিন ফিরে আসে না, এটাই এদের কাছে বড় প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরে আর জীবন নেই। ইন্তেকালের পরে মানুষের দেহ পচে যায়, মাটির সাথে গোস্ত মিশে যায়। রয়ে যায় হাড়গুলো, তারপর সে হাড়ও একদিন মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষের আর কোনই অস্তিত্ব থাকে না। আখিরাতের

www.pathagar.com

জীবনের প্রতি বিশ্বাসীগণ যখন বলেন, মাটিতে মিশে যাওয়া অস্তিত্বহীন মানুষই আখিরাতের জীবনে পুনরায় দেহ নিয়ে উত্থিত হবে, তখন এদের কাছে বিষয়টি বড় অদ্ভূত মনে হয়। বিস্ময়ে এরা প্রশ্ন করে, অস্তিত্বহীন মানুষ কি করে পুনরায় অস্তিত্ব লাভ করবে? এটা অসম্ভব! সুতরাং আখিরাতের জীবন বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এদের বলা কথাগুলো মহান আল্লাহ এভাবে কোরআনে পরিবেশন করেছেন–

وَقَالُوا ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا–

তারা বলে, আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করে উঠানো হবে? (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৯)

সুতরাং উদ্দেশ্য নির্ধারণের ভিত্তি হলো মানব মনের বিশ্বাস। বিশ্বাস নানা ধরনের হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস মূলত দুইভাগে বিভক্ত। একটি হলো পৃথিবীর জীবন কেন্দ্রিক বিশ্বাস আর আরেকটি হলো পরকালের জীবন কেন্দ্রিক বিশ্বাস। যে চেতনার ওপর ভিত্তি করে মানুষের বিশ্বাস গড়ে ওঠে, পৃথিবীর জীবনের সকল কাজের উদ্দেশ্যও নির্ধারিত হয় সেই চেতনা ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই। প্রত্যেক যুগেই মানব সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে এই সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের উপকরণ এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণ ব্যতীত অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়– এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মানুষের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে বা কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানুষ নানা ধরনের পশুকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেমন পূর্বে কবুতর নামক পাখি জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে অনেকেই পত্র আদান-প্রদান করতো। এ কাজেও বিশেষ কবুতরকে প্রশিক্ষণ দিতে হতো। বর্তমানেও পৃথিবীর অনেক দেশেই বাজপাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নানা উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানার বা এ্যানিমেল পার্কের নির্দিষ্ট প্রাণীসমূহকে দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিছু কিছু পাখীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ কথা শিখানো হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কুকুরকে সংখ্যা শিখানো হয়েছে। প্রশিক্ষক বোর্ডে উল্লেখিত সংখ্যার প্রতি নির্দেশ করলে কুকুর ঠিক সেই সংখ্যা অনুপাতেই ঘেউ ঘেউ করে থাকে। কুকুর তার মালিকের সাথে বল খেলছে, পত্রিকা কামড় দিয়ে ধরে এনে দিচ্ছে, হুইল চেয়ার টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

টিয়া বা কাকাতুয়া পাখি নানা ধরনের কসরত দেখাচ্ছে। হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, গরু, ছাগল, বানর ও ডলফিন মাছ প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী নানা ধরনের ভঙ্গিসহ কসরত প্রদর্শন করে দর্শকদের চিত্ত বিনোদন করে থাকে। বাকশক্তিহীন পশু-প্রাণীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কাজ এমনিতেই সম্ভব হয়নি। প্রশিক্ষক পরম ধৈর্যের সাথে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, ফলে তাদের মাধ্যমে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের চোখের সম্মুখে অনেক প্রাণীই দেখা যায়, এসব প্রাণীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাজ আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ এদেরকে সেই পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। সাধারণত খেলার দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে যে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে খেলোওয়াড় কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনা। খেলোওয়াড় কৃতিত্ব প্রদর্শন তখনই করতে পারে, যখন সে উপযুক্ত পরিবেশে যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

প্রত্যেকটি দেশেই নানা ধরনের বাহিনী রয়েছে। সরকার যে উদ্দেশ্য যে বাহিনী গঠন করেছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও একদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর নিয়মিত লেখাপড়া করতে হয়, অপরদিকে বাস্তবে প্রশিক্ষণও গ্রহণ করতে হয়। এভাবে প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যতীত কোনো কাজই যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়।

ঠিক একইভাবে একজন মানুষ যদি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকেও আখিরাত ভিত্তিক বিশ্বাসের উপকরণসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। পিতামাতা যদি সন্তানকে দুনিয়া ও আখিরাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী দেখতে চান, তাহলে সেই সন্তানকেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়তে হবে। প্রত্যেক পিতামাতাকে একটি বিষয় স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, তেঁতুল বীজ বপন করে মিষ্টি আম খাওয়ার আশা করা চরম বোকামী বৈ আর কিছুই নয়।

প্রশিক্ষণের উপকরণ

আবারও এ কথা উল্লেখ করছি যে, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণের উপকরণ গড়ে ওঠে। স্বৈরশাসক হিটলারের লক্ষ্য ছিলো সারা পৃথিবীকে পদানত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সে জার্মানীর প্রত্যেক সুস্থ যুবকের জন্য শারিরীক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছিলো। সেই সাথে তাদের মধ্যে শৃংখলাবোধ, আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি, নির্দেশ অনুসরণ করা,

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা ও নিজেদেরকে মহাপরাক্রান্ত হিসেবে সারা দুনিয়ার সম্মুখে তুলে ধরার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলো। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন ছিলো, তার ব্যবস্থাও হিটলার করেছিলো।

বৃটেন এক সময় সারা দুনিয়া শাসন করেছে এবং দুনিয়ার শাসন দন্ড তাদের হাতে যখন ছিলো, তখনও তাদের মধ্যে এই অনুভূতি শানিত ছিলো যে, ভবিষ্যতের গর্ভে এমন একদিন লুকায়িত রয়েছে, যেদিন সূর্যরশ্মি এককভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যে পতিত হবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং যেসব দেশ তারা দখল করেছে, তা স্বাধীনতা লাভ করবে। এই অনুভূতি তাদের মধ্যে শানিত ছিলো আর এ কারণেই তারা নিজ দেশের জনগণকে দেশ ও জাতি পূজার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলো এবং বর্তমানেও সেই একই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তা তারা যথাযথভাবে ব্যবহার করছে।

বৃটেন যখন সারা দুনিয়া শাসন করেছে, তখন নিজ দেশের প্রয়োজনে এক ধরনের নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, আর অন্যান্য দেশে ভিন্ন আইন-কানুন অনুসরণ করেছে। দখলকৃত দেশসমূহে এমন পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছে যে, সেই দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়তে পারেনি। দেশ প্রেমে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সততা ও ইনসাফের প্রশিক্ষণ দেয়নি। ডিভাইড এন্ড রুল– পদ্ধতি অনুসারে তারা দখলকৃত দেশ শাসন করেছে।

অথচ নিজেদের দেশ বৃটেনে তারা এমন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ ও উপকরণ ব্যবহার করেছে যে, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নিজ দেশের নাগরিকদের মধ্যে এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। সে দেশের নাগরিক কাজে অবহেলা করে না, কোনো কাজকে ছোট মনে করে না, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ করে না, মিথ্যা বলে না, ধোকা দেয়া না, প্রতারণা করে না, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মানসিকতা বিদ্যমান। তাদের মধ্যে জনকল্যাণের উপলব্ধি ও প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছে। নিজ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধাকে ত্যাগ করার মন-মানসিকতা প্রস্তুত করা হয়েছে। এভাবে তাদের মধ্যে দেশ ও জাতি পূজার প্রশিক্ষণের যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে।

একটি বিষয় স্পষ্ট অনুধাবন করতে হবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও জীবন বিধানের সাথে ইসলামের কেনো তুলনাই করা যায় না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা

www.pathagar.com

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও জীবন বিধানকে 'জাহিলিয়াত তথা ফিত্না' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ এসব ধর্ম ও জীবন বিধানে ওহী-উপকরণ নেই। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও জীবন বিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো 'আদর্শ নাগরিক' প্রস্তুত করা কিন্তু ইসলামী জীবন বিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো 'আদর্শ মানুষ' প্রস্তুত করা।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, 'আদর্শ নাগরিক ও আদর্শ মানুষ' এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ আদর্শ নাগরিকই তো আদর্শ মানুষ বা আদর্শ মানুষই তো আদর্শ নাগরিক হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

প্রকৃতপক্ষে এ দুটো কথা বাহ্যিক দিক দিয়ে এক মনে হলেও এ দুইয়ের মধ্যে শত যোজন ব্যবধান রয়েছে। অতিতকালে মানব সভ্যতা থেকে মূর্খতা বা জাহিলিয়াতের যে অধ্যায়সমূহ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বর্তমান কালের আধুনিক মূর্খতা বা জাহিলিয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই 'আদর্শ নাগরিক ও আদর্শ মানুষ' এ দুইয়ের পার্থক্য স্থূল দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটেনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। সে সময় তারা যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলো, তা ভারসাম্যমূলক হলেও সে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছিলো আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা। তারা নিজ দেশের জন্য অবশ্যই আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে ছিলো এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এই বৃটেনের আদর্শ নাগরিকরা যখন বিশ্বের অন্যান্য দেশ দখল করে তার কর্তৃত্ব করতে বের হতো, তখন তারাই সর্বত্র চরম নির্মমতা, অমানবিকতা ও চরিত্রহীনতার প্লাবন বইয়ে দিতো। বৃটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষ, মিসর ও সুদানে তারা যে চরিত্র প্রদর্শন করেছে, তা তাদের কাছে আদর্শ নাগরিকের চরিত্র হলেও অধিকৃত দেশের জনগণের কাছে 'সাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ' মানুষের চরিত্রও ছিলো না। চরম পাশবিকতা ও হিংস্র হায়েনার রূপ তারা প্রদর্শন করেছে।

ভারতবর্ষ দখল করার পর তারা এদেশের নাকরিকদের প্রতি নীল চাষের নামে যে অত্যাচার করেছে, তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়ে ছিলো। প্রত্যেক দেশেই ঘোড়ায় আরোহণের ক্ষেত্রে জিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ অফিসাররা ঘোড়ায় আরোহণের সময় ভারতীয়দেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে বসিয়ে তাদের পিঠের ওপর পা দিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করেছে।

সাহারা মরুভূমির তবরক এলাকা দখল নিয়ে রোমানদের ও বৃটিশদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধের পর বৃটিশরা বিজয়ী হয়েছিলো। রোমানরা তবরক এলাকার চারদিকে ডিনামাইট বসিয়ে ছিলো যেনো শত্রুসৈন্য তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে।

www.pathagar.com

পরাজয় আসন্ন দেখে রোমানরা সে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। ইতোপূর্বে মরু এলাকায় ডিনামাইট ধ্বংস করার কাজে উট বা গাধা ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ যেসব এলাকায় ডিনামাইট রাখা হয়েছে, সেসব এলাকায় প্রথমে উট বা গাধার বহর পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এসব পশুরু পায়ের আঘাতে ডিনামাইট বাস্ট হয়ে পশুগুলো নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করতো ফলে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি খুব কমই হতো।

কিন্তু রোমানরা যখন তবরক এলাকা ত্যাগ করে চলে গেলো, তখন বৃটিশ বাহিনী সে এলাকায় পশুর পরিবর্তে দলে দলে ভারতীয়দের যেতে বাধ্য করলো। অসংখ্য ভারতীয় ডিনামাইটের আঘাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করলো এবং হাত-পা বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকে চিরতরে পঙ্গুত্বের জীবন গ্রহণে বাধ্য হলো। বৃটিশ বাহিনী যখন বুঝলো, ডিনামাইট ফেটে মৃত্যুবরণ বা আহত হবার আশঙ্কা আর নেই, তখনই তারা সে এলাকায় প্রবেশ করলো। এটাই হলো বৃটিশের আদর্শ নাগরিকদের উত্তম চরিত্রের নমুনা। নিরীহ মানুষকে ধ্বংস করে বৃটিশরা পৃথিবীব্যাপী নিজেদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলো।

কিন্তু এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের যাবতীয় সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য, সুন্দর স্বভাব-চরিত্র এবং মানব কল্যাণকামিতা সবই নিজ দেশ ও জাতির জন্যই নির্ধারিত। তাদের প্রশিক্ষণের উপরকণ সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা ইংরেজ জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ। বৃটেনের ভৌগলিক সীমারেখার বাইরে এলেই তাদের যাবতীয় সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রশিক্ষণের উপকরণের কারণে বৃটেনের সেই নাগরিকই ভিন্ন দেশে একজন স্বার্থপর, পরস্বার্থ লোভী, আরামপ্রিয় বিলাসী, প্রতারক, ধোকাবাজ, দস্যু-তস্কর, মিথ্যাবাদী, চোর-ডাকাত এবং সকল কুকর্মের নায়ক। নিজের স্বার্থের কারণে ভিন্ন দেশের নাগরিকের সাথে যে কোনো ধরনের কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে– এই প্রশিক্ষণই তাকে দেওয়া হয়েছে। এসব কাজ করার ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় ও মানবতাবোধের প্রশ্ন তার কাছে নিতান্তই গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়।

কারণ প্রশিক্ষণের উপকরণের মধ্যে মানবতার সেই মহান নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা ছিলো না। তাকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি যে, তুমি যেমন একজন মানুষ– পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীও তোমারই অনুরূপ একজন মানুষ। তোমার তোমার যে অধিকার রয়েছে, সেই মানুষটিরও সেই একই অধিকার রয়েছে। পৃথিবীর সকল মানুষই মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং অন্য মানুষের প্রতিও তার বিশেষ দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে, অন্যের জন্যও তাই পসন্দ করবে, নিজের জন্য যেটাকে যুলুম মনে করে, অন্যের জন্যও সেটাকে যুলুম মনে

www.pathagar.com

করবে– প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই মহান উপকরণ ব্যবহৃত হয়নি। এক কথায় মহান আল্লাহর হক ও বান্দার হক– এই মহাকল্যাণকর নীতি প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে সেখানে গ্রহণ করা হয়নি।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'। ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যিনি একবার ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন, আমৃত্যু তিনিই বন্দুকের নল ব্যবহার করে ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করেছেন। পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদী বিশ্বে 'নারী-পুরুষের স্বেচ্ছা মিলন দোষের নয়' প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে এই নীতি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সেসব দেশে পরিবার প্রথা ও পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস হতে বসেছে, জারজ সন্তানের আধিক্য দেখা দিয়েছে এবং অসংখ্য অনৈতিক কর্মকান্ড সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে যা ব্যবহৃত হবে, তারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে মানুষ এবং বাস্তব জীবনেও সে মানুষ তাই করবে, যে উপকরণের ভিত্তিতে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলো। ইসলাম ওহী উপকরণের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ ও উন্নত মানুষ গড়েছে এবং সে উপকরণ কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। এই উপকরণ মানুষ যখন খুশী তখনই ব্যবহার করে নিজেদেরকে উন্নত আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়তে পারে।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে ওহী উপকরণ ব্যবহৃত হবে এবং যে আদর্শ মানুষ তৈরী হবে, তা কোনো কৃত্রিম মানুষ নয় এবং নয় কোনো বিশেষ বিন্দুতে ও নির্দিষ্ট দেশ বা ভূখন্ডের মধ্যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী আদর্শ মানুষ। এই আদর্শ মানুষ পৃথিবীর যেখানেই যাবে, নিজ জন্মভূমির গন্ডি অতিক্রম করে যেখানেই তার পদরেণু স্পর্শ করবে, তা মুসলিম সমাজের মধ্যে হোক বা অমুসলিম সমাজের মধ্যে হোক, সকল ক্ষেত্রেই সে আদর্শ মানুষ এবং সর্বোন্নত মানবিক চরিত্রের অধিকারী এবং যাবতীয় সৎগুণের মহান সংরক্ষক। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, সামাজিক মেলামেশা ও যুদ্ধক্ষেত্রে তথা সকল স্থানেই সে তার আদর্শ সমুন্নত রাখে এবং ইতিহাস সাক্ষী, ওহী উপকরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মুসলিমরা তাই রেখেছে।

ইসলামী জীবন বিধান আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ সীমারেখার অর্থাৎ মধ্য আফ্রিকার সম্পূর্ণ এলাকার এবং এশিয়ার পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষের প্রতি কিভাবে বিজয়ী হলো? জ্ঞানপাপীরা উল্লেখ করে থাকে যে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে তরবারীর জোরে। প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, সর্বত্র ইসলাম বিজয়ী হয়েছে ওহীভিত্তিক উপকরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী আদর্শ মানুষের কারণে। ইসলামের আদর্শ মানুষগুলো যখন ঐসব এলাকায় গিয়েছে, তখন সেসব এলাকার মানুষ দেখেছে,

www.pathagar.com

মুসলমানদের নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, তাদের পরিচ্ছন্ন লেনদেন, সার্বিক আচার-আচরণে পবিত্রতা-নিষ্কলুষতা, উন্নত ব্যবহার, সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ, কথা ও কাজের অপূর্ণ সমন্বয় ও উন্নত মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য, তখনই সে এলাকার অধিবাসীরা মুসলমানদের আদর্শ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। ওহীভিত্তিক উপকরণে কোন্ ধরনের মানুষ তৈরী হয়েছিলো, তা সম্মুখের দিকে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রশিক্ষণের ওহীভিত্তিক উপকরণ

একমাত্র ইসলামী জীবন কাঠামোতেই মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহৃত হলে এর প্রভাবে মানুষ কিভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং মানব রচিত উপকরণ ব্যবহৃত হলে মানুষ কোন্ ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তার বাস্তব প্রমাণ ওহী অবতীর্ণের সূচনা লগ্ন থেকেই মানব চরিত্রে প্রতিভাত হয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের সাথে সাথেই ওহী অবতীর্ণের ধারা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওহীর যে রত্ন সম্ভার তথা কোরআন ও সুন্নাহ্ তিনি রেখে গিয়েছেন, এ দুটোকে প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে যেখানেই গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেই মানব চরিত্রে সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের পূর্বে বর্তমানের দিকেই দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মানব রচিত উপকরণ ও ওহীভিত্তিক উপরকণ ব্যবহৃত হলে মানব স্বভাবে কতটা পার্থক্য সূচিত হয়।

পৃথিবীতে অন্যের তুলনায় নিজেদেরকে সবথেকে বেশী সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হিসেবে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ দাবী করে থাকে। তারা ধনী এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে। এরপরেও এসব দেশে প্রত্যেক দিন যে সংখ্যক ভয়ঙ্কর ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়, তা কোনো কোনো মুসলিম দেশে সারা বছরেও হয় না। অনুন্নত ও গরীব মুসলিম দেশসমূহে প্রতিদিন যে সংখ্যক অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই সংখ্যক অপরাধ ঐসব দেশে প্রত্যেক মিনিটে সংঘটিত হয়ে থাকে।

২০০৫ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় আমেরিকায় সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, আমেরিকার সরকারী এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে– গত এক বছরে সেখানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ থেকে এক কোটি ৯০ লক্ষ অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সারা বিশ্বের অন্য কোনো

www.pathagar.com

দেশে এই সংখ্যক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই অপরাধের ঘটনা নাকি পূর্বের তুলনায় অনেক কম এবং অনেক অপরাধের ঘটনা অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে।

এর কারণ হলো, ঐসব দেশে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মানব রচিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। আর মুসলিম দেশসমূহের সরকার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার না করলেও দেশ ও সমাজে অনাদরে অবহেলিতভাবে ওহীভিত্তিক উপকরণের যে ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব অবশিষ্ট রয়েছে, এর প্রভাবেই মুসলিম দেশসমূহে অপরাধের সংখ্যা ঐসব দেশের তুলনায় খুবই কম। সরকারীভাবে যদি ওহীভিত্তিক উপকরণ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, তাহলে মুসলিম দেশসমূহে অপরাধের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসতো।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণের প্রধান উপকরণই হলো 'পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির অনুভূতি বা পরকাল ভীতি।' পরকাল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এত কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে তা গোটা কোরআনের একের তৃতীয়াংশ হবে। অর্থাৎ ত্রিশ পারা কোরআনের দশ পারার সমান হবে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহর কোরআনের একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কেন এত কথা বলা হলো?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, মানুষকে যে স্বভাব আর প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, তদুপরি ইবলিস শয়তান তাকে প্রতি মুহূর্তে অবৈধ পথ অবলম্বনের জন্য প্ররোচিত করছে, সুতরাং মানুষ কোনক্রমেই সৎ হতে পারে না। মানুষের বানানো কোন আইন দিয়েই মানুষের ভেতরের অসৎ প্রবণতার গতিরোধ করা সম্ভব নয়। বাঁধন যত তীব্র হয়–বাঁধন ছেঁড়ার তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়। অবৈধ পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে আইনের বাঁধন যত তীব্র হবে, এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ পথে অগ্রসর হবার মানসিকতা ততই বৃদ্ধি পাবে।

কারণ মানুষ জানে, নির্জনে একাকী কোন দুষ্কর্ম সংঘটিত করলে তা আইনের চোখে পড়বে না এবং সে সাজাও পাবে না। এ জন্য মানুষের ভেতরে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যে অনুভূতিই মানুষকে নির্জনে একাকী অপরাধ করা থেকে বিরত রাখবে। আর একমাত্র পরকালের প্রতি বিশ্বাসই সে অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। একজন মানুষের চেতনায় যখন এ কথা জাগ্রত থাকবে যে, সে যা করছে এবং যা মনের গহীনে কল্পনা করছে, এসব কিছুই মহান আল্লাহর জ্ঞানের আওতায় রয়েছে এবং এসব কিছুর জবাবদিহি তাকে মৃত্যুর পরের জগতে আদালতে আখিরাতে দিয়ে পুরস্কার বা শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। তখন সে মানুষের পক্ষে

www.pathagar.com

অপরাধ করা থেকে বিরত থাকা অতি সহজ হয়। 'মানুষ এই পৃথিবীতে যা কিছুই করছে তার প্রত্যেকটির হিসাব পরকালে মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে'– প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলাফল কি হয়েছিলো, তা দেখে অতীত যুগের চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ যেমন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, তেমনি বিস্ময় প্রকাশ করছেন বর্তমান যুগের চিন্তানায়কগণও।

মানব রচিত উপকরণের ব্যর্থতা

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহী-উপকরণ পরিত্যাগ করে মানব রচিত উপকরণের মাধ্যমে মানুষের সৎ গুণাবলী বিকশিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দিলে তা অবশ্যই ব্যর্থ হবে এবং এর প্রভাব হবে ক্ষণস্থায়ী। এর বাস্তব প্রমাণ হিসেবে আমরা আমেরিকার ঘটনাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করছি।

সেদেশের সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা দেশের নাগরিকদের মানবিক গুণাবলী বিকশিত করে দেশ ও জাতির সেবায় ব্যবহার করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য মাধ্যমকে অতীত থেকেই ব্যবহার করছে। দেশের নাগরিক বৃন্দের সুকুমার বৃত্তিসমূহ ও মানবিক গুণাবলী বিকশিত করার লক্ষ্যে তারা উপকরণ হিসেবে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার না করে মানব রচিত উপকরণ ব্যবহার করছে।

২০০৫ সালের অগাষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের টেক্সাস ও লুইজিয়ানা প্রদেশে সামুদ্রিক ঝড় হারিকেন ক্যাটরিনা ও রিটা প্রবল বেগে আঘাত করে। ফলে কয়েকটি শহর সম্পূর্ণ লন্ডভন্ড হয়ে যায় এবং জলোচ্ছাসের ফলে বিস্তীর্ণ জনপদ প্রায় বিশ ফুট পানির নীচে তলিয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতি হয় বর্ণনাতীত এবং ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে। অসংখ্য মানুষ মারাত্মক বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়ে। বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সেদেশেরই এক শ্রেণীর মানুষ চরম নারকীয় উল্লাসে মেতে ওঠে। তারা উপদ্রুত এলাকায় লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ, হত্যাসহ নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়। এমনকি বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারের জন্য সরকার যে উদ্ধারকর্মীদের প্রেরণ করেছিলো, তাদেরও কেউ কেউ বিপদগ্রস্থ নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মানব রচিত উপকরণ ব্যবহৃত হবার ফলে মানুষের স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং মানুষকে অপরাধ থেকেও বিরত রাখা যায়নি। বেশ কয়েক বছর পূর্বে মাত্র এক ঘন্টার জন্য আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিলো। এই এক ঘন্টার মধ্যে এমন কোনো অপরাধ ছিলো না,

www.pathagar.com

যা সেখানে সংঘটিত হয়নি। পত্রিকায় এ সংবাদ পাঠ করে আমার সেদিন মনে পড়েছিলো সেই দুষ্ট ছেলেদের গল্পের কথা। একদল কিশোর ছেলে পুকুরে পানির মধ্যে বেশ হুড়োহুড়ি করছে। আরেকটি কিশোর ছেলে পুকুরের পাড়ে নিরবে বসে রয়েছে।

একজন পথিক সেই পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই দৃশ্য দেখে মন্তব্য করলো, 'পুকুরের মধ্যে যে ছেলেগুলো হুড়োহুড়ি করছে ওরা দুষ্ট। আর যে ছেলেটি নীরবে পুকুরের পাড়ে বসে রয়েছে সে ছেলেটি খুবই ভালো।'

পথিক লোকটির এই মন্তব্য শুনে পুকুরের পাড়ে বসে থাকা ছেলেটি ক্ষোভের সাথে বলে উঠলো, 'আমাকে যে ভালো বলবে সে আমার শালা! আমার আজ তিন দিন জ্বর, জ্বর না হলে আমিও দেখিয়ে দিতাম হুড়োহুড়ি কাকে বলে।'

ভদ্র, সভ্য ও মানবতার দাবীদার আমেরিকা মাত্র এক ঘন্টা সুযোগ পেয়ে দেখিয়ে দিলো, তারা কতটা সভ্য-ভদ্র। দেশে অপরাধের মাত্রাধিক্যের কারণ অনুসন্ধান করে আমেরিকার প্রশাসন ও বুদ্ধিজীবী মহল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, 'মদই সকল অপরাধের স্রষ্টা। মদপান করার ফলেই মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জেগে ওঠে। অতএব মদ নিষিদ্ধ করতে হবে।'

১৯২৬ সালে আমেরিকার শাসনতন্ত্রে ১৮তম সংশোধনী এনে দেশের ত্রিসীমানায় মদের উৎপাদন, আমদানী-রফতানী, ক্রয়-বিক্রয় ও পান নিষিদ্ধ করা হলো।

মানবেতিহাসে মানব রচিত উপকরণ ব্যবহার করে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নৈতিকতা ও সামাজিক সংশোধেনের এটাই ছিলো সবথেকে বড় প্রচেষ্টা। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় প্রচেষ্টার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদ্য নিবারক এই আইন পাস হবার পূর্বে 'এ্যান্টি সেলুন লীগ' নামক একটি সংস্থা বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকেই সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে সে দেশের জনগণকে মদের অপকারিতার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছিলো। আর এই কাজে তারা অন্যান্য খাতে খরচ বাদ দিয়েই শুধুমাত্র প্রচার কাজেই আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সাড়ে ছয় কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করেছিলো।

মদের অপকারিতা সম্পর্কে তারা যেসব বই-পুস্তক প্রচার করেছিলো, তার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো প্রায় নয় শত কোটি। মদ নিষিদ্ধ আইনটি কার্যকর করতে গিয়ে চৌদ্দ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছিলো প্রায় ৬৫ কোটি পাউন্ড। দুই শত ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো, ৫ লক্ষ ৩ শত ৩৫ জনকে কারারুদ্ধ করেছিলো, ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউন্ড জরিমানা আদায় করেছিলো এবং ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের

www.pathagar.com

ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো। মদপান নিষিদ্ধ হবার পূর্বে সেদেশে মদ উৎপাদন কারখানায় নিয়মিত মদের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হতো এবং যারা মদপান করতো, তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো।

মদের যাবতীয় ক্ষতিকর দিক চুলচেরা বিশ্লেষণ করে মার্কিন কংগ্রেসে সাধারণ জনগণের সমর্থন নিয়ে ১৮তম শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী উত্থাপন করা হয়েছিলো এবং মদের অনিষ্টকারিতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেই কংগ্রেস উক্ত সংশোধনী বিলটি অনুমোদন করেছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬টি প্রাদেশ উক্ত সংশোধনী সমর্থন করেছিলো এবং প্রতিনিধি পরিষদ ও উচ্চ পরিষদ সে আইন পাস করেছিলো। এই আইনটি সেদেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাস হয়নি, মদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠন করা হয়েছিলো এবং জনগণ আনন্দের সাথে মদের বিরুদ্ধে সমর্থন দিয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবে যখন মদ নিষিদ্ধ করা হলো, তখন মানব রচিত উপকরণের মাধ্যমে দেওয়া যাবতীয় প্রশিক্ষণ ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হলো। মদের অবর্তমানে সেদেশের সভ্য-ভদ্র, জ্ঞানী, মানবতাবাদী, অধিকার সচেতন, উন্নত ও সত্যপ্রিয় বলে দাবীদার জনগণের স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেলো।

ইতোপূর্বে যারা মদের গন্ধে অভ্যস্থ ছিলো না, তারাও গোপনে মদপানে অভ্যস্থ হলো। কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী পর্যন্ত নিষিদ্ধ মদের স্বাদ গ্রহণ করা শুরু করলো। মদ নিষিদ্ধ হবার পূর্বে মদের যে মূল্য ছিলো, নিষিদ্ধ হবার পরে স্বাভাবিকভাবেই কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলো। পূর্বে সেখানে অনুমোদিত মদের কারখানা ছিলো ৪ শত। নিষিদ্ধ হবার মাত্র ৭ বছরের মধ্যে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৯ হাজার ৪ শত ৩৭ জন অবৈধ মদ কারখানার মালিককে গ্রেফতার করা হয়। ৯৩ হাজার ৮ শত ৩১ টি মদের বিক্রয় কেন্দ্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এতকিছুর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিবৃতির মাধ্যমে জানালেন, 'আমরা মদের সমস্ত গোপন কারখানা ও বিক্রয় কেন্দ্রের মাত্র এক দশমাংশ চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছি।'

মদপান নিষিদ্ধ হবার পূর্বে আমেরিকায় মদের গুণগত যে মান ছিলো, নিষিদ্ধ হবার পরে তা হ্রাস পেয়ে এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে, তা পান করা মাত্র স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া শুরু হতো। মদ্যপানের পরিমাণ সেদেশে এমন অস্বাভাবিকভঅবে বৃদ্ধি পেলো যে, পূর্বের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বছরে অতিরিক্তি ২০ কোটি গ্যালন মদপানে অভ্যস্থ হয়ে পড়লো। শুধুমাত্র নিউইয়র্ক শহরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, মদ্যপান নিষিদ্ধ হবার পূর্বে সে শহরে মদ্যপান জনিত রোগাক্রান্ত লোকদের সংখ্যা ছিলো বছরে ৩৭৪১ জন আর মৃতের

www.pathagar.com

সংখ্যা ছিলো ২৫২ জন। মদ নিষিদ্ধ হবার পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে রোগাক্রান্তদের সংখ্যা বছরে ১১ হাজার ও মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৭ হাজারে। নিকৃষ্ট ধরনের মদপানের ফলে যারা জীবন্তমৃত ও অন্যান্য খারাপ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত ছিলো, তাদের হিসাব এর মধ্যে আনা হয়নি।

মদনিষিদ্ধ হবার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিচারপতি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের ইতিহাসে ইতোপূর্বে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এত বিপুল সংখ্যক কিশোর-তরুণকে গ্রেফতারে দৃষ্টান্ত নেই।' কিশোর ও তরুণরা এমনভাবে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠেছিলো যে, আমেরিকার জাতীয় অপরাধ দমন সংস্থা থেকে তথ্য প্রকাশ করা হলো, 'অতীতের তুলনায় বর্তমানে আমেরিকার প্রত্যেক তিনজন কিশোর-তরুণদের মধ্যে একজন পেশাদার অপরাধী এবং এসব কিশোর-তরুণ অপরিণত বয়সে মদ্যপান ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত করেছে।'

মানব রচিত উপকরণে মানুষকে প্রশিক্ষণ দিলে তা কিভাবে ব্যর্থ ও অকার্যকর হয়, তা স্পষ্ট হয়ে গেলো। দীর্ঘ চেষ্টা-সাধনা, প্রচুর অর্থ ব্যয়, হত্যা, শাস্তি, জেল-জরিমানা ও ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মানব চরিত উপকরণ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে ১৯৩৩ সালে নির্বাচনের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিঃ রুজভেল্টকে ঘোষণা দিতে হয়েছিলো, ক্ষমতায় গেলে তিনি মদপান রহিত আইনটি বাতিল করবেন এবং এই ঘোষণা তার বিজয় এনে দিয়েছিলো। ক্ষমতায় গিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮তম সংশোধনী বাতিল করে মদপান বৈধ করেন।

ওহীভিত্তিক উপকরণের সফলতা

এবার আমরা এমন একটি দেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো, যেখানে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিলো এবং মানব রচিত প্রশিক্ষণের ফসল ঘরে তুলতে গিয়ে আমেরিকা যে অর্থ ব্যয় এবং অন্যান্য কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করেছিলো, সেদেশে এর কিছুই করা হয়নি। এরপরেও সেদেশের নেতৃত্ব সফলতা অর্জন করেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাঁরা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বের সেই আরব দেশটির কথা এবার কল্পনা করুন। যে যুগটিকে ইতিহাস সবথেকে বর্বর এবং অন্ধকার যুগ হিসেবে বর্ণনা করেছে। সেদেশের জনগণ ছিলো অশিক্ষিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা

www.pathagar.com

সংস্কৃতির আলো থেকে বঞ্চিত। কোনো ধরনের নিয়ম-নীতিতে তারা ছিলো অনভ্যস্থ এবং স্বেচ্ছাচারী। উচ্ছৃঙ্খলতা ছিলো তাদের রক্ত-মাংসে জড়িত। প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন, সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রচার যন্ত্রের অস্তিত্বই ছিলো না। সর্বপরি সেদেশের জনগণের কাছে মদ ছিলো জীবন ধারনের পক্ষে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন।

মদপ্রেমিক সেই অশিক্ষিত বর্বর জাতির কবিতা-সাহিত্যে মদের যে সরস বর্ণনা দেখা যায়, তা অন্য কোনো জাতির কবিতা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাদের ভাষায় মদের প্রায় ২৫০ টিরও অধিক নাম দেখা যায়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো ভাষায় মদের এত অধিক সংখ্যক না পাওয়া যায়নি। সেই জাতিকেই মানবতার মহান শিক্ষক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী-উপকরণের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিলেন। এই প্রশিক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে পৃথিবীতে ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন এবং বর্তমানেও তার প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন। ইতোপূর্বে আমরা শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত অপরাধের সামান্য কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছি এবং এ কথাও উল্লেখ করেছি যে, সেই দেশের তুলনায় মুসলিম দেশসমূহে কতটা অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, অমুসলিম দেশগুলোর তুলনায় মুসলিম দেশসমূহে মদ্যপান ও মদের উৎপাদন অনেক কম। অমুসলিম লোকজন যেভাবে মদপানে অভ্যস্থ, সে তুলনায় মুসলিমরা অভ্যস্থ নয়। ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেই, তবুও মুসলমানদের মধ্যে এই অনুভূতি প্রবলভাবে জাগ্রত রয়েছে যে, মদ্যপান অপরাধ এবং মারাত্মক ধরনের পাপ। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাদের পায়ের কাছে স্তুপ করলেও তাঁরা স্বেচ্ছায় এক ফোটা মদও গলদকরণ করতে রাজী হবেন না। স্বেচ্ছায় মদ পান করার পূর্বে তাঁরা মৃত্যুকেই অধিক পসন্দ করবেন।

এটাও সেই ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণের বাস্তব প্রভাব– এ কথা কোনো অমুসলিমও অস্বীকার করতে পারবেন না। প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের সরকার যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় ও প্রচার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করতো, তাহলে মুসলিম দেশসমূহে মদের নাম-নিশানা খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো।

এবার দেখুন, চৌদ্দ শত বছর পূর্বে সেই মদপ্রেমিক জাতির ওপরে ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রভাব কিভাবে কার্যকর হয়েছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদে নববীতে বসে রয়েছেন। তাঁর সম্মুখে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন এলো। তিনি নিরব রইলেন, কারণ ওহী ব্যতীত তিনি জবাব দেন না। মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মদ সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ-قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ-وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا-

তোমাকে প্রশ্ন করছে, মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ? বলে দাও, এই দুটো জিনিসেই বড় বড় অপকার রয়েছে, যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে। কিন্তু উভয় কাজের অপকারিতা উপকারিতার তুলনায় অনেক বেশী। (সূরা বাকারা-২১৯)

এই প্রত্যাদেশ মদ ও জুয়া সম্পর্কে কোনো নির্দেশ ছিলো না। বরং প্রত্যাদেশে মদের কল্যাণ ও অকল্যাণ, এর প্রকৃতি ও গুণাগুণ এবং ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে বলা হয়েছে, মদের মধ্যে কল্যাণের তুলনায় অকল্যাণই অধিক। প্রশিক্ষণে মদপান নিষিদ্ধ করা হলো না। অর্থাৎ ওহীভিত্তিক এই প্রশিক্ষণই দেওয়া হলো যে, মদের মধ্যে উপকারের তুলনায় অপকার অনেক বেশী। কোনো ধরনের মেধা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় না করেই প্রশিক্ষণে শুধুমাত্র এই শিক্ষামূলক ঘোষণা দেওয়ার ফলে যে প্রভাব বিস্তার করলো, মদপ্রেমিক সেই জাতির এক বিরাট অংশ তৎক্ষণাত নিজেদের জন্য চিরতরে মদপান নিষিদ্ধ করলো।

দ্বিতীয় বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মদপান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করতে গিয়ে ভুল করা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলো, তখন পুনরায় প্রত্যাদেশ করা হলো–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-

হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়োনা, নামায তখন আদায় করবে- যখন তোমরা কি বলছো, তা সঠিকভাবে জানতে পারবে। (সূরা নেসা-৪৩)

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উল্লেখিত উপকরণ পাওয়া মাত্র মদপ্রেমিক লোকজন মদপান করার জন্য সময় নির্ধারণ করলো। মদপান করার প্রতিক্রিয়া সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়। আসরের নামায ও মাগরিবের নামাযের পরে মদপান করলে এর প্রতিক্রিয়া থেকেই যায়। এশার নামাযের পরে মদ পান করলে নেশার কারণে এমন

www.pathagar.com

ঘুম জড়িয়ে ধরে যে, ফজরে নামায অনাদায় থাকতে পারে। কিন্তু নামায অনাদায় থাকবে– এ কথা তাঁরা কল্পনাই করতে পারতো না। এ কারণে কিছু সংখ্যক মানুষ ফজরের নামাযের পরে মদপানের সময় নির্ধারণ করলো। কারণ যোহর নামাযের সময় সমাগত হবার পূর্বেই মদের প্রতিক্রিয়া মুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁদেরকে মদের প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। নেশাগ্রস্ত লোকদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ফলে তারা নানা ধরনের বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় ঝগড়া, মারামারি এমনকি হত্যা পর্যন্ত সংঘটিত হয়। মদের মধ্যে এমন উপকরণ রয়েছে যা মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে ফলে মদ্যপ ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের মতো নিকৃষ্ট অপরাধ সংঘটিত হয়। এবার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক চূড়ান্ত উপকরণ সংযোজন হলো যে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ–وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا–فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ–

হে ঈমানদারগণ! মদ, জয়া, মূর্তি, পাশাখেলা ইত্যাদি হলো শয়তানের আবিষ্কৃত নোংরা কাজ, অতএব ওসব কাজ তোমরা বর্জন করো। আশা করা যায়, এসব কাজ বর্জনের ফলে তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বৈরিতা জাগিয়ে তুলতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। এটা জানার পরও কি তোমরা ওসব কাজ থেকে বিরত থাকবে না? আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং ওসব কাজ থেকে বিরত থাকো। কিন্তু তোমরা যদি অবাধ্যতা করো, তাহলে জেনে রাখো, আমার রাসূলের কাজ হচ্ছে শুধু নির্দেশকে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। (সূরা মায়িদা-৯০-৯২)

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মদ সম্পর্কে সর্বশেষ ওহীভিত্তিক উল্লেখিত উপকরণ ব্যবহৃত হলো এবং সাথে সাথে এর বাস্তব ফলাফলও দেশ ও সমাজের সর্বত্র প্রকাশিত হলো। যে জাতি মদের প্রশ্নে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলো এবং মদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির কারণে মদের আড়াই শতের অধিক নাম দিয়েছিলো, সেই

www.pathagar.com

জাতিই প্রশিক্ষিণের ওহীভিত্তিক উপকরণ লাভ করার সাথে সাথে মদের প্রতি তাদের মন-মানসিকতায় এক অবিমিশ্র ঘৃণা সৃষ্টি হলো। মদ সংরক্ষণের পাত্রসমূহ দূরে নিক্ষেপ করা হলো এবং প্রত্যেকটি পাত্র ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হলো। নগর রাষ্ট্র মদীনার প্রধান সড়ক ও গলি পথে মদের প্লাবন প্রবাহিত হলো।

প্রশিক্ষণের ওহী-উপকরণ এমনই সর্বব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো যে, একদল মানুষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মদপান করে নেশায় বিভোর ছিলো। কেউ কেউ ক্রমাগত মদপান করেই যাচ্ছিলো। মদ নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ঘোষণাটি একজন ঘোষক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মদপানরত লোকদের কানে ঘোষণাটি প্রবেশ করা মাত্র তাঁরা মদের পাত্রসমূহ উপুর করে ঢেলে দিলো এবং পাত্রগুলো ভেঙে চূর্ণ করলো। এগুলো রূপ কথার গল্প নয়– ইতিহাস, একজন লোক ঠোঁটের কাছে মদের পাত্র তুলে ধরেছে। এমন সময় উক্ত ঘোষণা তাঁর কানে প্রবেশ করলো। সাথে সাথে ঠোঁট থেকে পানপাত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং উক্ত ব্যক্তি পানপাত্র দূরে নিক্ষেপ করলো।

এটাই হলো প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহারের ফলাফল এবং অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। লক্ষ্য করুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ কয়েক বছর ব্যাপী মদের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালানো হলো, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, অপরাধ বিশেষজ্ঞ, সমাজবিদ এবং বুদ্ধিজীবী মহল ক্রমাগতভাবে মদের ক্ষতিকর দিকসমূহ আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে জাতির সম্মুখে তুলে ধরলেন। অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যম মদের ক্ষতিকর দিকসমূহ জাতির সম্মুখে প্রদর্শন করা হলো। সর্বপরি সে জাতির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে মদ নিষিদ্ধ আইন পাস করলো। এই আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মানুষ খুন করা হলো, সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করাসহ জেল-জরিমানা করা হলো। তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শক্তি আমেরিকা এই আইন নিজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। তারপরও তারা চরমভাবে ব্যর্থ হলো।

অপরদিকে মদীনার নগর রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি দিন, সেখানে মদের বিরুদ্ধে কেনো ধরনের সংস্থা গঠন করা হয়নি। কেউ এর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা চালায়নি, একটি মাত্র পৃষ্ঠার লিফলেটও ছাপা হয়নি। একজন প্রহরীও নিযুক্ত করা হয়নি। একটি কানা কড়িও ব্যয় করা হলো না। কোনো রূপ প্রচেষ্টা ব্যতীতই মানুষ এমনভাবে মদ থেকে দূরে সরে গেলো যে, মদপ্রেমিক ঐসব লোকগুলোর পক্ষে জীবদ্দশায় মদের গন্ধও গ্রহণ করা আর সম্ভবপর হয়নি।

www.pathagar.com

ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণের এটাই ছিলো অপ্রতিরোধ্য-অদম্য প্রভাব। নগর রাষ্ট্র মদীনা ও আমেরিকার উক্ত দুটো ঘটনা পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মানব রচিত উপকরণ ব্যর্থ হয় আর ওহীভিত্তিক উপকরণ কার্যকর ও সফল হয় এবং এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত মানুষগুলোর সার্বিক অবস্থা কেমন হয়, এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহারের বাস্তব ফলাফল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে গোটা মানব সভ্যতা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিলো, একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। মানবতা মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলো এবং পৃথিবী তার যাবতীয় উপকরণসহ ধ্বংসের ভীতিপ্রদ ও গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চলছিলো। রাসূলের আবির্ভাবকালে সারা পৃথিবীর অবস্থা সেই ঘরের অনুরূপ ছিলো, যার ভিত্তি এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের তীব্র আঘাতে ভঙ্গুর করে দিয়েছিলো। পৃথিবীর মানুষগুলোর অস্তিত্ব নিজেদের দৃষ্টিতেই নিজেরা যেন ছিলো নগণ্য ও মূল্যহীন। বৃক্ষ, তরু-লতা, প্রস্তরখন্ড, আগুন-পানি ও ঊর্ধ্ব জগতের গ্রহ-নক্ষত্র এবং তারকারাজিসহ বস্তুমাত্রই উপাস্য হিসাবে মানুষের কাছে পূজিত হচ্ছিলো।

মানুষের চিন্তার জগতে এতটাই স্থবিরতা ও বিশৃংখলতা নেমে এসেছিলো যে, দৈনন্দিন জীবনের স্থূল সত্যগুলো অনুধাবন করতেও তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলো এবং তাদের অনুভূতি ভুল পথে চলছিলো। স্থূল ও সহজবোধ্য জ্ঞানও তাদের কাছে সূক্ষ্ম ও অবোধগম্য এবং সূক্ষ্ম ও অবোধ্যগুলোও তাদের কাছে স্থূল ও সহজবোধ্যে পরিণত হয়েছিলো। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ও তাদের কাছে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত এবং সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়ও তাদের কাছে নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। রুচি তাদের এতটাই বিকৃত হয়ে পড়েছিলো যে, তিক্ত ও বিস্বাদ জিনিসও সুস্বাদু এবং সুস্বাদু জিনিসও তাদের কাছে তিক্ত ও বিস্বাদ বলে বোধ হচ্ছিলো। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো–ফলে বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্খীদের সাথে শত্রুতা এবং শত্রু ও অকল্যাণকামীদের সাথে ছিলো তাদের গভীর বন্ধুত্ব ও মিত্রতা।

তদানীন্তন পৃথিবীতে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, প্রতিটি বস্তুই যেন ভুল আকার-আকৃতিতে ও ভুল স্থানে সজ্জিত ছিলো। সে সমাজে অরণ্যে বসবাসের উপযোগী হিংস্র নেকড়ে তুল্য মানুষগুলোকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হয়েছিলো। সে সমাজে দুরাচারী–অপরাধীরা ছিলো সৌভাগ্যবান ও পরিতৃপ্ত আর সদাচারী চরিত্রবান লোকগুলো ছিলো অপাংক্তেয়,

www.pathagar.com

দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। সদাচরণ এবং সচ্চরিত্রতার চাইতে বড় অপরাধ ও বোকামি আর অসচ্চরিত্র ও অসদাচরণের চাইতে বড় যোগ্যতা ও গুণ সে সমাজে আর কিছুই ছিলো না।

গোটা সমাজের আচার-আচরণ ছিলো ধ্বংসাত্মক যা সারা দুনিয়াকেই ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত করেছিলো। শাসক শ্রেণী ও বিত্তবানরা অর্থ-সম্পদকে হাতের ময়লা এবং সাধারণ মানুষগুলোকে নিজেদের ক্রীতদাস মনে করতো। তথাকথিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ সাধারণ মানুষের প্রভুর আসন দখল করেছিলো। তারা সাধারণ লোকদের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করতো এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত মানবীয় গুণাবলীকে অত্যন্ত নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করা হচ্ছিলো অথবা অপাত্রে ব্যয় করা হচ্ছিলো এবং মানবীয় গুণাবলী থেকে কোনো উপকার গ্রহণ বা যথাস্থানে তা ব্যবহার করা হচ্ছিলো না। বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ব্যবহৃত হচ্ছিলো অন্যায়-অত্যাচারের ক্ষেত্রে। উদারতা ও বদান্যতা ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপব্যয় ও অপচয়ে। আত্মমর্যাদাবোধ ব্যবহৃত হচ্ছিলো অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায়। ধীশক্তি ও মেধা ব্যবহৃত হচ্ছিলো প্রতারণা ও অপকৌশলে। জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহৃত হচ্ছিলো অপরাধের নিত্য-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে এবং প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির নতুন নতুন উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে।

তদানীন্তন পৃথিবীতে মানব সম্পদ সুদূর অতীতকাল থেকেই বিনষ্ট হচ্ছিলো। সে সময় মানুষই ছিলো এমন কাঁচামাল যার ভাগ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কোনো কারিগর জোটেনি–যিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ ব্যবহার করে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন। মানুষগুলো ছিলো যেন সেই মূল্যবান শস্যক্ষেত্র, যা আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। এমন কারো অস্তিত্ব ছিলো না, সেই আগাছা উৎপাটিত করে শস্য ক্ষেত্রসমূহ শস্য ফলনের উপযোগী করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। সংগঠিত ও সুশৃংখল জাতি-গোষ্ঠী ছিলো না, রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত হতো সেই বদ্ধ উন্মাদদের দ্বারা, যারা সেই শক্তি ব্যবহার করতো ধ্বংসাত্মক পন্থায়। আরব-অনারব নির্বিশেষে সবাই অত্যন্ত বিকৃত জীবন-যাপন করছিলো।

যেসব বস্তু ছিলো মানুষের অধীন এবং পৃথিবীতে যা অস্তিত্ব লাভ করেছে মানুষেরই কল্যাণের জন্য, যেসব বস্তু মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং যাদের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি-পুরস্কার দেওয়ার একবিন্দু ক্ষমতা নেই, মানুষ সেসব বস্তুকে উপাস্য জ্ঞানে তার সামনে মাথানত করতো। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষগুলো এমন বিকৃত ধর্মের অনুসারী ছিলো, আখিরাতের জীবন দূরে থাক,

www.pathagar.com

চলমান জীবন-যিন্দেগীতে যার কোনোই প্রভাব ছিলো না এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রে, মন-মস্তিষ্কে ও আত্মার ওপর যার কোনোই ক্ষমতা ছিলো না। ধর্মজ্ঞানে তারা যা অনুসরণ করতো, চরিত্র ও সমাজ সেই ধর্ম দ্বারা আদৌ প্রভাবিত ছিলো না। তাদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব এমন ছিলো যে, যেমন একজন শিল্পী বা কারিগর তার কর্ম শেষ করে ক্লান্তিজনিত কারণে বিশ্রামের জন্য নির্জনতা বেছে নিয়েছেন এবং পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যটি সেইসব লোকদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সমাজে যারা বিত্তবান এবং ধর্মীয় আসনে আসীন। এখন তারাই পৃথিবী নামক সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিপতি। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের ভাগ্য নিয়ন্তা তারাই এবং সমস্ত কিছুই তাদের ব্যবস্থাপনাধীন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাদের ঈমান এক ঐতিহাসিক অবহিতির চেয়ে অধিক কিছু ছিলো না। ইতিহাসের কোনো ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আণবিক বোমা প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়েছিলো, ছাত্রটি তার সঠিক উত্তর দেবে বটে– কিন্তু সঠিক উত্তর বলার সময় তার মন-মস্তিষ্ক আণবিক বোমার ধ্বংস ক্ষমতার ভয়ে আতঙ্কিত হবে না এবং তার ওপর কোনো প্রভাবও বিস্তার করবে না। ঠিক তেমনি ছিলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস। মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না, ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান–তাদের দৈনন্দিন জীবনধারায় কোনো প্রভাব বিস্তার করতো না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁর প্রতি অনুরাগ, ভয়, শ্রদ্ধা ছিলো না, তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও বড়ত্বের কোনো চিত্র তাদের হৃদয়ে ছিলো না। মহান আল্লাহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিলো অস্পষ্ট, যার ভেতরে কোনো গভীরতা ও শক্তি ছিলো না। ফলে সেই ঈমানের বাস্তব রূপায়নও ছিল তাদের চরিত্রে অনুপস্থিত।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী ও রিসালাতসহ প্রেরণ করলেন, যাতে করে তিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুমূর্ষ মানবতাকে নব জীবন দান করেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। বিশ্বনবীর আবির্ভাব মানবমন্ডলীকে নবজীবন, নতুন আলোক-রশ্মি, নতুন উত্তাপ, নবতর শক্তি, নবতর প্রত্যয়, নতুন কৃষ্টি-সভ্যতা ও নতুন সমাজ দান করলো। তাঁর আগমনে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস এবং মানব জাতির কর্মে নবজীবনের সূত্রপাত হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিলেন। তিনি যে বিধান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করলেন, তা বাস্তবে অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁরা ঈমান আনলো

www.pathagar.com

তাদেরকে তিনি প্রশিক্ষণ দিলেন। প্রশিক্ষণের প্রভাবে তাদের স্বভাব-চরিত্রে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো এবং সেই লোকগুলোর দ্বারা মানব সমাজে যে বিস্ময়কর বিপ্লব সংঘটিত হলো–ইতিহাসের বুকে তা ছিলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

এই বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিলো একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, গভীরতা, বিশালতা ও সার্বজনীনতা, বিস্তৃতি এবং মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া–এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর বিপ্লবের অনন্যদিকসমূহ। রাসূল কর্তৃক সাধিত এই বিপ্লব অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোনো জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য ছিলো না। এটা ছিলো ঈমানী বিপ্লব এবং সেই ঈমান তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্লাবিত করে বাস্তব জীবনের প্রত্যেক দিক ভাসিয়ে দিয়েছিলো। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং তাঁদেরকে ঈমান ও পরকালে জবাবদিহির অনুভূতির প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন।

এই প্রশিক্ষণই তাদের দৈহিক পবিত্রতা ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এনেছিলো এবং হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি সৃষ্টি করেছিলো। মহান আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন এবং শুনছেন, তাঁর কাছে পার্থিব জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর হিসাব দিতে হবে–প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত ওহীভিত্তিক উপকরণ এই অনুভূতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো। ফলে তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর সমীপে ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত অবস্থায় দন্ডায়মান হতেন এবং রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়তেন।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ তাঁদের মধ্যে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিকতার সমুন্নতি, মনের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা, নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি এবং নফসের তথা প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে ঊর্ধ্বজগৎ ও যমীনের মালিকের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধিই করছিলো এবং তাঁদেরকে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ, ক্ষমাশীলতা ও আত্মসংযমের পথে অগ্রসর করিয়েছিলো। রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও যুদ্ধ-মারামারি তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত ছিলো এবং অস্ত্রের সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো মজ্জাগত।

ওহীভিত্তিক উপকরণ তাদের সেই হিংস্রতা ও সামরিক স্বভাব-প্রকৃতিকে এবং আরবীয় অহংবোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের সামনে তাঁরা মোমের মতোই গলে পড়তেন। সামান্যতম কাপুরুষতা যাদের চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যেতো না, তাঁরাই ওহী-উপকরণের প্রভাবে অবৈধ কাজ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নিতেন। এর প্রভাবে তাঁরা এমন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সহ্য করেছিলেন, পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায় অথবা কোনো জাতি-গোষ্ঠী সহ্য করেনি।

www.pathagar.com

পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করতে পারবে না, যেখানে কোনো ঈমানদার মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে হিংসা, জিঘাংসা, রক্তপাত, মারামারি বা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিররা মদীনার আনসারদের সাথে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলো, অথচ ঈমান ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো যোগসূত্র ছিলো না। ইতিহাসে আদর্শের শক্তি ও প্রভাবের এটাই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের প্রাণের দুশমন ছিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের পরম আপনজনকে হত্যা করেছিলো। অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তাদের ভেতরে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না এবং মমতার বাগডোরে তাদেরকে বাঁধা সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু একমাত্র ওহী-উপকরণই তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিয়ে গভীর মমতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলো। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ওহী-উপকরণে প্রশিক্ষিত হবার কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই শক্তিশালী সম্পর্কের রূপ নিয়েছিলো, যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধুত্বই ম্লান ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান চালালেও এই ধরনের নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

ওহীভিত্তিক উপকরণে প্রশিক্ষিত নবোত্থিত ঈমানদারদের এই দলটি ছিলো এক বিশাল ইসলামী উম্মাহর ভিত্তি। ঈমানদারদের এই দলের আবির্ভাব এমন এক কঠিন সঙ্কট সন্ধিক্ষণে হয়েছিলো যখন পৃথিবী ধ্বংসের একপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো। ঈমানদারদের দল পৃথিবীকে ধ্বংসের প্রান্ত থেকে সরিয়ে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো, যে বিপদ পৃথিবীর সামনে মুখ ব্যাদন করে অপেক্ষা করছিলো। ঈমানদারদের ঐ দলের আবির্ভাব পুনরায় মানব জাতির অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

ওহী উপকরণে প্রশিক্ষিত হবার কারণে তাঁদের ভেতরে দৃঢ়তা ও সংহতি, প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার অভ্যাস, জান্নাতের প্রতি অনুরাগ, জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল পিপাসা সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহর দ্বীনকে উপলব্ধি করার তৃষ্ণা এবং আত্মজিজ্ঞাসার ন্যায় সম্পদ তাদের ভাগ্যে জুটেছিলো। সুখে দুঃখে যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার অনুপ্রেরণা তাঁদের ভেতরে সৃষ্টি হয়েছিলো। যে অবস্থায়ই তাঁরা থাকুন না কেনো, ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণই তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করতো।

www.pathagar.com

এই প্রশিক্ষণ তাঁদের মধ্যে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কহীনতা খুবই সহজ-সাধ্য বিষয়ে পরিণত করেছিলো। ফলে পরিবার-পরিজনের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত সহ্য করায় তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওহীভিত্তিক উপকরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বে তাঁরা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং আল্লাহর কোরআনের অসংখ্য আদেশ-নিষেধের সাথে তাঁরা পরিচিত ছিলেন না। ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে, নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে ও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা খুব সহজ-সাধ্য বিষয় ছিলো না। কিন্তু একমাত্র ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা তাঁদের অভ্যাসে পরিণত করেছিলো। তাঁরা ঈমান আনার ব্যাপারে শুধু মাত্র কালেমা পাঠের জন্য নিজের কণ্ঠকেই ব্যবহার করেননি, বরং তাঁদের মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঈমানের ছায়াতলে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

ওহীভিত্তিক উপকরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদের কখনো মানসিক অথবা আত্মিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর রাসূল যা সিদ্ধান্ত দিতেন, সে ব্যাপারে তাঁদের সামান্যতম মতানৈক্যের অবকাশ থাকতো না। একমাত্র এই প্রশিক্ষণই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের গোপন ভুল-ভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য করতো এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাণদন্ড তুল্য সংঘটিত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করতো।

নিজের অজান্তে কোনো সময় পাশবিক শক্তি ও পশুপ্রবৃত্তির প্রভাবে তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটেছে যখন কোনো মানব চক্ষু তা অবলোকন করেনি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে আইনের ধারা-উপধারা গ্রেফতার করতে অক্ষম হয়েছে, এ অবস্থায় সেই প্রশিক্ষণই তখন তীব্র ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছে। ওহীভিত্তিক উপকরণের প্রশিক্ষণের রশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পা এমনভাবে বেঁধেছে যে, সে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

এই প্রশিক্ষণ তার মন-মস্তিষ্কে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করেছে। তার ভেতরে গোনাহর স্মরণ ও পরকালের শাস্তির বিষয়টি এমন পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তার জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে গোপনে সংঘটিত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে কঠিন দন্ড ভোগের জন্য নিজেকে পেশ করেছে। এরপর নির্ধারিত চরম দন্ড সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে এবং হাসি মুখে দন্ড ভোগ

www.pathagar.com

করেছে যেন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির মোকাবেলায় পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করে হাশরের ময়দানে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওহীভিত্তিক উপকরণই ছিলো তাঁদের আমানত, সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ।

প্রকাশ্যে-গোপনে, নীরবে-নির্জনে ও জনসমাবেশে সেই প্রশিক্ষণই ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। যেখানে দেখার মতো কেউ থাকতো না, এমন নীরব নির্জন স্থান, যেখানে একজন মানুষের পক্ষে যা খুশী তাই করার পূর্ণ সুযোগ থাকতো, যেখানে কেউ দেখে ফেলবে–এই ভয় ছিলো না–সেখানেও একমাত্র ঈমানই তাঁদের নফস তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও নিষ্ঠার এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণের শক্তির কারণেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছিলো।

তারীখে তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাওহীদের বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তুপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।'

এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, 'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'

লোকটি মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বললো, 'বিষয়টি যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, 'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে–অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো

www.pathagar.com

বিনিময় দিতে চান, তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।' কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করার ফলে প্রশিক্ষিত সে লোকগুলোর মাথা করেছিলো উঁচু এবং গর্দান করেছিলো উন্নত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তি তথা রাজা-বাদশাহ্, শাসকগোষ্ঠী, ধর্মীয় নেতৃত্ব বা সমাজের কোনো শক্তিশালী লোকের সামনে তাঁদের মাথা নত হবে–এটা ছিলো তাঁদের কল্পনার অতীত। ঈমানী চেতনা তাঁদের হৃদয় ও দৃষ্টিকে আল্লাহ তা'য়ালার মহানত্ব ও মাহাত্ম্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো। জাগতিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, পৃথিবীর চিত্তভোলা দৃশ্য ও প্রতারণাকারী বস্তুসমূহ এবং সাজ-সরঞ্জামের প্রদর্শনীর কোনো মূল্যই তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো না। তাঁরা যখন পৃথিবীর শাসকগোষ্ঠীর জাঁক-জমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির এবং তাদের দরবারের সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, তাঁরা দেখতেন–এসব শাসকগোষ্ঠী জাগতিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে পরম তুষ্ট রয়েছে।

কিন্তু তাঁদের কাছে মনে হতো, এসব রাজা-বাদশাহ্ যেন মাটির বানানো পুতুল–যাদেরকে মূল্যবান পোষাকে আবৃত করে সিংহাসনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজদরবারে যাতায়াতকারী লোকগুলো যখন রাজা-বাদশাহ্কে সিজ্দা দিতে ব্যস্ত, তখন রাজদরবারে দাঁড়িয়ে এক নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘোষণা করলেন, 'আমাদের মাথা একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে নত হয় না।'

হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কাছে দূত হিসাবে হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে প্রেরণ করলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, মহামূল্যবান বস্তু দ্বারা রাজদরবার সজ্জিত, পায়ের নীচের কার্পেট থেকে শুরু করে রুস্তমের দেহের পোষাক ও বসার আসন মহামূল্যবান মণি-মুক্তা দ্বারা সজ্জিত এবং রুস্তমের মাথায় হিরা-জহরত খচিত মুকুট। অথচ হযরত রিবঈ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পরনে সাধারণ পোষাক, তাঁর সাথে ছোট্ট একটি ঢাল আর বর্শা, মাথায় শিরস্ত্রাণ–দেহ বর্মাবৃত। তিনি রুস্তমের দরবারের সেই মহামূল্যবান গালিচার ওপর দিয়েই নিজের ঘোড়া চালিয়ে রুস্তমের মুখোমুখি হলেন। দরবারের লোকগুলো তাঁকে সামরিক সরঞ্জাম ত্যাগ করে রুস্তমের সামনে যেতে উপদেশ দিলো।

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। তোমরাই আমাকে ডেকে এনেছো। আমার অবস্থা যদি তোমাদের দরবারের উপযুক্ত

www.pathagar.com

বলে বিবেচনা না করো, তাহলে আমি এখনই ফিরে যাবো।' রুস্তম তার দরবারের লোকদের বাধা দিয়ে বললো, 'তিনি যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাতেই আসতে দাও।'

হযরত রিবঈ বর্শার সূচালু অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দরবারে বিছানো কার্পেট মাড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন আর তার বর্শার অগ্রভাগের চাপে কার্পেট কয়েক স্থানে ছিদ্র হয়ে গেলো। রুস্তমের লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করলো, 'কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছো?

তিনি ঈমানদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমরা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে সোপর্দ করার জন্যই এসেছি। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষকে বের করে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে এবং ধর্মের নামে যে জুলুম ও বাড়াবাড়ি চলছে, তা থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে টেনে নেয়ার জন্যই এসেছি।'

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ তাঁদের হৃদয়ে এমনই নির্ভীকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো–যা ছিলো বিস্ময়কর! আল্লাহর প্রেমে তাদেরকে মশগুল করেছিলো এবং জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহশীল আর পৃথিবীর জীবনের প্রতি চরমভাবে বীতস্পৃহ করেছিলো। আখিরাতের জীবন ও জান্নাতের চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সামনে এমনভাবে ভেসে উঠতো যে, সেই চিরস্থায়ী শান্তির জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা সামান্য কয়েকটি খেজুর খাওয়ার সময়ও ব্যয় করেননি, দুনিয়ার সমস্ত পিছুটানের প্রতি পদাঘাত করে শত্রু বুহ্যে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাতবরণ করেছেন। ওহী-উপকরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার কারণে তাঁরা মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।

একজন বেদুঈন ঈমান এনে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'আমি আপনার সাথে হিজরত করতে আগ্রহী।' খয়বরের যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করার সময় আল্লাহর রাসূল সেই বেদুঈনের অংশ পৃথক করে রাখলেন। তাঁকে যখন তাঁর অংশ দেয়া হলো তখন তিনি জানতে চাইলেন, 'এ সম্পদ তাঁকে কেনো দেয়া হচ্ছে?' তাঁকে জানানো হলো, 'এটা তোমার প্রাপ্য অংশ।'

সেই বেদুঈন সম্পদের অংশ হাতে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সম্পদের আশায় ঈমান আনিনি। আমি ঈমান এনেছি যেন আমার কণ্ঠে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয়, আমি শাহাতাদবরণ করি এবং জান্নাতে যেতে পারি।'

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তোমার চুক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি তোমার আকাঙ্খা পূরণ করবেন।' যুদ্ধ শেষে সেই বেদুঈনের লাশ যখন পাওয়া গেলো, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আল্লাহর সাথে তাঁর চুক্তি সঠিক ছিলো, আল্লাহও তাঁর আশা পূরণ করেছেন।'

ওহী উপকরণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পূর্বে এসব লোকগুলো কী বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই না করছিলো! তাঁরা কোনো নিয়ম-পদ্ধতি, জীবন বিধানের পরোয়া করতো না এবং কোনো শক্তির আনুগত্যও করতো না। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে পরিচালিত করতো, তারা সেদিকেই ছুটে যেতো। ভ্রান্তির বেড়াজালে ছিলো তারা বন্দী। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা ও এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

তাঁরা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করতেন। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দিয়েছিলো। মহান আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে ঈমানের রঙে রঙিন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের অর্থ, সম্পদ, শক্তি-মত্তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার মালিক মনে করতেন না এবং এগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারও করতেন না। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা, অনুরাগ-বিরাগ, লেন-দেন, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অধীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ঈমানের দাবি অনুসারে স্পন্দিত হতো। তাঁরা নিশ্বাস গ্রহণ করতেন ঈমানের দাবি অনুসারে এবং তা ছাড়তেনও ঈমান নির্দেশিত পন্থায়। ঈমানের বিপরীত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা জাহিলিয়াতের ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা ঈমানের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। একদিকে মানুষের প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মহান আল্লাহর গোলামী। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো, আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর

www.pathagar.com

গোলামীকে কবুল করতে হবে। আমি যখনই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখনই আমার আমিত্ব বা মতামত বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোনো কাজ আর করা যাবে না। ঈমান আনার পরে আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই।

ঈমান আনার পরে রাসূলের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। ঈমানের বিপরীত বিধানের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না বা নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় সমাজ ও দেশে প্রচলিত কোনো প্রথার অনুসরণ করা যাবে না। ঈমান আনার পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না বা আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকা যাবে না। এসব দিক তাঁরা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যখনই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তখনই জাহিলিয়াতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, নীতি-পদ্ধতি ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করেছিলেন–ফলে তাঁদের জীবনে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। ফুযালা নামক এক ব্যক্তি রাসূলের হাতে হাত দিয়ে ঈমান আনার পরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে এক মহিলার সম্পর্ক ছিলো। পথে সেই মহিলার সাথে দেখা হলে মহিলা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত ফুযালা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'এখন আর সেই সুযোগ নেই, আমি ঈমান এনেছি–আমি আল্লাহর গোলাম, এখন আর তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো অবকাশ নেই।'

ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণ তাঁদের মধ্যে মানবতার সকল শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও দৃশ্যমান করেছিলো। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানে নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তাঁরা শাসক হিসাবেই থাকুন অথবা রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী হিসাবে, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, বিনয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখতে পাওয়া যেতো।

প্রতিপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো, 'রাতে তাঁদেরকে দেখতে পাবে যেন পৃথিবীর সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো কাজই নেই। আর দিনের বেলা দেখতে পাবে, রোযাদার হিসাবে ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে। তাঁরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য প্রদান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের

www.pathagar.com

ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে, শত্রুকে পরাজিত করেই যুদ্ধে বিরতি দেয়। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এবং মনে হবে যে, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করাই যেন তাঁদের একমাত্র কাজ।' প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে ওহী-উপকরণ গ্রহণ করার কারণেই সেসব মানুষের গোটা জীবনে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করেছিলো।

অটল বাস্তবতা

ওহীভিত্তিক উপকরণে প্রশিক্ষিত মানুষ এবং মানব রচিত উপকরণে প্রশিক্ষিত মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের পার্থক্য সূচিত হয়, তা আমরা সমাজে প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যক্ষ করছি। আমরা যে এলাকায় বসবাস করছি, সেই এলাকার থানায় নানা ধরনের অপরাধিদের তালিকা রয়েছে। অপরাধিদের এই তালিকায় মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী লোকদের সংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিন।

চুরি-ডাকাতি, হত্যা-ধর্ষণ, পকেটমার, লুঠতরাজ, জবরদখল, আত্মসাৎ, ছিনতাই, রাহাজানি, মাতলামি ইত্যাদি ধরনের অপরাধিদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিত কতজন আর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী কতজন, এর সংখ্যা বেরিয়ে আসবে। ইনশাআল্লাহ এসব অপরাধিদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের সংখ্যা নিতান্তই কম দেখা যাবে। কারণ মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণের উপকরণ হিসেবে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহৃত হয় এবং এ কারণেই তাদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা কম।

এখন পর্যন্ত মাদ্রাসা ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। শিক্ষকদের পরনের পোষাক পরিষ্কার করে দেওয়া, তাদের অজুর পানি এনে দেওয়া এবং পরিপাটি করে বিছানা সাজিয়ে দেওয়াসহ অন্যান্য কাজ পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সাথে করে দেয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব চিত্র অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুবই বিরল। শুধু বিরলই নয়– পড়া না পারার কারণে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রকে শাসন করার অপরাধে (?) শিক্ষককে সেই ছাত্রের হাতে প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্তও আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহৃত না হয়ে মানব রচিত উপকরণ ব্যবহৃত হবার ফলে অতীতেও যেমন মানুষ সুসভ্য হয়নি, বর্তমানেও হচ্ছে না এবং আগামীতেও হবে না। এ সম্পর্কে আমরা অতীত ইতিহাস থেকে একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করেই মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হবো ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

১০৯৯ সালে জেরুজালেম দখল করলো খৃষ্টশক্তি। জেরুজালেমের অধিবাসী ৭০ হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধদের একজনকেও তারা জীবিত রাখেনি। মাত্র কয়েক ঘন্টার তান্ডবে জেরুজালেম নগরী খৃষ্টানদের পৈশাচিকতায় মুসলিম শূন্য হয়ে গেলো। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তারা উপকরণ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করেছিলো এবং এর প্রভাবে তারা এমনভাবে প্রভাবান্বিত ছিলো যে, আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করার মতো একজন মানুষকেও তারা জেরুজালেমে জীবিত রাখেনি। শুধু তাই নয়– মুসলমানদের হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, মুসলমানকে হত্যা করা এবং লাশ নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করা তারা মহাপূণ্যের কাজ বলে মনে করে। বর্তমান পৃথিবীতেও এ ধরনের ছবি প্রিন্টিং ও ইলোক্ট্রনিক মিডিয়ায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে যে, নির্মম নির্যাতনে মুসলমানকে হত্যা করে সে লাশের ওপর পা রেখে তারা উল্লাসভরে ছবি উঠাচ্ছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে উপকরণ ব্যবহৃত হবে, তার প্রভাব এভাবেই মানব চরিত্রে প্রকাশ পেতে বাধ্য।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহী ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহৃত হলে তার প্রভাবে মানব চরিত্রে কোন্ ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় দেখুন। মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেলো। ১১৮৭ সালে মুসলমানরা জেরুযালেম পুনরুদ্ধার করলো। ইতিহাস সাক্ষী, একজন খৃষ্টানের শরীরেও মুসলিমরা হাত তোলেনি এবং তাদের কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আল কোরআনের অনুসারী মুসলিমরা। ৮৭ বছর পূর্বেই এই খৃষ্টানরা জেরুযালেম দখল করে অত্যন্ত লোমহর্ষক পন্থায় ৭০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছিলো, কিন্তু মুসলমানরা যখন জেরুযালেম পুনরুদ্ধার করলো, তখন তাঁরা সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠা করলো। এর কারণ হলো, এসব মানুষের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে 'আল্লাহর হক ও বান্দার হক' এই মহান নীতিকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো।

১০৯৯ সালে খৃষ্টশক্তি জেরুযালেম দখল করে পাদ্রী গডফ্রের নির্দেশে হিংস্র হায়েনার মতোই অগণিত শান্তি প্রিয় মুসলমানদের হত্যা করেছিলো, ১১৮৬ সালে খৃষ্টান অধিনায়ক রেজিনাল্ড এন্টিয়ক নগরী দখল করে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালো– মুসলমানদের রক্তে এন্টিয়ক নগরীর পায়ে চলা পথসমূহ পিচ্ছিল হয়ে উঠলো। মুসলমানদের ওপর খৃষ্টানদের নির্মম অত্যাচার দেখে ওহী ভিত্তিক প্রশিক্ষণের উপকরণে প্রশিক্ষিত সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ) ৯০ বছরের পুরনো খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

www.pathagar.com

সিন্ডিনের দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফিলিস্তিনের লুবিয়া নামক গ্রামের সন্নিকটবর্তী রণপ্রান্তরে তাওহীদের সৈন্যবাহিনী বাতিলশক্তি খৃষ্টবাহিনীর মুখোমুখী দন্ডায়মান হলো। রক্তক্ষয়ী প্রচন্ড যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর দাপটের মুখে বিশাল খৃষ্টবাহিনী তৃণখন্ডের মতোই ভেসে গেলো এবং শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হলো। খৃষ্টানদের জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে প্রমুখ অধিনায়কসহ স্বয়ং রাজা ও তার ভাই সুলতান সালাহ্উদ্দিনের হাতে বন্দী হলেন।

যুদ্ধে বিজয়ী সালাহ্উদ্দিন তাইবেরিয়াস নগরীতে প্রবেশ করলেন। ধীর স্থির শান্ত পদক্ষেপে তিনি নগর পরিদর্শন করছেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় নেই কোনো প্রতিহিংসার চিহ্ন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে খৃষ্টানরা জেরুযালেম ও এন্টিয়ক নগরী দখল করে আত্মসমর্পণকারী হাজার হাজার মুসলিম নরনারী ও শিশুকে যে নির্মমভাবে আগুনে জ্বালিয়ে, অস্ত্রের আঘাতে, পানিতে ডুবিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলো, সে স্মৃতি হৃদয়পটে ভেসে উঠে সালাহ্উদ্দিনের দৃষ্টিকে শুধু অশ্রুসজলই করেছিলো, হৃদয়-মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দেয়নি। এর একমাত্র কারণ হলো, তিনি তো সেই মানুষ– যিনি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোরআনুল কারীমকে উপরকণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিহাস সাক্ষী, সেদিন তাইবেরিয়াস নগরীতে মুসলমানরা প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনাও করেনি, একজন খৃষ্টানের শরীরে ফুলের আঘাতও সেদিন করা হয়নি। আর এন্টিয়ক নগরীতে খৃষ্টানরা যেখানে শহীদ মুসলমানদের লাশ কবর থেকে তুলে মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে এন্টিয়কের রাস্তায় বন্য জংলী নৃত্য উল্লাস করে বেড়িয়েছিলো, সেখানে সুলতান সালাহ্উদ্দিন তাইবেরিয়াসের পরাজিত বন্দী খৃষ্টান রাজাকে হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে প্রাণ শীতলকারী ঠান্ডা শরবত পান করিয়েছিলেন।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহী ভিত্তিক উপরকণ ব্যবহারের প্রভাব দেখুন, রণপ্রান্তরে একজন মুসলিম সৈন্যের অস্ত্রের আঘাতে খৃষ্টসম্রাট রিচার্ডের ঘোড়া ধরাশায়ী হলো। মুসলিম হত্যাযজ্ঞের অন্যতম নায়ক নরপশু রিচার্ডকে নিজ আয়ত্তে পেয়ে মুসলিম সৈন্য তার দিকে শানিত তরবারী হাতে ছুটে গেলো। রিচার্ড– এই সেই নিষ্ঠুর রিচার্ড, যে রিচার্ড মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 'একর' নগরীতে ৫ হাজার মুসলিম শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ ও নারীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর-লোমহর্ষক নির্যাতন করে দুনিয়া থেকে চিরদিনের মতো বিদায় করে দিয়েছিলো। এই নিষ্ঠুর-সন্ত্রাসী লোকটির বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক 'লেনপুল' মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত'। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক 'গিবন' চিহ্নিত করেছেন, 'শোণিত পিপাসু' হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায়, 'মানব জাতির নির্মম চাবুক'।

www.pathagar.com

রণপ্রান্তরে নরপশু রিচার্ডকে ধরাশায়ী দেখতে পেয়ে মুসলিম বাহিনী ঘিরে ধরলো তাকে হত্যা করার লক্ষ্যে। রিচার্ড নিজেকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করছে। মুসলিম বাহিনীও তাকে বেষ্টন করে ক্রমশ বৃত্ত ছোট করে আনছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই নরপশুর জীবন প্রদীপ মুসলিম সৈন্যদের হাতে নির্বাপিত হতো।

এমন সময় মহানুভবতার মূর্ত প্রতীক গাজী সালাহ্উদ্দিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো নিষ্ঠুর লোকটির অসহায়ত্বের দিকে। দূর থেকে তিনি খৃষ্ট নরপশুর অসহায়ত্ব ও আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে ব্যথিত হলেন। শোণিত পিপাসু কাপালিক রিচার্ডের পাশব আচরণের স্মৃতি তাঁর হৃদয়পটে ভেসে উঠলো। তবুও লোকটির বীরত্বের কথা স্মরণ করে মহামতি সালাহ্উদ্দিন তাঁর প্রতি সদয় না হয়ে পারলেন না। অথচ তরবারীর সামান্য আঁচড়েই তিনি রিচার্ডকে মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে প্রেরণ করতে পারতেন। কিন্তু বিপদাপন্ন শত্রুর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিলো বলেই তিনি মানবতার শত্রু রিচার্ডকে হত্যা করলেন না।

যুদ্ধের ময়দানে সেদিন যুদ্ধের বাহন ঘোড়ার মারাত্মক সঙ্কট ছিলো। তবুও সুলতান সালাহ্উদ্দিন আরবীয় তেজস্বী দুটো ঘোড়া রিচার্ডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মানবতার ইতিহাস ম্লান করে দিলেন সালাহ্উদ্দিন– ওহী উপকরণে প্রশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠী এভাবেই ইতিহাসের প্রত্যেক বাঁকে মানবতাই শুধু প্রদর্শন করেছে, মুসলমানদের সেই নির্মল-নিষ্কলুষ মানবতাকে নিষ্ঠুর পায়ে বার বার পদদলিত করেছে ইয়াহূদী, খৃষ্টান আর পৌত্তলিকরা। রিচার্ডের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। সালাহ্উদ্দিনের উপহার আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করে সেই উপহারকেই মুসলিম হত্যার মাধ্যম বানালো নরপশু রিচার্ড। নরঘাতক রিচার্ড মুসলমানদের দেয়া ঘোড়ায় আরোহণ করে নতুন শক্তিতে অস্ত্র হাতে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই যুদ্ধের কিছুদিন পরেই রিচার্ড রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলো। যুদ্ধক্লান্ত পরাজিত খৃষ্টবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য তাকে পরিত্যাগ করে স্বদেশের পথ ধরলো। শয্যাশায়ী রুগ্ন রিচার্ডকে সুলতান সালাহ্উদ্দিন ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি করলেন এর বিপরীত কাজ, গোপনে তিনি রিচার্ডের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং লোকটির জন্য প্রত্যেক দিন সুস্বাদু ফল ও সুশীতল পার্বত্য বরফ প্রেরন করতে থাকলেন।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ ব্যবহৃত হলে প্রত্যেক যুগেই সালাউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)-এর মতো মহামানবই দেশ ও জাতি লাভ করবে। যেদিন থেকে

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ওহীভিত্তিক উপকরণ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং এর স্থান দখল করেছে মানব রচিত উপকরণ, সেদিন থেকেই দেশ ও সমাজের সর্বত্র হিংস্র হায়েনার বিচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নরপশু রিচার্ডের পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছে।

মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত দিক থেকে তথা জীবন-যাবনের উপকরণের ক্ষেত্রে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে যতোই উন্নতি ও উৎকর্ষতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করুক না কেনো, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যদি ওহীভিত্তিক উপকরণ গ্রহণ না করে, তাহলে মানুষের অবাধ্য প্রবৃত্তির ওপরে মানুষ কখনোই বিজয়ী হতে পারবে না। প্রত্যেক মুহূর্তে তার ওপরে প্রবৃত্তির অদম্য আকাঙ্খা চেপে বসবে। মানুষের প্রবৃত্তি যে জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সে জিনিসের ক্ষতিকর দিক যতোই তার সম্মুখে তুলে ধরা হোক না কেনো এবং এবং এর নির্মম পরিণতি যতোই সে নিজ চোখে দেখুক না কোনো, তবুও সে ঐ ক্ষতিকর জিনিসের প্রতি প্রকাশ্যে বা গোপনে ধাবিত হবেই।

বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, শিক্ষা বা মানব রচিত যে কোনো নৈতিক চেতনাই মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করা হোক না কেনো, 'ওহীভিত্তিক উপকরণ-আখিরাতের ভীতি' অনুপস্থিত থাকলে সমস্ত চেতনা বা প্রশিক্ষণই যে ব্যর্থ হবে তা মানব সভ্যতা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে। একমাত্র এবং কেবলমাত্র মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মহান আল্লারহ ভয় তথা আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি। প্রশিক্ষণে যতক্ষণ এই উপকরণ ব্যবহার না করা হবে, ততক্ষণ মানুষ নৈতিক দিক থেকে বারবার ব্যর্থ হতেই থাকবে এত সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই এবং এটাই অটল বাস্তবতা।

সুতরাং নিজেকে এবং অন্যকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে হলে, ফিরে আসতে হবে ওহীভিত্তিক উপকরণের দিকে এবং এরই ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। আমি এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করেছি, তা এ লক্ষ্যেই করেছি যে, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন্ উপকরণ ব্যবহৃত হলে কোন্ ধরনের মানুষ লাভ করা যাবে। ইতিহাস থেকে নানা ধরনের ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরেছি এ জন্যই যে, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন্ উপকরণ ব্যবহার করা হবে, এ ব্যাপারে জাতীয় নেতৃত্ব এবং মানুষের প্রথম শিক্ষক পিতামাতা বিষয়টি উপলব্ধি করবেন ও নিজ সন্তানকে ওহীভিত্তিক উপকরণের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ-জাতিকে সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)-এর মতো মহামানব উপহার দিবেন।

www.pathagar.com

প্রশিক্ষকের গুণ-বৈশিষ্ট্য

এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, মানব শিশু নিতান্তই একটি কর্দমাক্ত মাটির পিন্ড বিশেষ। নরম মাটির পিন্ডকে যেভাবে খুশী শিল্পী সেভাবেই তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মাটির এই পিন্ডটি চৈত্র-বৈশাখ মাসের প্রচন্ড রোদে শুকিয়ে যখন শিলাখন্ডের আকার ধারণ করে, তখন সে মাটির পিন্ডকে যথেচ্ছা ব্যবহার করা যায় না। এ জন্যই প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম কাল হলে শৈশব-কৈশোর কাল। এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সবথেকে উপযুক্ত সময়।

এই সময়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়েই শিশুর সেই প্রকৃতি বিকশিত করার তাগিদ দিয়েছেন, যে প্রকৃতির ওপর মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে এই প্রকৃতি প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সে মহান আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং নিজেকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর অবতীর্ণ করা দ্বীনের অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলবে। শিশু যখনই কথা বলতে শিখবে, তখনই তাকে শিক্ষা দিতে হবে সেই মহান সত্তা সম্পর্কে– যিনি তাকে একান্ত দয়া করে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে হাদীসে তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

মানুষকে যে প্রকৃতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রকৃতি বিকশিত করার সূচনা করতে হবে শৈশবকাল থেকেই। শিশুর এই সময়টির প্রতি যদি অবহেলা করা হয়, তাহলে পরবর্তীকালে পিতামাতাকে অবশ্যই আফসোস করতে হবে এবং আদলাতে আখিরাতে সেই মানব শিশু অবশ্যই তার পিতামাতাকে দায়ী করবে। সুতরাং শিশুকে যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতামাতা বা অন্য কোনো অভিভাবক যে-ই হন কেনো, তাকে অবশ্যই সেই গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে, যে গুণ-বৈশিষ্ট্য শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে।

যে আদর্শ শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং যে আদর্শের ভিত্তিতে শিশুর যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য বিকশিত করা হবে, সেই আদর্শের বাস্তব নমুনা হতে হবে শিক্ষককে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ–

তোমরা অন্য লোকদের তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজেরা ভুল যাও? (সূরা বাকারা-৪৪)

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অন্য আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ-كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ-

তোমরা কেনো সেই কথা বলো যা বাস্তবে করো না? আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা করো না। (সূরা আস-সফ্-২-৩)

অর্থাৎ যে আদর্শের ভিত্তিতে শিশুকে গড়ার প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে, প্রশিক্ষককে সেই আদর্শের বাস্তব নমুনা হতে হবে। প্রশিক্ষকের মধ্যে সেই আদর্শের অনুপস্থিতি থাকলে শিক্ষার্থীর ওপর প্রশিক্ষকের কোনো প্রভাবই পড়বে না।

প্রশিক্ষককে অবশ্যই অসীম ধৈর্য ও বিনয়ী হতে হবে। মনে রাখতে হবে, কঠোরতা অবলম্বন করে শিশুকে কোনো কিছুই শিখানো যাবে না। শিশুর সাথে কথা বলা ও অন্যান্য আচরণের ক্ষেত্রে মমতার প্রকাশ ঘটাতে হবে। কর্কশ কণ্ঠে শিশুর সাথে কথা বলা যাবে না এবং ধমকের সুরে তাকে আদেশ দেওয়াও যাবে না। শিশু মনে ভীতি সঞ্চার করে কোনোভাবেই শিশুকে আদর্শ মানুষে পরিণত করা যাবে না। সবথেকে কঠিন কাজ হলো শিশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এ জন্য প্রশিক্ষককে অবশ্যই কোমল কণ্ঠ, অসীম ধৈর্যের, সর্বোত্তম কৌশল, বিনয়ী ও মায়া-মমতার অধিকারী হতে হবে। প্রশিক্ষণের সময় শিশুর সাথে একান্তই বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে।

প্রশিক্ষক যদি শিশুর কাছে নিজের ব্যক্তিত্বকে বড় করে রাখেন, তাহলে তার কাছ থেকে শিশু কিছুই শিখতে পারবে না। ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ যথাস্থানে অবশ্যই ঘটাতে হবে, কিন্তু কোমল-কচি শিশুর কাছে নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বিশাল ব্যক্তির অধিকারী কোনো মানুষ মহান আল্লাহ তা'য়ালা আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে সৃষ্টি করেননি। তিনি যখন শিশুদের সাথে মিশতেন, তখন তিনি যেনো শিশুই হয়ে যেতেন। কত সুন্দর পদ্ধতিতে তিনি শিশুকে শিক্ষা দিতেন।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একান্ত শিশু বয়সে আল্লাহর নবীর ঘরে গিয়েছিলেন। অন্য শিশুদের সাথে নিয়ে তিনি নানা ধরনের খেলনা নিয়ে খেলতেন। শিশুদের খেলা দেখলে তাঁর পবিত্র চেহারায় চাঁদের হাসি ফুটে উঠতো। শিশুদের সাথে তিনি সত্যাশ্রয়ী কৌতুক করতেন। পবিত্র হাঁটু ও হাতের তালুর ওপর ভর করে তিনি নীচু হতেন আর তাঁর পিঠের ওপর শিশু হাসান ও হোসাইনকে উঠিয়ে নিয়ে খেলতেন। চারজানু হয়ে বসে শিশু আনাস ও উসামাকে তিনি পবিত্র কোলের ওপর

www.pathagar.com

বসাতেন। হযরত আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, শিশু অবস্থায় আমি আল্লাহর নবীর উরুর ওপর বসেছিলাম। সম্মুখে খাদ্য পাত্র ছিলো, আমি সে পাত্রের এখান-ওখান থেকে খাদ্য উঠিয়ে খাচ্ছিলাম। আল্লাহর নবী মমতা জড়িত কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'বাবা, বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করে ডান হাত দিয়ে তোমার সম্মুখের দিক থেকে উঠিয়ে খাও।'

হযরত উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শিশু অবস্থায় প্রায়ই আল্লাহর নবীর কোলে থাকতেন। আল্লাহর নবী নামাযে দাঁড়ালে তিনি পবিত্র কাঁধে উঠে বসতেন, রুকু এবং সিজদায় যাবার সময় আল্লাহর রাসূল শিশুটিকে নামিয়ে তারপর সিজ্দা দিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে উপহার দিতেন। সুতরাং শিশুদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং স্নেহ-ভালোবাসার মধ্য দিয়েই তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যদি দেখা যায় যে, একটি জিনিস বারবার শিখানোর পরেও শিশু তা আয়ত্ব করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে বিরক্ত হয়ে শিশুর প্রতি রূঢ় আচরণ করা যাবে না। অসীম ধৈর্যের সাথে দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিশু বারবার প্রশ্ন করবে, অতিরিক্ত কথা বলবে বা নানা ধরনের দুষ্টামি করবে। এতে বিরক্ত হওয়া যাবে না বা শিশুকে প্রহার করা যাবে না। একান্ত মায়া-মমতা দিয়ে প্রশিক্ষণের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

মানব শিশুর প্রথম শিক্ষক তার মা

পশু-শাবক ও মানব শিশু– এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখুন। কতক পশু-শাবক মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই চলাফেরা করতে পারে। নিজের সুবিধা-অসুবিধা ও বিপদ সংকেত অনুভব করতে পারে। নিজে যেমন খেতে পারে এবং খাওয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু মানব শিশু এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মানব শিশু সবথেকে অসহায়। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লেও একমাত্র কান্না ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ভাষা তার নেই। একস্থান থেকে আরেক স্থানে সে সরেও যেতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে সে থাকে পরনির্ভরশীল।

এ অবস্থায় মানব শিশুর জন্য একমাত্র মা অথবা একান্ত আপনজন ব্যতীত তার অবস্থা অনুভব করার মতো আর কেউ থাকে না। ক্রমশ শিশু বড় হতে থাকে এবং এ সময়ই তাকে একটু একটু করে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। আর এ সময় প্রশিক্ষক হিসেবে সবথেকে বড় ভূমিকা পালন করেন শিশুর পিতামাতা। এ ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতার দায়িত্বই সর্বাধিক। কারণ পিতা গৃহের বাইরে নানা ঝামেলায় ব্যস্ত থাকে এবং পিতার প্রতি দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে অর্থ উপার্জনের। ইসলাম মা'কে এ দায়িত্ব

www.pathagar.com

থেকে অব্যহতি দিয়েছে। কারণ মা যেন সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সন্তানের যত্ন নিতে পারে, শিশুর মানসিক বিকাশের শুরু থেকেই শিশুকে আল্লাহর একজন দাস হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এ সময়টিই মায়ের পরীক্ষা ক্ষেত্র। এখানেই মায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা। সন্তানের যখন শারিরীক ও মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে।সে সময় সন্তানের মানসিক বিকাশ যেন ইসলামের নির্দেশিত পথেই ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখা মায়ের প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব একজন মা কিভাবে পালন করেছে এ ব্যাপারে আদালতে আখিরাতে তাকে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। মানবতার শিক্ষক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্বামীর গৃহের জিম্মাদার ও তত্ত্বধায়ক হলো নারী। যে সমস্ত মানুষ ও জিনিসের হেফাজতকারী হিসেবে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

এক কাজটি যেমন কঠিন তেমনি সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ। একজন শিশুকে সর্বোত্তম মানুষে রূপান্তরিত করা, এ যে কতবড় মর্যাদার কাজ তা কল্পনাও করা যায় না। এই কাজটিই ইসলাম অর্পন করেছে একজন মায়ের উপরে তথা নারী জাতির প্রতি। পুরুষের কার্যাবলীতে নারীকে ইসলাম জড়িত করেনি এবং বাহ্যিক দিক থেকে নারীকে বোঝা মুক্ত করে তার ওপরে সবথেকে কঠিন বোঝাটিই ইসলাম চাপিয়ে দিয়েছে। সে কঠিন বোঝাটি হলো দেশ-সমাজ ও মানবতার জন্য উপযুক্ত মানুষ সরবরাহের বোঝা, অর্থাৎ নারীকে আল্লাহ তা'য়ালা মানব গড়ার কারিগর বানিয়েছেন।

নারী যখন এই দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে বা তাকে দায়িত্বের এই গন্ডি থেকে বের করে ভিন্ন দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে মানব সমাজে আদর্শ মানব সরবরাহে ভাটা পড়েছে এবং বর্তমানে আদর্শ মানব সরবরাহ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর সেই নারী জাতিকে তাদের প্রকৃত দায়িত্ব মুক্ত করে অফিস আদালতে, মিল, কলকারখানায়, আইন প্রয়োগকারী ও দেশরক্ষা বাহিনীসহ নানা কাজে তাদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছে। স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে টেনে হিঁচড়ে তাদেরকে বের করে আনা হয়েছে। ফলে পারিবারিক জীবন হয়েছে ধ্বংস। সন্তান-সন্ততি আচার আচরণের দিক দিয়ে পশুস্তরে নেমে পড়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের সন্তান পশুকেও হার মানাচ্ছে।

পশু প্রাণী অন্য পশু প্রাণীর সাথে জোরপূর্বক যৌন ক্রিয়া করে তাকে হত্যা করে না। কিন্তু মানুষ একজনকে ধর্ষণ করে তাকে হত্যা করছে। মানুষের এই অবনতির কারণ মায়ের জাতিকে তাদের সন্তানের প্রতি যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব পালন করতে না দিয়ে

www.pathagar.com

অন্যত্র দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানব জাতি ঐ সময়ই পতনের শিকার হয়েছে, যে সময় মায়ের জাতিকে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে না দিয়ে গৃহের বাইরে অন্য কাজে নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকৃত ব্যাপার হলো নারী জাতি যদি সন্তানের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং দেশ ও সমাজকে আদর্শ নাগরিক সরবরাহ করে, তাহলে দেশ ও জাতি উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌছবে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'আমাকে একটি ভালো মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি ভালো জাতি উপহার দেবো।'

ইসলাম এ কারণেই মায়ের অধিকার পিতার তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সন্তানকে অন্যের কাছে অসহায়ের মতো ফেলে যে মা অন্য দায়িত্ব পালন করে, সে সন্তানের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটতে পারে না। যাকে যে কর্মের যোগ্যতা দিয়ে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাকে অন্য কর্মে নিয়োজিত করলে বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বাধ্য।

সৎমানুষ গঠন করার দায়িত্ব হলো মায়ের, এ কর্মের যোগ্যতা তার মধ্যে দান করা হয়েছে। সে দায়িত্ব যদি মা পালন না করে, তাহলে পৃথিবী জুড়ে অসৎ মানুষে ছেয়ে যাবে। পৃথিবী আর বাস উপযোগী থাকবে না। চারদিকে বিরাজ করবে অশান্তি, বিপর্যয় আর ধ্বংস। আমার কথার অর্থ এটা নয় যে, নারী বাইরের কোনো কাজে নিজেকে জড়িত করতে পারবে না। নিজের শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা অনুসারে নারী পর্দার সাথে অবশ্যই কাজ করবে। কিন্তু এসব কাজ করতে গিয়ে তার প্রতি 'আদর্শ নাগরিক সরবরাহের' যে কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেই কাজের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। যে মা এই কঠিন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মা সম্পর্কে বলেছেন, 'যে নারী নিজের সন্তানকে প্রতিপালন করার লক্ষ্যে নিজের বাড়িতে অবস্থান করবে, সে নারী জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।'

নারীর মন-মানসিকতা তার পবিত্র আবেগ অনুভূতি, চারিত্রিক গুণাবলী এবং শারিরীক গঠন আল্লাহ এমনভাবে করেছেন যে, যেন সে তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। নারীকে এ দায়িত্ব পালন করতে না দেয়ার অর্থ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার শামিল।

বর্তমান বিশ্বে তথাকথিত প্রগতি আর আধুনিকতার নামে নারীকে তার প্রকৃতিগত দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং এটার নাম দেয়া হয়েছে প্রগতি। এই প্রগতির নামেই বর্তমান পৃথিবীকে অধঃপতনের অতল

www.pathagar.com

গহ্বরে নিমজ্জিত করা হয়েছে। মহান ইসলাম পৃথিবীতে নারীকে যে অধিকার প্রদান করেছে, তা যেমন মর্যাদকর তেমনি সম্মানজনক। সে অধিকারের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে নারীর অন্তর্নিহিত স্বভাবের সাথে।

পৃথিবীর কোন মতবাদ মতাদর্শ এবং তথাকথিত কোন ধর্মই নারীকে ইসলামের ন্যায় সম্মানজনক অধিকার দেয়নি। নারীর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তারপরে সে অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করতে পারে–এ ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নেই। নারীর উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করাকে পশ্চ্যাতমুখী ধারণা মনে করা হবে আর নারীকে পুরুষের পাশে দাঁড় করিয়ে তার স্বাভাবিক যোগ্যতাকে ধ্বংস করার ব্যবস্থাকে মনে করা হবে উন্নতি-এটা মারাত্মক ভুল ধারণা।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতির মূল কথাই হলো, সৎ উন্নত চরিত্র সম্পন্ন মানব সমাজ গড়া। এটা ছাড়া কোন সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। উন্নত সৎমানব সমাজ গড়তে হলে মানব সন্তান যার গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয় সেই মা'কে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। মা তার সন্তানকে সৎস্বভাবের উন্নত মানুষে পরিণত করবে। পরিচ্ছন্ন উন্নত সমাজ গড়তে হলে উন্নত মানুষ প্রয়োজন। নারী ব্যতীত এ প্রয়োজন অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না। সৎ উন্নতমানের মানুষ একজন সৎ উন্নতমানের মায়ের কোল থেকেই পাওয়া সম্ভব।

আদর্শ স্বামী এবং স্ত্রী নির্বাচন

আদর্শ সন্তান গড়াতে হলে আদর্শ পরিবার গঠন করতে হবে। আর আদর্শ পরিবার স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে মিলিতভাবেই গঠন করবে। পারিবারিক জীবনের সূচনা হলো, বিয়ের সময়ই একজন পুরুষ আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন করবে এবং একজন নারীও জীবন সাথী হিসেবে আদর্শ পুরুষকে স্বামী হিসেবে নির্বাচন করবে। সমাজ সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থা। পরিবার থেকে মানুষ শিশু বয়সে যা শিখে এবং যে শিক্ষা লাভ করে আমৃত্যু মানুষের জীবনে তা ক্রিয়াশীল থাকে।

আর শিশুর প্রথম শিক্ষক হলো তার মা। মায়ের স্বভাব চরিত্র যদি উত্তম হয়, মা যদি আল্লাহভীরু হয় তাহলে তার কোলে যে সন্তান লালিত হবে, সে সন্তান কিছুটা হলেও মায়ের গুণের অংশীদার হবে। সুতরাং বিয়ের সময় পাত্রীর যেসব গুণাবলী দেখা প্রয়োজন, তার মধ্যে সবথেকে বড় প্রয়োজন হলো পাত্রী আল্লাহভীরু কিনা। পাত্রীর মধ্যে অন্যান্য গুণাবলী অল্প মাত্রায় যদি থাকে আর সে পাত্রী যদি আল্লাহভীরু হয় তাহলে তাকেই বিয়ে করতে হবে।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয়। তার ধন-সম্পদ, তার বংশ গৌরব-সামাজিক মানমর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই গ্রহণ কর।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার অর্থ হলো, বিয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু পরহেযগার মেয়ে পাওয়া গেলে তাকেই যেন জীবন সাথী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের মেয়ে বাদ দিয়ে অন্যান্য গুণে গুণান্বিত মেয়েকে বিয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী সম্পর্কে সর্বপ্রথমে অনুসন্ধানের বিষয় হলো, যার সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হতে যাচ্ছে, সে পুরুষ বা নারী জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে কিনা এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য পরায়ণ কিনা। যার বিয়ে হচ্ছে তার পক্ষে এসব ব্যাপারে অনুসন্ধান করা সম্ভব না হলে নিজের অভিভাবককে এ কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে আল্লাহভীরু পাত্র বা পাত্রীকেই প্রাধান্য দিবে।

ধনী, সদ্বংশজাত ও সুন্দর বা সুন্দরী হওয়াও বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রীর বিশেষ গুণ এতে সন্দেহ নেই। এ ধরনের যে কোনো একটি গুণ থাকলেই তাকে জীবন সাথী হিসেবে বরণ করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ মুখ্য ও প্রধান নয়-গৌণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী কেবল ধন-সম্পত্তি, বংশ-মর্যাদা ও রূপ-সৌন্দর্যের কারণেই কাউকে বিয়ে করা উচিত নয়। সবচাইতে বেশি মূল্যবান ও অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য গুণ হচ্ছে দ্বীনদারী। চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদার হওয়ার গুণটি কেবল যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা-ই নয়, এ গুণ যার নেই তার মধ্যে অন্যান্য গুণ যতই থাক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য নয়।

ভবিষ্যৎ বংশধর তথা সন্তানের প্রতি সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে মায়ের গুণ-বৈশিষ্ট্য। কারণ পিতার তুলনায় সন্তান মায়ের সান্নিধ্যই অধিক পেয়ে থাকে। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে বলেছেন, 'নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই তোমরা বিয়ে করো না। কারণ রূপ-সৌন্দর্য তাদেরকে নষ্ট ও পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা দেখেও বিয়ে করবে না, কারণ ধন-সম্পদ একজন নারীকে বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত করে তুলতে

www.pathagar.com

পারে। বরং বিয়ে করো নারীর দ্বীনদারীর গুণ দেখে। মনে রাখবে কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবু সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'বিয়ের জন্য কোন ধরনের পাত্রী উত্তম?'

জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'যে মেয়েলোককে দেখলে বা তার প্রতি তাকালে স্বামীর মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়, তাকে যে কাজের আদেশ করা হবে তা সে যথাযথভাবে পালন করবে এবং তার নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর মত ও পসন্দ-অপসন্দের বিপরীত কোন কাজই করবে না।'

অপর এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-সাহাবায়ে কিরাম একদিন বললেন, সর্বোত্তম ধন-সম্পদ কি, তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে তা আমরা অবশ্যই অর্জন করতে চেষ্টা করতাম। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর যিক্‌র-এ মশগুল মুখ ও জিহবা, আল্লাহর শোকর আদায়কারী হৃদয় এবং সেই মু'মিন স্ত্রীও সর্বোত্তম সম্পদ, যে স্বামীর দ্বীন ঈমানের পক্ষে সাহায্যকারী হবে।'

বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষই শুধুমাত্র আল্লাহভীরু পাত্রীকে বিয়ে করবে আর পাত্রী যে কোন চরিত্রের পাত্রের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ইসলামের নির্দেশ তা নয়। বরং পাত্রীও অনুসন্ধান করবে দ্বীনদার পাত্রের। নারী যখন একজন পুরুষের সাথে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হবে, তখন সে অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না। কোরআন ও হাদীসের অনুসরণ করে না। হালাল-হারামের পরোয়া করে না। যার চরিত্র বলতে কিছুই নেই। যার চিন্তা চেতনা ইসলামী আদর্শের বিপরীত-এমন পুরুষের সাথে কোন মুসলিম নারী কিছুতেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। পাত্রপক্ষ যেমন পাত্রী পক্ষের নানা ধরনের সৎ গুণাবলী চাইবে, অনুরূপ পাত্রী পক্ষ পাত্রের ঐ ধরনের গুণাবলীই চাইবে যে ধরনের গুণাবলী তারা পাত্রীর মধ্যে চায়। বিয়ে তথা দাম্পত্য জীবন গ্রহণের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর প্রতি ইসলামের এটাই নির্দেশ।

মুসলিম জীবনের কোনো কাজই পরিকল্পনাহীন নয়, পরিকল্পনা-ভিত্তিক কাজ করতেই ইসলাম শিখিয়েছে। বিয়ের পূর্বেই পরিকল্পনা করতে হবে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরকে কিভাবে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়তে হবে। এ জন্য একজন মুসলিম নারীকেও যেমন আদর্শ স্বামী নির্বাচন করতে হবে, অনুরূপভাবে একজন পুরুষকেও স্ত্রী হিসেবে আদর্শ নারীকে নির্বাচন করতে হবে। তাহলে বিয়ের পরে উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যৎ বংশধরদের আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা সহজ হবে।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাপনের মূখ্য উদ্দেশ্য

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বলা যেতে পারে। কেননা দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ মানব বংশ বৃদ্ধি ঘটান, এ মানব শিশু মাতা-পিতার কোল হতেই শিক্ষা পেতে শুরু করে। শিশুর জীবনে পরবর্তীতে এ শিক্ষা অমর হয়ে থাকে। মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাপনের মূখ্য উদ্দেশ্যই হলো, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বৃদ্ধি করবে। তাদের সম্মিলিত জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া করে তাদেরকে যে সন্তান দান করবেন, সেই সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়বেন। যদিও দাম্পত্য জীবনের মূখ্যতম লক্ষ্য নারী-পুরুষের জীবনে পরম শান্তি, নির্লিপ্ততা, পারস্পরিক অকৃত্রিম নির্ভরতা, নিরবচ্ছিনতা, উভয়ের মনের স্থায়ী পরিতৃপ্তি ও শান্তি লাভ এবং বংশধারা রক্ষার্থে সন্তানের জন্মদান। সদ্যজাত শিশু সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন ও তাকে আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তোলা।

এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই ইসলাম বিয়ে ও পরিবার গঠনের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এটা কোনো সাধারণ নির্দেশ নয় এবং এই নির্দেশ নবী-রাসূলদেরও দেওয়া হয়েছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً–

হে নবী! তোমার পূর্বেও আমি বহুসংখ্যক নবী রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। (সূরা আর রা'দ-৩৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি কাজ নবীদের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য। সে চারটি কাজ হচ্ছে, সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিয়ে করা, মিস্ওয়াক করা এবং খাতনা করানো।' (তিরমিযী)

বিয়ে ইসলামের অন্যতম রীতি ও বিধান। আর ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিয়ের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন–

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ–

এই মুহাররম মেয়েলোক ব্যতীত অন্য সব মেয়েলোককে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদের লাভ করতে চাইবে নিজেদের চরিত্র দুর্জয় দুর্গের মত সুরক্ষিত রেখে এবং বন্ধনহীন অবাধ যৌন চর্চা করা থেকে বিরত থেকে। (সূরা আন নিসা-২৪)

www.pathagar.com

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নির্দিষ্ট কতকজন মেয়েলোক বিয়ে করা ও তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। সেই হারাম বা মুহাররম মেয়েলোক কয়জন ছাড়া আর সব মেয়েলোকই বিয়ে করা পুরুষের জন্যে হালাল। এসব হালাল মেয়েলোক তোমরা গ্রহণ করবে 'মোহরানা' স্বরূপ দেয়া অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করবে। এভাবে বিয়ে করে নৈতিক চরিত্রের এক দুর্জয় দুর্গ-পরিবার-রচনা করা যায় এবং অবাধ যৌন চর্চার মত চরিত্রহীনতার কাজ থেকে নিজকে বাঁচানো যায়।

প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যৌন প্রবণতা দান করেছেন। এই প্রবণতা না থাকলে একে অপরের প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করতো না। পরিবারও কেউ গড়তোনা। যৌন অনুভূতি এমনি এক অনুভূতি, এমনি এক কামনা, যা তৃপ্তির সাথে চরিতার্থ করতে না পারলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হয়।

এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে যৌন কামনা তৃপ্তির সাথে চরিতার্থতা ও বংশধারা রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আর বিয়ের উদ্দেশ্য এটাই যে, বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের দুর্গকে দুর্জয় করতে হবে এবং অবাধ যৌন চর্চা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ–

তোমরা মেয়েদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে করো, অবশ্য অবশ্যই তাদের দেন-মোহর দাও, যেন তারা তোমাদের বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পড়ে। আর গোপন বন্ধুত্বের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিপতিত না হয়। (সূরা আন নিসা-২৫)

বিয়ে তথা দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো বিয়ে করে পরিবার-দুর্গ রচনা করা, জেনা-ব্যভিচার বন্ধ করা, বংশধারা রক্ষা করা এবং গোপন প্রণয়ের মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির যাবতীয় পথ রুদ্ধ করা। আর এসব কেবল বিয়ে করে পারিবারিক জীবন যাপনের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। সূরা নেসার এক আয়াতে পুরুষদের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। আরেক আয়াতে সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মেয়েদের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় আয়াতেই পরিবারকে একটি দুর্জয় দুর্গ হিসেবে রচনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বিয়ে হচ্ছে চরিত্রকে পবিত্র রাখার একমাত্র উপায়। বিয়ে না করলে চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে থাকে। মানুষ যে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা

www.pathagar.com

লংঘন করে পংকিল আবর্তে পড়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তার নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখতে ইচ্ছুক, বিয়ে ব্যতীত তার কোনই উপায় নেই। কেননা এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে সে এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করতে পারবে। এ কথা হাদীস থেকে প্রমাণিত, যে ব্যক্তি বিয়ে করে পারিবারিক জীবন গড়তে চায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেন।

নারী-পুরুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দাবি পূরণ এবং যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি ও স্থিতি বিধানের একমাত্র মাধ্যমই হলো বিয়ে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً–

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন জুড়ি, যেন তোমরা তাদের কাছ থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে তিনি প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, মায়া-মমতা ও প্রণয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা রূম-২১)

এ আয়াতে জুড়ি গ্রহণের বা বিয়ে করার উদ্দেশ্যস্বরূপ বলা হয়েছে, যেন তোমরা সে জুড়ির কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি ও গভীর শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পারো। এর অর্থ হলো, স্বামী-স্ত্রীর মনের গভীর পরিতৃপ্তি-শান্তি স্বস্তি ও স্থিতি লাভ হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য। আর এ বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, মায়া-মমতা ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রণয়, মায়া-মমতা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অথচ পূর্বে এই দুইজনের মধ্যে না ছিল তেমন কোন পরিচয় না নিকটাত্মীয় বা রক্ত-সম্পর্কের কারণে মনের কোনরূপ সুদৃঢ় সম্পর্ক। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا–

তিনিই আল্লাহ– তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র মানবাত্মা থেকে এবং তার থেকেই বানিয়েছেন তার জুড়ি, যেন সে তার কাছে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে। (সূরা আ'রাফ-১৮৯)

নিছক যৌন লালসা চরিতার্থ করাই বিয়ে তথা দাম্পত্য জীবন গ্রহণের নির্দেশ আল্লাহ তা'য়ালা দেননি। মানুষ পরিবার গঠন করবে, বংশ বৃদ্ধি করবে, মানুষের জীবন উচ্ছৃংখলতা মুক্ত হয়ে স্থিতিশীল হবে-ইত্যাদী উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ইসলাম

www.pathagar.com

মানুষকে দাম্পত্য জীবন গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। আবার এই দাম্পত্য জীবন গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলাম মানুষকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি। কিছু শর্ত আরোপ করেছে। পশুকুলের মধ্যে তারা সমগোত্রীয় যাকে খুশী তাকে সাময়িকের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে যৌন সাথী নির্বাচন করে। কিন্তু মানুষকে সে স্তরে না নামিয়ে মহান আল্লাহ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রী উভয়েই উভয়ের দ্বীন-ঈমানের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে যত কথা বলা হয়েছে, এসব কথা এক জায়গায় করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবন-যাপনের যতগুলো উদ্দেশ্যে রয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান। যদিও মানব সন্তানের জন্ম বিয়ে বা পারিবারিক জীবন ব্যতীতই দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এর মধ্যে পবিত্রতা সংরক্ষণ, সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন, দেশ ও সমাজের জন্য আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিকরণ এবং শিক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবন-যাপনের মূখ্য উদ্দেশ্যই হতে হবে সন্তান জন্মদান ও সেই সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

আদর্শ স্বামী-স্ত্রী

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আদর্শ সন্তান লাভ করতে হলে স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই আদর্শবান হতে হবে। পারিবারিক পরিবেশকে কোরআন-হাদীসের রঙে পূর্ব থেকেই রাঙিয়ে তুলতে হবে। সন্তান যেনো এমন এক পরিবেশে তার প্রথম দৃষ্টি মেলতে পারে, যে পরিবেশ হবে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের পরিবেশ। সন্তান যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেদিকেই সে সেই উপকরণই দেখতে পাবে, ভবিষ্যতে সে নিজেকে যে উপকরণে সজ্জিত করবে।

আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হলো সেই স্বামী-স্ত্রী, যারা কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণের লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং উৎসাহ দেয়।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–আল্লাহ তা'য়ালা সেই পুরুষকে রহমত দান করবেন, যে পুরুষ রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে নামায আদায় করবে এবং স্ত্রীকেও নামায আদায়ের জন্য ঘুম থেকে জাগাবে। স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'য়ালা রহমত দান

www.pathagar.com

করবেন সেই স্ত্রীকে, যে স্ত্রী রাতে ঘুম থেকে জেগে ওঠে নামায আদায় করবে এবং স্বামীকেও নামায আদায়ের জন্য ঘুম থেকে জাগাবে। স্বামী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযা)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে রাতে ঘুম থেকে জাগাবে এবং দু'জনই নামায আদায় করবে, পৃথক পৃথকভাবে এবং দুই রাকাআত নামায একত্রে আদায় করবে, আল্লাহ তা'য়ালা এই স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহর ফিক্‌রকারী পুরুষ-নারীদের মধ্যে গণ্য করবেন। (আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযা)

সন্তান যখন তার প্রত্যেক দৃষ্টিতে আপন পিতামাতাকে মহান আল্লাহর রঙে রঙিন দেখতে পাবে, তখন সেই সন্তানও নিজেকে মহান আল্লাহর রঙে রঙিন করার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সন্তানের সম্মুখে শুধু মাত্র মুখে কতক মূল্যবান বাণী উচ্চারণ করলেই সন্তান সেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে না এবং সেই বাণীও তাকে প্রভাবিত করবে না। কোরআন-সুন্নাহ্ ও মনীষীদের বাণী সন্তানকে শোনানের সাথে সাথে নিজের সার্বিক আচার-আচরণ ও ব্যবহারিক জীবনের মাধ্যমে সন্তানকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এটাই সবথেকে প্রভাবশীল ও কার্যকর বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং পারিবারিক জীবনে সর্বপ্রথমে নিজেদেরকে আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং আদর্শ স্বামী-স্ত্রীই হবেন সন্তানের আদর্শ পিতামাতা। আর আদর্শ পিতামাতাই হবেন সন্তানের কাছে সবথেকে প্রভাব বিস্তারকারী শিক্ষক।

দাম্পত্য জীবনে সন্তানের আকাঙ্খা

পৃথিবীতে মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো মহান আল্লাহর দেওয়া বিধান নিজে অনুসরণ করা ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণান্তর চেষ্টা-সাধনা করা। অন্য মানুষ যেন ইসলামের বিধিবিধান নির্বিঘ্নে অনুসরণ করতে পারে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এ জন্যে চেষ্টা ও সাধনার যাবতীয় উপায় অবলম্বন করবে একজন মুসলমান।

এ দায়িত্ব মুসলিম নারী ও পুরুষ সর্বাবস্থায় পালন করবে। কারণ এ দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ফরজ। এ দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হলো বিয়ের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন গঠন করা। কারণ পরিবারে মাতাপিতা যখন মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করবে, আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে, সন্তান মাতা-পিতাকে দেখে সে নিজেও মুসলিম হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তা জানতে পারবে এবং পালন করবে।

www.pathagar.com

একজন মুসলমান পৃথিবীতে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে একদিন পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিবে- এমন হতে পারে না। কারণ তার মৃত্যুর পরে পুনরায় কে দায়িত্ব পালন করবে, এ অনুভূতি একজন সচেতন মুসলমানের মনে সজাগ থাকবে। একজন মুসলমানকে উত্তরাধীকার রেখে যেতে হবে। যেন তার ইন্তেকালের পরে তার রেখে যাওয়া উত্তরাধীকার অন্য মানুষকে ইসলামী জীবন আদর্শের দিকে আহবান জানাতে পারে।

একারণেই বিয়ের পরপরই একজন মুসলমানের উচিত সন্তান কামনা করা। সন্তান আল্লাহর নিয়ামত বিশেষ। এ নিয়ামত বড়ই অমূল্য। সবার ভাগ্যে এ নিয়ামত জোটে না। এমন কোন মাতাপিতা নেই, যিনি সন্তানের আকাঙ্খা করেন না। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীই কায়মনোবাক্যে কামনা করেন, তাদের জীবন সন্তানের মধুর কলকাকলীতে ভরে উঠুক। স্বামী এবং স্ত্রীর মন অধীর হয়ে থাকে শিশুর কচিকণ্ঠে মধুর স্বরে আব্বু আম্মু ডাক শোনার দুর্দমনীয় আশা ও কামনায়।

প্রকৃত অর্থে সন্তানের কারণেই একটি বাড়ি ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। বাড়ির শোভা বৃদ্ধি করে সন্তান। শোভা সৌন্দর্যহীন শ্রীহীন বাড়ি ঐটি, যে বাড়িতে ফুলের মতো পবিত্র শিশু কণ্ঠের কলকাকলী নেই, যে বাড়িতে অনুপস্থিত সন্তানের মমতা জড়ানো আবেগময় কণ্ঠ, সে বাড়ি সমাধী ক্ষেত্রের মতো। ঐ বাড়িকে অনেকেই অশুভ এবং ভয়ঙ্কর বাড়ি বলে মনে করে। যে বাড়িতে শিশুর কল-গুঞ্জন নেই। জন্মগতভাবেই নারী মাতৃত্বের আকাঙ্খা হৃদয়ের নিভৃত কোণে পোষণ করে। নারীর সে আকাঙ্খা দুর্বিনীত হয়ে ওঠে বিয়ের পরে অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে। পারিবারিক জীবনে একজন নারী সন্তানের আকাঙ্খায় উদগ্রীব হয়ে থাকে।

নারী অধীর হয়ে ওঠে কোন্ শুভলগ্নে তার কোল আলোকিত করে আসবে পুর্ণিমার ন্যায় সুন্দর শিশু। যে তাকে পূর্ণতা দান করবে। বস্তুত নারীর পূর্ণতাই মাতৃত্বে। একটি শিশুর সে সেবা যত্ন করছে হৃদয় দিয়ে, শিশুকে সে ভালোবাসছে তার সমস্ত মাতৃত্বের সত্বা আর চেতনা দিয়ে, শিশু তার নধরকান্তি কচি হাত-পা ছুঁড়ে বিছানায় খেলছে, এ সবকিছুই পারিবারিক জীবনে একজন মমতাময়ী নারী হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে থাকে। মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবেই একজন নারীর প্রকৃতি এমন করেছেন যে, সন্তানের সুখের জন্য সে নিজের জীবনের সমস্ত সুখ ও সৌন্দর্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সন্তানের জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করে নারী পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করে।

সন্তানের সাফল্যে-কৃতিত্বে নারী হয় গর্বিত। সন্তান লালন পালনে যে অসীম ধৈর্য, ত্যাগ, উদারতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী প্রয়োজন, এ সমস্ত গুণাবলী মহান আল্লাহ

www.pathagar.com

নারীর মধ্যে দান করেছেন। এসব কারণেই মৃত্যুর ঝুঁকি স্বীকার করেও নারী মা হতে চায়। আর এই মায়ের মর্যাদাই ইসলামে সর্বাধিক। মা-ই হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষক। একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তার জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড আখিরাতমুখী করে নেয়। মুসলিম মা তার জীবনের উত্থান পতন, দুঃখ যন্ত্রণা তথা জীবনের প্রতিটি বাঁকেই সে নিজেকে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে মনে করে। সে জানে তার দাম্পত্য জীবন, সন্তান ধারণ, সন্তানের লালন-স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ এ সবকিছুই হলো ইবাদাত বিশেষ।

ইসলাম তার অনুসারী প্রত্যেক নারীর মন-মস্তিষ্কে এ চেতনা বদ্ধমূল করে দেয় যে, নারীর মানসিক, শারীরিক ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কাজ কর্মের কল্যাণ ও প্রতিদান শুধু সে এ পৃথিবীতেই পাবে না, তার আত্মীক, মানসিক ও শারীরিক সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার উত্তম প্রতিদান আদালতে আখিরাতে সে পাবে। তার সমস্ত ত্যাগই আল্লাহর পথে জিহাদের সমান। প্রত্যেক মা তার সন্তানের কারণে যে ত্যাগ স্বীকার ও যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে, তার এ ত্যাগ ও যন্ত্রণা ভোগ জিহাদ তথা ইবাদাতে মশগুল থাকারই নামান্তর। আর এসবের উত্তম প্রতিদান সে এ পৃথিবীর জীবনেও লাভ করতে পারে। এ পার্থিব জগত তাকে প্রতিদান দানে কার্পণ্য করলেও পরকালীন জগতে মহান আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিবেন।

সন্তানের কারণে মা তার রূপ-যৌবন নিঃশেষ করে দেয়। নিজের কামনা-বাসনাকে নিষ্ঠুর হাতে গলা টিপে হত্যা করে মা তার সন্তানের সুখের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই অসীম ত্যাগের কারণে মহান মা'বুদ মুসলিম মা-কে নিঃসন্দেহে জান্নাত দান করবেন। পৃথিবীর জীবনে মা তার সন্তানের জন্য যে সমস্ত সাধ-আহলাদ পূরণ করতে পারেননি-জান্নাতে তাকে তার কয়েক গুণ বেশী দান করা হবে। মা তার ইচ্ছে অনুযায়ী জান্নাতে সাধ-আহলাদ পূরণ করবেন।

সন্তানের কারণে ত্যাগ স্বীকারকারিণী মা-কে মহান আল্লাহ জান্নাতে এমন মাধুর্যময় সুষমা মণ্ডিত যৌবন দান করবেন, যে যৌবন কোনদিন ম্লান হবে না। সে যৌবনে বার্ধক্য কোনদিন সামান্যতম আঁচড় কাটতে পারবে না। পরকালীন কল্যাণ লাভের আশায়ই একজন মুসলিম মা পৃথিবীতে সন্তানের কারণে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করে। তার যাবতীয় দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে।

দুর্ভাগ্যবশত মা পৃথিবীতে কোন প্রতিদান না পেলেও সে হতাশ হন না এবং দায়িত্ব পালনে পিছ পা হন না। মা সন্তুষ্টচিত্তে মানসিক প্রশান্তি ও হৃদয় দিয়ে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন। সন্তানের জন্য সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করার পরেও মা যদি সন্তানের কাছ থেকে মারাত্মক আঘাত পান, সন্তান যদি মায়ের সমস্ত আশা আকাঙ্খা,

www.pathagar.com

কামনা বাসনা, স্বপ্ন ভেঙ্গে ধুলিস্মাৎ করে দেয়, তবুও মুসলিম মা সামান্য সময়ের জন্যও হতাশায় নিপতিত হয় না। তার মনে তার অসীম ত্যাগের কারণে অনুশোচনা হয় না।

কারণ মুসলিম মা'কে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, তার আসল কল্যাণ ও প্রতিদান রয়েছে জান্নাতে। মা আত্মতৃপ্তি অনুভব করে, তার এতটুকু কষ্টও বৃথা যাবে না। আদালতে আখিরাতে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্পনাতীত পুরস্কারে ভূষিত হবে। কারণ সন্তানের জন্য মা যা করেছে, তার সবটাই সে ইসলামের আদেশ অনুসারে ইবাদত মনে করেই করেছে।

পৃথিবীতে প্রত্যেক মা-ই আপন গর্ভজাত সন্তানকে কেন্দ করে স্বপ্ন দেখে। নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে, জীবনীশক্তি তিল তিল করে ক্ষয় করে, নিজের সাধ আহলাদ, কামনা-বাসনা, জীবন ও যৌবন ম্লান করে দিয়ে, যন্ত্রণার অসীম সাগর পাড়ি দিয়ে যে মা সন্তান জন্ম দেয় এবং লালন-পালন করে, সে মা অবশ্যই সন্তানকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখবে এটাই তো স্বাভাবিক। তার সন্তান তারই আদেশের অনুগত হবে, তার মনের মতো হবে, তার আশা আকাঙ্খা অনুসারে সন্তান বেড়ে উঠবে, সন্তানের সুনাম চারদিকে ফুলের সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়বে, সব ধরনের সৌভাগ্য তার সন্তানের পদ চুম্বন করবে, সবার কাছে তার সন্তানের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে, তার সন্তান সবার কাছে অনুসরণীয় হবে, খ্যাতনামা হবে, প্রশংসীত হবে, সব দিকে সাফল্য লাভ করবে এ সবই থাকে সন্তানকে কেন্দ্র করে মায়ের স্বপ্ন।

পক্ষান্তরে একজন মুসলিম মা তার সন্তানকে কেন্দ্র করে উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও সব চেয়ে বড় যে স্বপ্ন দেখে তাহলো, তার সন্তান হবে আল্লাহর পথের একজন শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ। দ্বীনদার ঈমানদার ইসলামী সভ্যতার ধারক-বাহক ও সংরক্ষক হবে তার কলিজার টুকরা সন্তান। তার সন্তানের কারণে মহান আল্লাহর কাছে মা হিসেবে সে হবে সম্মানীত-এটাই থাকে একজন মুসলিম মায়ের স্বপ্ন। সন্তান যখন তার এ সমস্ত স্বপ্ন পূরণের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে দৃপ্ত কদমে এগিয়ে যায় তখন গর্বে মায়ের বুক ভরে যায়। আল্লাহর দরবারে মা বারবার শোকর আদায় করতে থাকে।

সন্তান সম্পর্কে হতাশার কারণ

সন্তানের কারণে পিতামাতার অসীম ত্যাগ, তাকে কেন্দ্র করে এত স্বপ্ন, তার সম্পর্কে মাতাপিতার এত সুখ কল্পনা, সে সন্তান যদি তাদের অবাধ্য হয়, আনুগত্য না করে, তাদের স্বপ্নের বিপরীত পথের পথিক হয়, প্রত্যেক মুহূর্তে পিতামাতা যদি সন্তানের কারণে হৃদয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে, তখন তাদের মানসিক ও শারীরিক

www.pathagar.com

অবস্থা যে কোন স্তরে নেমে যায়-তা বুঝি কল্পনাও করা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে এমন পরিবার বোধহয় অত্যন্ত বিরল, যে পরিবারের পিতামাতার মধ্যে সন্তানকে কেন্দ্র করে হতাশা আর নিরাশার জন্ম হয়নি। এমন পিতামাতা খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর, যাদের চোখে সন্তানের কারণে পানি ঝরে না।

সন্তান পিতামাতার তোয়াক্কা করে না, তাদের ব্যাপারে উদাসীন, তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলে না, পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণ করে না, তাদের আদেশ মানে না– এসব অভিযোগ প্রায় প্রত্যেক পিতামাতার কণ্ঠেই ক্ষোভ বেদনা আর মর্ম যন্ত্রণার সাথে উচ্চারিত হতে হতে আকাশ বাতাস যেন ভারী করে তুলেছে। সন্তান একটু বড় হলেই পিতামাতার কণ্ঠ চীরে শুধুই আক্ষেপ বের হয়ে আসছে। সন্তানকে কেন্দ্র করে তারা কেবলই করুণ কণ্ঠে পরিচিত মহলে বিলাপ করছে।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ, তাদের সম্মান সম্ভ্রমের সংরক্ষণ, সেবা-যত্ন, আদেশ নিষেধ পালন, তাদের সাথে স্বহাস্য বিনয়াবনত আচরণ, তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূল্যায়ন ইত্যাদি কোন কথাই যেন বর্তমান পৃথিবীর সন্তানদের অভিধানে অনুপস্থিত। উল্লেখিত বিষয়সমূহই যেন তাদের কল্পনাতেও কখনো আসে না। তাদের এহেন অবনতি অবলোকন করে বর্তমানকালের নোংরা সভ্যতার পিতামাতার দল 'বর্তমানে ছেলেমেয়েদের ব্যবহারই এমন' একথা উচ্চারণ করেই তারা নিজের কোন্ ত্রুটির কারণে তাদের কলিজার টুকরা সন্তান এমন জঘন্য বেয়াদব হলো-সে ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন না।

সন্তান একটু বড় হলেই সে সন্তানের প্রতি পিতামাতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না, এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পিতামাতাকে গভীরভাবে আত্মসমালোচনা করে দেখতে হবে, নিজেদের কোনো ত্রুটিযুক্ত ভুমিকার কারণে আদরের সন্তান এমন জঘন্য বেয়াদব হয়নি তো! মহান আল্লাহ পিতামাতার প্রতি সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে যে দায়িত্ব অপর্ণ করেছেন, সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা। পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে চাহিদা এবং অধিকার রয়েছে, সে অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে সন্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। উল্লেখিত দিকগুলো সামনে রেখে পিতামাতা যদি আত্মসমালোচনা করেন, তাহলেই তারা বুঝতে পারবেন কেনো তাদের নয়নের মণি সন্তান এমন বেয়াদব হলো।

একটা কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তেঁতুল বৃক্ষ রোপণ করে মিষ্টি আম খাওয়ার আশা পোষণ করা চরম বোকামী। আপনার সন্তানকে আপনি যা শিক্ষা দিবেন তাই সে শিখবে এবং তদানুযায়ী আচরণ করবে। আপনার প্রিয় সন্তানের প্রতি আপনি যথাযথভাবে যখন দায়িত্ব পালন করবেন, তখনই আপনার সন্তান আপনার

www.pathagar.com

মনের মতো হবে। আপনি পিতামাতা হিসেবে আপনার আত্মজ সন্তানের কাছ থেকে যে সদাচরণ দাবী করেন, অনুরূপ আচরণ আপনি সন্তানের সাথে করেছেন কিনা এটাও আপনাকে ভাবতে হবে।

আপনি সন্তানকে যে উচ্চ চরিত্রের অধিকারী দেখতে চান, সে চরিত্র আপনার মধ্যে ছিল কিনা, আপনি স্বয়ং সে উত্তম চরিত্রের কোনো নমুনা সন্তানের সম্মুখে পেশ করতে পেরেছেন কিনা, এসব দিক ভেবে দেখুন। আপনি আপনার সন্তানের উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে আপনার নিজের পিতামাতার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন চিন্তা করুন।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার আছে-এ কথা আপনি যদি আপনার সন্তানকে জানতে না দেন তাহলে কিভাবে আপনার সন্তানের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, সন্তানের প্রতিও পিতামাতার সীমাহীন অধিকার রয়েছে? আপনার সন্তান কিভাবে আপনার আদেশ পালন করবে, কিভাবে আপনার সেবা যত্ন করবে, যদি আপনি সন্তানকে শিক্ষা না দেন যে, আল্লাহর পরেই পিতামাতার স্থান এবং তাদের সেবাযত্ন করা ফরজ। তাদের সাথে বেয়াদবি করলে জাহান্নামে যেতে হবে। পিতামাতাই সন্তানের জান্নাত-জাহান্নাম, তাদের সেবাযত্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সন্তানের যাবতীয় মঙ্গল। এ কথাগুলো যদি কোরআন-হাদীসের আলোকে আপনি সন্তানকে শিক্ষা না দিয়ে থাকেন, তাহলে সন্তান যে আচরণ আপনাকে উপহার দিচ্ছে সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।

আপনি যদি সন্তানের অধিকারের প্রতি সচেতন হন তাহলে আপনার অধিকারের প্রতিও আপনার সন্তান সচেতন হবে। সন্তানকে খেতে পরতে ও লেখাপড়ার খরচ দেওয়া– এটাই শুধু সন্তানের অধিকার নয়। পিতামাতা সন্তানকে একজন আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তুলবে, সর্বোত্তম শিক্ষা দিবে এ ধরনের অনেক কিছুই সন্তানের অধিকার। সন্তানের আবেগ অনুভূতির প্রতি যদি আপনি দৃষ্টি না দেন, তাহলে পিতামাতার আবেগ অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, এটা আপনার সন্তান কোথা থেকে শিক্ষা পাবে!

আপনি যদি সন্তানের সাথে এমন ধরণের আচরণ করেন, যে আচরণ দেখে সন্তান চিন্তা করে 'আমরা পিতামাতার জন্যে উটকো ঝামেলা বিশেষ এবং তাদের ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশের পথে অন্তরায়, তাদের কাছে এক দুর্বিসহ বোঝা।'

তাহলে আপনার সন্তানের মনে এ অনুভূতি কিভাবে সৃষ্টি হবে যে, পিতামাতার সেবা যত্ন করতে হবে? মাতার পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত? আপনি যে ধর্ম ও আদর্শ

www.pathagar.com

অনুসরণ করেন, যে আদর্শের প্রতি আপনি শ্রদ্ধাশীল, একনিষ্ঠ, সে আদর্শের প্রতি আপনার সন্তানকে আকৃষ্ট করেছেন কি? আপনার প্রিয় ধর্ম, প্রিয় আদর্শ, প্রিয় নীতি, আপনার প্রিয় নবীর মর্যাদা সন্তানের মন-মানসিকতায় প্রতিষ্ঠিত না করে, আপনি কিভাবে আপনার সন্তানকে সে আদর্শের, ধর্মের, নীতির ও নবীর প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং অনুসারী হতে বলেন? সুতরাং আপনি আপনার সন্তানকে যেমন দেখতে চান তেমন করেই শিক্ষা দিন এবং সেভাবেই গড়ুন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আশানুরূপ ফল পাবেন।

হযরত নুমান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বলেন, আমার আব্বা আমাকে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি নুমানকে অমুক অমুক জিনিস দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহর নবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এ ধরনের উপঢৌকন দিয়েছো? তিনি জবাবে বললেন, না। সবাইকে তো দেইনি। আল্লাহর নবী বললেন, তাহলে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। এরপর তিনি বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের উত্তম আচরণ করুক। বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাব দিলেন, কেনো নয়। তিনি বললেন, তাহলে এ ধরনের করো না।

উল্লেখিত ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে, আপনি আপনার সন্তানের সাথে যে আচরণ করবেন বিনিময়ে আপনিও সন্তানের কাছ থেকে অনুরূপ আচরণ পাবেন। আপনার সন্তান আপনার আচরণ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করবে-পিতামাতা হিসেবে আপনি সেটা স্মরণ রাখবেন। পিতামাতা হিসেবে আপনাকে হতে হবে সর্বোত্তম শিক্ষক। এমন কোন আচরণ আপনি সন্তানের সাথে অথবা সন্তানের সম্মুখে করবেন না, যা তাদের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

পিতামাতা হয়েছেন বলেই যে আপনি সন্তানের প্রতি আপনার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করবেন– বিষয়টি এমন নয়। আপনি আপনার সন্তানের যাবতীয় অধিকার বুঝিয়ে দিবেন, আপনার প্রতি এটা ইসলামের নির্দেশ। কেননা পিতামাতা হিসেবে আপনি এটা অবশ্যই কামনা করেন যে, আপনার সন্তান আপনার জন্যে পৃথিবী ও পরকালের জীবনে গৌরবের কারণ হোক। আপনার সন্তানের কথা আপনি যখন চিন্তা করবেন, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তখন যেন আপনার মন-মানসিকতা জান্নাতি প্রশান্তিতে ভরে যায়, এটাই তো পিতামাতা হিসেবে আপনি আশা পোষণ করেন।

সচেতন কোনো পিতামাতাই কামনা করেন না, তার সন্তান চোর ডাকাত, খুনী, ছিনতাইকারী, মিথ্যাবাদী, দুষ্কৃতিকারী হোক। সন্তানের অপকর্মের কারণে দিনরাত

www.pathagar.com

অহর্নিশি চোখ থেকে অশ্রু ঝরুক-এটা কেউ-ই কামনা করে না। এ কারণে পিতামাতা সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে। সন্তানের জন্য পিতামাতা যে নেক দোয়া করে একই সাথে তারা যদি যথাযথভাবে চেষ্টা-সাধনা না করে তাহলে কিভাবে আশানুরূপ ফল লাভ করা যাবে! মনে রাখতে হবে, শুধু দোয়ায় কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব কি, পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার কি– এ ব্যাপারে পিতামাতার যদি স্পষ্ট ধারণাই না থাকে, তাহলে তারা সন্তানের অধিকার বুঝিয়ে দেবে কি করে? সুতরাং সন্তানের অধিকার সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আদালতে আখিরাতে সন্তানকে যেমন জবাবদিহি করতে হবে সে পিতামাতার অধিকার আদায় করেছে কিনা তেমনি পিতামাতাকেও কঠিন জবাবদিহি করতে হবে–তারা সন্তানের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করেছে কিনা।

সাধারণত পিতার তুলনায় সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে মায়ের অধিকার বেশী। কারণ শিশু অবস্থায় সন্তান মায়ের সান্নিধ্য বেশী পায়। পিতা থাকেন কর্মক্ষেত্রে। এ জন্য সন্তানের অধিকারের ব্যাপারে পিতার তুলনায় মাতাকেই অধিক সচেতন হতে হবে। মহান আল্লাহ সন্তান লালন-পালনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে গুণাবলী, তা পিতার তুলনায় মাতার স্বভাব-প্রকৃতিতে অধিক দান করেছেন। সন্তানের জন্য পিতামাতা যেমন প্রাণ ভরে দোয়া করে, তেমনি সঠিকভাবে তাদের অধিকার আদায় করবে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের প্রথম দাবী হলো, সন্তানকে তারা নিজেদের উপরে বোঝা মনে করবে না। আরাম আয়েশ, সুখ সম্ভোগের পথে সন্তানকে অন্তরায় মনে করবেন না। বরং সন্তান যে মহান আল্লাহর দেওয়া অমূল্য নেয়ামত একথা তারা স্মরণে রাখবেন। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে আম্মু-আব্বু ডাক শোনার সৌভাগ্য সবার হয় না। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ করে সন্তান-সন্ততি দান করে থাকেন। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবেই আসে। সুতরাং তার মূল্য ও মর্যাদা পিতামাতাকে অনুধাবন করতে হবে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের মূল্য এবং মর্যাদা না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের অন্যান্য অধিকার সঠিকভাবে আদায় করতে পারবে না।

পিতামাতা যদি সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে তাদের পক্ষে সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করা সম্ভব নয়। পিতামাতার মনে রাখতে হবে, সন্তান মহান আল্লাহর অমূল্য নেয়ামত এবং পারিবারিক জীবনের আকর্ষণীয় সুগন্ধি। আপনার সকল কর্মকাণ্ডের অনুপ্রেরণা হলো সন্তান। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ হলো সন্তান। সন্তান পৃথিবীতে আপনার মান-সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আপনার

www.pathagar.com

জীবনের সাহায্যকারী সে। সন্তান আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি ও আদর্শকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। আপনার সুন্দর আশা আকাংখা বাস্তবায়নে সন্তান হয় সহায়তাকারী। আপনি পৃথিবীতে যে আদর্শ রেখে ইন্তেকাল করবেন, সে আদর্শকে আপনার ইন্তেকালের পরে জীবিত রাখবে আপনারই সন্তান।

অনাগত সন্তান-স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য

প্রকৃতপক্ষে সন্তানের আকাঙ্খা করা এবং সন্তান লাভ করাই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন-যাপন তথা পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে ইসলামের বিধান অনুসারে যে দাম্পত্য জীবন-যাপন করা হয়, সেটাই ইসলাম সম্মত দাম্পত্য জীবন। ইসলাম এই জীবনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীকে লক্ষ্য করে কোরআন এবং হাদীসে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে দুটো হাদীস উল্লেখ করছি। একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশী পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে ভালো ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভালো। (তিরমিযী)

স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ হিসেবে এই হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে এভাবে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক সে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের পক্ষে উত্তম। আর আমি আমার নিজের পরিবারবর্গের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভালো। তোমাদের সঙ্গী স্ত্রী বা স্বামী যদি ইন্তেকাল করে, তাহলে তার কল্যাণের জন্য তোমরা অবশ্যই দোয়া করবে।

উল্লেখিত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন, 'স্ত্রীর কাছে যে ব্যক্তি উত্তম, সে ব্যক্তি সকলের কাছে উত্তম।' এখানে অবশ্যই আদর্শবান ঈমানদার স্ত্রীর কথাই বলা হয়েছে। একজন স্ত্রীর কাছে তার স্বামীর কোনো কিছুই গোপন থাকে না। স্বামীর মন-মেজাজ, ব্যক্তিত্ব, পসন্দ-অপসন্দ, লোভ-লালসা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা কোনো কিছুই গোপন থাকেনা।

একান্ত জীবনে আবেগঘন মুহূর্তে স্বামীর আচরণ কেমন, তার স্বামী এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকার মতো ধৈর্যশীল কিনা, এদিকটি একজন সচেতন স্ত্রীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে একান্ত নির্জনে বিশেষ সময় তার স্বামী নিতান্তই পশুর মতোই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে কিনা, এ বিষয়টি স্ত্রী-ই সবথেকে ভালো বলতে পারে। গোপন জীবনে স্বামী যদি নিতান্তই পশুর অনুরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, তাহলে সে

www.pathagar.com

স্বামী সম্পর্কে সৎ আদর্শবান ঈমানদার স্ত্রী অবশ্যই সার্টিফিকেট দিবে না যে, আমার স্বামী উত্তম। একান্ত জীবনে স্বামী যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে, যৌন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যায়, তাহলে সেই স্বামীর প্রতি স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ করবে যে, 'এই লোকটি নারী সঙ্গ ব্যতীত একটি দিনও অতিবাহিত করতে পারে না, আমার অপারগতা বা অসুস্থতাকালে এই লোকটি ভিন্ন দিকে দৃষ্টি দিতে পারে।'

ঠিক এ কারণেই ইসলাম প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ধৈর্যেরও অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। নির্জনে আবেগঘন মুহূর্তে স্ত্রীর সাথে সংযত-মার্জিত আচরণ করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সামনে বস্ত্রহীন উলঙ্গ হওয়াকেও ইসলাম পছন্দ করে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীর নিকট গমন করলে তার উচিত সতরের দিকে লক্ষ্য রাখা, গর্দভের ন্যায় উভয়ে যেন বস্ত্রহীন হয়ে না পড়ে।'

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেছেন, তিনি কোনদিন তাঁর স্বামী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনস্থান দেখেননি। মানুষ নিভৃত কোনস্থানে একাকী উলঙ্গ থাকবে, ইসলাম এ অনুমতি না দিয়ে বলেছে, আল্লাহর সামনে তোমরা বেশি লজ্জা করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান! কখনো বস্ত্রহীন থাকবে না। কারণ তোমাদের সাথে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা আছে। তারা তোমাদের থেকে পৃথক হন না। তারা তখনই পৃথক হন যখন তোমরা স্ত্রীর সাথে নির্জনতা অবলম্বন করো এবং মল ত্যাগ করতে যাও, সুতরাং ফেরেশ্‌তাদেরকে লজ্জা করো ও তাদেরকেও সম্মান দেখাও।

স্বামী-স্ত্রীর নির্জন জীবনে আচরণের ক্ষেত্রেও ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং আল্লাহর নবী বিভিন্ন ধরনের দোয়া শিখিয়েছেন। এসব দোয়ার লক্ষ্যই হলো, সে সময় যেন ইবলিস শয়তানের স্পর্শ না ঘটে এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেনো সৎ আদর্শবান সুচরিত্রের সন্তান দান করেন। এ সময় যারা ইসলামের বিধি-নিষেধ ভুলে গিয়ে পশুর অনুরূপ আচরণ করবে এবং সেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণকালে যে সন্তান গর্ভে আসবে, সে সন্তান তো ইবলিস শয়তানের স্পর্শ নিয়েই পৃথিবীতে আসবে। অর্থাৎ সূচনাকালেই ইবলিস শয়তান যাকে স্পর্শ করেছে, পরবর্তীকালে সেই সন্তানের কাছ থেকে কিভাবে উত্তম কিছু আশা করা যায়?

স্ত্রীর সম্মুখে স্বামী যেমন লজ্জাজনিত আচরণ করবে, অনুরূপভাবে স্ত্রীও স্বামীর সম্মুখে লাজনম্র আচরণ করবে। কেউ-উ কারো সাথে লজ্জাহীনের মতো আচরণ করবে না। মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর কেউ-ই কারো কাছে অন্য নারী-পুরুষের গোপন

www.pathagar.com

অঙ্গের বর্ণনা বা অন্যের গোপন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করবে না। কারণ শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার গোপন জীবন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আলোচনা করছে, তাদের প্রতি উভয়ের বা যে কোন একজনের মনে শয়তান কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট নিষেধ করে বলেছেন, নারী-পুরুষকে নিষেধ করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কিত গোপন অবস্থা অপরের নিকটে বর্ণনা না করে। কারণ এতে করে অশ্লীলতার প্রচার হয় এবং মনের মধ্যে প্রেমাসক্তির সঞ্চার হয়। (আবু দাউদ)

পারিবারিক জীবন সুশৃংখল, পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখতে হলে স্বামী-স্ত্রীকে এমনভাবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামনে কথা-বার্তা ও আচার-ব্যবহার করতে হবে, যেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ তাদের একান্ত জীবন সম্পর্কে কোনরূপ আপত্তিকর ধারণা করতে না পারে। পরিবারের অন্য কারো সামনে স্বামী-স্ত্রী গোছলের জন্যে একত্রে গোছল খানায় প্রবেশ, প্রেমালাপ, বিশেষ সময় গোছল করা, স্বামী-স্ত্রী একত্রে শুয়ে থাকা ইত্যাদি বৈধ কাজগুলো অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে করতে হবে। নতুবা পরিবারের শিশু, কিশোর ও অন্যান্য সদস্যদের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনে লজ্জা-শরম এক মহামূল্যবান সম্পদ। ইসলামে লজ্জা–শরমের গুরুত্ব অপরিসীম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই লজ্জা ঈমানেরই বিষয়। (বোখারী-মুসলিম)

ইসলামী জীবন বিধানে লজ্জা এমন একটি মহৎ গুণ, যা মানুষকে যাবতীয় গর্হিত ও মানবতা-বিরোধী কাজ পরিহার করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লজ্জা বিপুল কল্যাণই বহন করে আনে, লজ্জা থেকে কোনো অকল্যাণের আশঙ্কা নেই। (বোখারী-মুসলিম)

মানুষের দৈনন্দিন কাজে-কর্মে, চলাফেরায়, ওঠা-বসায় তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিভাগেই লজ্জা হলো হলো এক অতি প্রয়োজনীয় গুণ। মানুষ ও পশুর মধ্যে এই গুণটিই পার্থক্যের ভিত্তি। এ মহৎ গুণ না থাকলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়। পশুর অনুরূপই নির্লজ্জ হয়ে কাজ-কর্ম করতে শুরু করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাহীনতার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন, লজ্জাই যদি তোমার না থাকলো, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। (বোখারী)

www.pathagar.com

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, লজ্জা একান্তই ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। আর ঈমান জান্নাতে প্রবেশের চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা হচ্ছে জুলুম, আর জুলুমের কারণেই একজনকে জাহান্নামে যেতে হয়। (তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মাদ)

ইসলামের লক্ষ্য মানুষের সার্বিক পবিত্র ও সর্বাঙ্গীন উন্নত চরিত্র গড়া আর এজন্যই প্রশিক্ষণের সূতিকাগার– পারিবারিক জীবনে লজ্জা নামক গুণটি বড়ই প্রয়োজনীয়। এই গুণের অভাবে চরিত্র ধ্বংসের নানা ছিদ্রপথ সৃষ্টি হয় এবং এসব ছিদ্রপথে চরিত্রহীনতার নানা কুঅভ্যাস প্রবেশ করে পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্যকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রের পশু সম্পদ উটের চারণ ভূমি পরিদর্শনে তিনি গেলেন এবং দেখলেন রাষ্ট্রের কর্মচারী উটের রাখাল উলংগ হয়ে শুয়ে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লোকটিকে চাকরী হতে অপসারিত করে বললেন, 'যে নির্লজ্জ সে আমাদের কোন কাজের নয়।' অর্থাৎ নির্লজ্জ কোনো ব্যক্তির পক্ষে গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। সে ব্যক্তি নির্লজ্জের মতো ঘুষ খেয়ে দেশ জাতির চরম ক্ষতি করতে পারে।

মুসলিম পরিবারে লজ্জা এক বিরাট সম্পদ। এই লজ্জা নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করে। ইসলাম লজ্জা-শরমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে পৃথিবীর কোন সভ্যতায়, কোন জাতির মধ্যে, কোন ধর্মেও নেই। হিন্দু ধর্ম তো নারী ও পুরুষের গোপনস্থান নির্মাণ করে তার পূজা পর্যন্ত করে। পৃথিবীতে বর্তমানে যারা নিজেদেরকে সুসভ্য জাত বলে দাবী করে, পোশাক তাদের কাছে লজ্জা আবরণের মাধ্যম নয়– সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। ওরা নারী ও পুরুষে অগণিত মানুষের সম্মুখে সেই আচরণ করে, আমাদের দেশে পশু-প্রাণী বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে প্রকাশ্যে যে আচরণ করে থাকে।

কিন্তু ইসলামে পোষাকের মাধ্যমে নারী-পুরুষের গোপন অঙ্গ আবৃত করার গুরুত্ব বেশি, সৌন্দর্য প্রকাশের গুরুত্ব কম। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি আবেদন করলাম, 'পুরুষের সম্মুখে পুরুষের এবং নারীর সম্মুখে নারী সতর করাও কি জরুরী? তিনি বললেন, 'অপর কেউ তোমার সতর করার অংগসমূহ দেখবে না এমনটি করা যদি সম্ভব হয়, তবে অবশ্যি তা করো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি একা থাকি এবং আমার কাছে যদি কেউ বর্তমান না থাকে, সে অবস্থায় কি আমার গোপন অঙ্গ উন্মুক্ত করতে পারি? তিনি বললেন, 'আল্লাহই সর্বাধিক অধিকারী যে, তাঁর সম্মুখে লজ্জা অনুভব করবে।'

আল্লাহর সামনে সর্বাধিক লজ্জা অনুভব করার অর্থ হলো, একজন মুসলমানের উচিত, সাধ্যানুযায়ী সতরের অংগসমূহ ঢেকে গোপন করে রাখা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন পুরুষ অপর পুরুষের গোপন অংগের প্রতি তাকাবে না। কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের (লেপ, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদি) নিচে শুবে না। কোনো নারী অপর নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে শুবে না।' এক কাপড়ের নিচে না শোয়ার অর্থ হলো, খালি গায়ে একজনের সাথে আরেকজন পাশাপাশি না শোয়া।

ইসলাম মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বামীকে দিয়েছে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে দিয়েছে স্বামী। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনেও মানুষকে এই অধিকার দেওয়া হয়নি যে, সে আবেগঘন মুহূর্তে তার মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর বিধানকে ভুলে যাবে, পরস্পরে লজ্জাহীনের ন্যায় আচরণ করবে এবং পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর গোপন জীবনের কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ-وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ

-وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

কিন্তু তোমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং আল্লাহর নাফরমানী ও অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকবে। জেনে রেখো, তোমাদেরকে একদিন আল্লাহর সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে। (হে নবী, তোমার উপস্থাপিত বিধান যারা অনুসরণ করবে) তাদেরকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দাও। (সূরা বাকারা-২২৩)

উল্লেখিত আয়াতের শুরুতে স্বামী-স্ত্রীর একান্ত জীবনে পরস্পরের কাছাকাছি আসার বিষয়টি উৎসাহিত করেই বলা হয়েছে, 'তোমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করবে।' স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে একে অপরের কাছাকাছি আসবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সন্তান দান করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে, 'তোমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করবে।'

পবিত্র কোরআনের গবেষকগণ বলেন, মহান আল্লাহর উক্ত কথার দুটো অর্থ হতে পারে এবং প্রথম অর্থ হলো, উক্ত সময় নিজের বংশ রক্ষার বিষয়টির জন্য বান্দা চেষ্টা করবে, যেনো সে বান্দা এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করার পূর্বে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো লোক বর্তমান থাকে। দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, নবাগত বংশধরকে যদি সে বান্দা নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে আগ্রহী হয়, তাহলে সে যেনো নবাগত বংশধরকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান, উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং অন্যান্য সৎগুণে গুণান্বিত করে যাওয়ার চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

উল্লেখিত আয়াতে এ কথা যেমন বলা হলো যে, স্বামী-স্ত্রী নির্জনে একান্ত জীবনে আবেগঘন মুহূর্তেও আল্লাহর বিধান সম্পর্কে উদাসীন থাকবে না, বাস্তবতা স্মরণে রাখবে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবে না এবং নেক সন্তানের জন্য চেষ্টা করবে। এ কথার শেষেই বলা হয়েছে, আল্লাহর নাফরমানী ও অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকবে। জেনে রেখো, তোমাদেরকে একদিন আল্লাহর সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে। (হে নবী, তোমার উপস্থাপিত বিধান যারা অনুসরণ করবে) তাদেরকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দাও।

অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের একান্ত মুহূর্তেও এমন আচরণ করা যাবে না, যে আচরণ মহান আল্লাহর নাফরমানীমূলক এবং যে আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ জন্যই বলা হয়েছে, আল্লাহর নাফরমানী ও অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকবে।

এরপর সতর্ক করে বলা হয়েছে, একান্ত নির্জনে যে আচরণই তোমরা করো না কেনো, এসব আচরণের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, যেদিন তোমরা মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, তোমাদেরকে একদিন আল্লাহর সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতে হবে।

দাম্পত্য জীবনে যারা সংযত ও মার্জিত আচরণ করবে অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাম্পত্য জীবনে যে আচরণ করতেন, সেই আচরণ যারা অনুসরণ করবে, তারা অবশ্যই কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ করবে। অর্থাৎ নগদ কল্যাণ ও সৌভাগ্যের মধ্যে এটাই যে, তারা নেক সন্তান লাভ করবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, হে নবী, তোমার উপস্থাপিত বিধান যারা অনুসরণ করবে, তাদেরকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দাও।

বর্তমানকালের অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রী বিয়ের পরপরই সন্তান চান না এবং সন্তান যেনো গর্ভে আসতে না পারে, এ জন্য তারা পাশ্চাত্য দুনিয়া কর্তৃক আবিষ্কৃত নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে। অর্থাৎ তারা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে। সন্তানকে তারা ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রে বাধা ও নিজেদের জন্য বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এরপরেও তাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কোনো অসচেতন মুহূর্তে সন্তান গর্ভে এলেও গর্ভপাত করে থাকে। বিশেষজ্ঞ যদি গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে মায়ের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে, তাহলে একান্ত অনিচ্ছাভরে সেই অবাঞ্ছিত বোঝা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত বহন করা হয়।

www.pathagar.com

যাকে চাওয়া হয়নি, একান্তই বোঝা মনে করা হয়েছে এবং গর্ভেই হত্যা করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখা হয়নি, সেই অনাকাঙ্খিত-অবাঞ্ছিত বোঝা পৃথিবীতে এসে পিতামাতার জন্য কল্যাণের প্রতীক হবে কিভাবে? পূর্বে যেমন তাকে বোঝা মনে করা হয়েছে, পৃথিবীতে আসার পরে সে বোঝা হিসেবেই পিতামাতার সাথে আচরণ করবে, এতে সন্দেহ নেই।

কোনো কোনো আধুনিক দম্পতি মন্তব্য করে থাকে যে, 'বাচ্চা নেওয়ার সময় এখনও হয়নি, আরো কিছু দিন পরে নেবো।' হতভাগা আর কাকে বলে! সন্তান যেনো অনাদরে-অবহেলায় ফোটা বন্য ফুল, যখন খুশী বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে খোপায় গোজা যায়। এই ধরনের কথা বলা ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্। সন্তান দেওয়ার মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। নারী-পুরুষ একদিন নয়– কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও গর্ভে সন্তান আনতে পারবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া করে সন্তান দান করে থাকেন।

সুতরাং দাম্পত্য জীবনে সংযত ও মার্জিত আচরণের মাধ্যমে সন্তানের জন্য যেমন চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহর নবীর শিখানো দেওয়াও করতে হবে। তাহলে আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মায়ের গর্ভে সুসন্তান দান করবেন।

গর্ভে সন্তান-স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসার সাথে সাথে উভয়ের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত কাজে লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম করণীয় হলো মহান আল্লাহর কাছে দোয়া। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে মহান আল্লাহর কাছে নেক ও সুস্থ সন্তান কামনা করতে হবে, সন্তান যেনো গর্ভ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু হিসেবে পৃথিবীতে আসে, পঙ্গু বা কোনো ধরনের অঙ্গহানী যেনো না থাকে এবং প্রসবকালে মা ও শিশু উভয়েই যেনো সুস্থ থাকে, এই দোয়া করতে হবে।

সন্তান গর্ভে আসার পর গর্ভস্থ সন্তান যেনো যথাযথভাবে বৃদ্ধিলাভ করে এবং এ ব্যাপারে যেনো কেনো ত্রুটি না ঘটে সেদিকে পিতামাতা এবং পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য, হাঁটা, চলাফেরা, আহারাদি ও বিশ্রামের দিকে স্বামীকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং স্ত্রী ও স্ত্রীর গর্ভের সন্তান, উভয়ের সুস্বাস্থ্যের জন্য যথাসম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে, একটি দুর্বল মানব দেহের অভ্যন্তরে আরেকটি মানব দেহ গঠিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সে মানব শিশু পৃথিবীতে আগমন করবে। এ সময় মায়ের দৈহিক ও মানসিক উভয় দিকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। নতুবা মেধাবী ও স্বাস্থ্যবান সন্তান আশা করা বৃথা।

গর্ভ সঞ্চার হয় মায়ের এবং মা'কেই নিজের প্রতি অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজের স্বাস্থ্য ও মন-মানসিকতা সুস্থ রাখার জন্য স্বচেষ্ট হতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা গর্ভস্থ সন্তানের সাথে মায়ের দেহ ও মনের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এ সময় মা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এবং যথানিয়মে আহার না করে, তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের শারিরীক গঠন ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে মায়ের গর্ভে সন্তান রয়েছে, সেই সন্তানের ওপর মায়ের চিন্তা-বিশ্বাস, চলাফেরা তথা সার্বিক আচার-আচরণ প্রভাব বিস্তার করে।

এ সময় মা যদি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, আধুনিকতার নামে নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করে, অর্থহীন গল্পে নিজেকে মাতিয়ে রাখে, খেলা দেখে, চরিত্র বিধ্বংস উপন্যাস পাঠ এবং সিনেমা দেখে সময় অতিবাহিত করে, তাহলে গর্ভের সন্তানও মায়ের অনুরূপই নির্লজ্জ ও চরিত্রহীন হবে এবং এর প্রকাশ ঘটবে সন্তান যখন যৌবন বয়সে উপনীত হবে।

সন্তান গর্ভে থাকাকালে পিতামাতা উভয়েই যদি মহান আল্লাহর বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে, বিশেষ করে মা যদি চরিত্রবতী আদর্শ নারী হয়, ধৈর্যশীলা, সুভাষিনী, মধুর আচরণের অধিকারিণী হয়, শালীনতার সার্বিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে, সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত যদি মায়ের মন-মানসিকতায় মহান আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা স্মরণ থাকে, পরকাল ও আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির ভয় জাগ্রত থাকে, যথানিয়মে নামায-রোজা আদায় করে, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে, তাহলে সে মায়ের সন্তানও পৃথিবীতে ঐ অভ্যাস নিয়েই আগমন করবে, গর্ভে থাকাকালে তার মা যে চিন্তা ও কর্ম করেছে। সন্তান বড় হতে থাকবে আর সেই সাথে একটু একটু করে মায়ের কাছ থেকে পাওয়া সেই সৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিকশিত হতে থাকবে।

www.pathagar.com

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে করণীয়

সন্তান গর্ভে এলেই যথানিয়মে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং যথাসম্ভব হাসপাতালেই প্রসবের ব্যবস্থা করতে হবে। হাসপাতালে সম্ভব না হলে বাড়িতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসবের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় প্রসূতি এবং বাড়ির অন্য মহিলা সদস্যদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনোক্রমেই যেন পর্দা লংঘন না হয়। অবিবাহিতা এবং শিশুরা যেনো প্রসবকালে প্রসূতির ঘরে যাতায়াত করতে না পারে। প্রসবকালে অন্য যেসব মহিলারা প্রসূতির কাছে থাকেন, তারাও যথাসম্ভব প্রসূতিকে আবৃত রেখেই প্রসব কাজ সমাধা করার চেষ্টা করবেন এবং মহান আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকবেন। কারণ এ সময়টি প্রসূতি ও শিশুর জন্য বড়ই নাজুক। একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো শক্তির ক্ষমতা নেই যে, প্রসূতি ও শিশুকে জীবিত রাখবে এবং প্রসূতির কষ্ট লাঘব করবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেই তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হবে। অর্থাৎ তাওহীদের ঘোষণা সর্বপ্রথমে সন্তানের কর্ণকুহরে শোনাতে হবে। হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে যে কথা শুনিয়েছিলেন, সন্তান পৃথিবীর আলো-বাতাস স্পর্শ করার সাথে সাথে তার কানে তাওহীদের সেই ঘোষণা যেনো প্রবেশ করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। হযরত আবু রা'ফে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত হোসাইন যখন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি তার কানে নামাযের আযান শোনাতে দেখেছি। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্‌মাদ)

অর্থাৎ পৃথিবীতে মানব সন্তান আগমন করার সাথে সাথেই তাকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হলো যে, একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই এবং তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, ইলাহ্, মা'বুদ এবং রব। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে এবং তাঁরই আইন-কানুন ও বিধান অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে সেইভাবে, যেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আল্লাহর নবীই হলেন একমাত্র আদর্শ নেতা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। শিশুর কানে আযান শুনিয়ে উল্লেখিত কথা দিয়েই শিশুর প্রশিক্ষণের সূচনা করা হলো।

পরবর্তীকালে প্রশিক্ষণ গ্রহণের বয়সে উপনীত হলে শিশুকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসার সাথে সাথে তাকে শোনানো

www.pathagar.com

হয়েছিলো, 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহ মহান তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।' এ কথাটি মুসলমানদের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মুসলিম শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে তার কানে শোনানো হয় আল্লাহু আকবার তথা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবী থেকে একজন মুসলমান যখন বিদায় গ্রহণ করে অর্থাৎ যখন তার জানাযা আদায় করা হয়, তখনও বার বার উচ্চারণ করা হয় আল্লাহু আকবার।

অর্থাৎ মুসলিম জীবনের সূচনাও হয় আল্লাহু আকবার শব্দটি শোনার মধ্য দিয়ে এবং পৃথিবীর জীবনের শেষও হয় আল্লাহু আকবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীতে জীবিত থাকতে সে মুখে বার বার এই কথাটি উচ্চারণ করে। নামায আদায়কালে নামায শুরুই করতে হয় আল্লাহু আকবার শব্দটি উচ্চারণ করে এবং প্রত্যেক দিন ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কালে প্রায় দুই শতেরও অধিক বার এই শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়। অর্থাৎ মুসলিম জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিতে হয়।

অসংখ্য অগণিত বাক্যাবলীর সারমর্ম ও সমষ্টি হলো আল্লাহু আকবার শব্দ দুটো। এই দুটো শব্দের মধ্য দিয়ে অগণিত বাক্য উচ্চারিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কে, তিনি কোন্ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী এবং তাঁর ক্ষমতা কি ধরনের– অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে এই আল্লাহু আকবার শব্দ দুটোর মাধ্যমে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও একক, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি সমস্ত সৃষ্টির রব, মালিক, ইলাহ্, তিনি আহ্কামুল হাকিমীন ও আরহামুর রাহিমীন, তিনিই যাবতীয় সম্মান মর্যাদার অধিকারী। যাবতীয় প্রশংসা শুধুমাত্র তাঁরই জন্য এবং হাম্দ ও তাস্বীহ শুধুমাত্র তাঁরই জন্য হওয়া উচিত, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই তাস্বীহ্ করছে, তিনি উত্তম নামের অধিকারী, তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি তওবা কবুলকারী, তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, তিনি যাবতীয় কিছু শ্রবণকারী, তিনি প্রবল ক্ষমতাশালী, তিনি কঠোর শাস্তিদানকারী, তিনিই আকার-আকৃতি রচনাকারী, তিনি প্রশস্ততা বিধানকারী, তিনি অপরিসীম বরকতশালী, তিনি উত্তম প্রতিফল দানকারী, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে পবিত্র, তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় কিছু তাঁর সম্মুখে সিজ্দাবনত।

তাঁর থেকে বড় ওয়াদা পূরণকারী আর কেউ নেই, তিনি অঙ্গীকারের বিপরীত কাজ করেন না, তিনিই সহায় ও আশ্রয়, তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী এবং সর্বোত্তম রক্ষক, তিনি দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী, তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী, তাঁর থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় নেই, আস্থা স্থাপনের জন্য তিনিই যথেষ্ট,

www.pathagar.com

তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা, যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণতি তাঁরই হাতে, তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই, কেউ তাঁর অংশীদার হওয়া থেকে তিনি পবিত্র, তিনিই দাসত্ব-ইবাদাত লাভের অধিকারী, তিনিই বিশ্বলোকের সবকিছুর পথনির্দেশ দানকারী এবং সঠিক পথ প্রদর্শনকারী, প্রতিটি জিনিসের ওপর তাঁর রহমত পরিব্যপ্ত, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য, তাঁর কাছেই প্রত্যেককে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশমান এবং তিনি প্রচ্ছন্ন, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনিই প্রাণ দানকারী, তিনিই নিষ্প্রাণকে জীবন দান করেন এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করে আনেন, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বধানকারী, তিনিই সব জিনিসের ভান্ডারের মালিক, তিনিই সব জিনিসের তকদীর নির্ধারণকারী, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র তাঁরই আয়ত্বে, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না।

কোনো কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়, তাঁর সিদ্ধান্ত অটল ও অপরিবর্তনীয়, তিনি মুখাপেক্ষিহীন, মানুষ তাকে স্রষ্টা মানলে তবেই তিনি স্রষ্টা হবেন– এ প্রয়োজন তাঁর নেই, তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোনো কিছু নেই, তাঁর সকল ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর একটি আদেশের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে যায়, তাঁর পরিকল্পনায় কোনো ব্যর্থতা নেই, তিনি যার সাথে রয়েছেন, কেউ তার মোকাবেলা করতে পারে না, তাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই, বিজয় ও সফলতা তাঁর অনুগ্রহেই অর্জিত হয়, তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেই থাকেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোনো নি'মাত লাভ করতে পারে না, তিনি মানুষের অবোধগম্য পন্থায় নিজ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন, তিনি যাকে চান তাঁর যমীনের উত্তরাধিকারী বানান, তিনি যাকে চান নিজের রহমত দানে ধন্য করেন, আনন্দ-বেদনা তাঁরই করায়ত্বে, যে বান্দাকে তিনি চান আপন অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত করেন, যাকে চান উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তিনি যাকে লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্থ করতে চান, তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই, তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, কল্যাণ কোন্ জিনিসে আর কোন্ জিনিসে নয়। সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি কারো কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন, তাঁর ফয়সালা অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে ভুল ভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই, তাঁর পক্ষে সকল মানুষকে সৃষ্টি এবং পুনরায় জীবিত করে উঠানো কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার নয়।

আল্লাহর বিধানকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনি তাঁর বিধানও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এর মোকাবেলায় অন্য কোনো বিধান অনুসরণের যোগ্য নয়। আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর

www.pathagar.com

বিধানকেই সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চে স্থান দিতে হবে। আল্লাহু আকবর– বলার অর্থই হলো, মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ব্যতীত এই পৃথিবীতে যত মতবাদ মতাদর্শ, নিয়ম-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন, বিধি-বিধান যেখানে যা কিছু রয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ ও মা'বুদের দাবীদার যে যেখানে আছে, সবই আমার পায়ের নীচে। আল্লাহ তা'য়ালাই আমার একমাত্র মা'বুদ ও ইলাহ এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধানই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। উপযুক্ত বয়সে শিশুর মন-মস্তিষ্কে উল্লেখিত কথাগুলো প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে।

শিশু সন্তানকে প্রতিপালন

শিশু মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো-বাতাসে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই তার আহারের প্রয়োজন হয়। শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা পৃথিবীর মানুষ করেনি, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার বহু পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা শিশুর সর্বোত্তম খাদ্য তার মায়ের বুকে প্রস্তুত করে রাখেন। অনেকে না জানার কারণে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরেই মায়ের বুকের প্রথম দুধ ফেলে দেয়। ধারণা করে এ দুধ পান করলে শিশুর শারীরিক ক্ষতি হবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো মায়ের বুকের প্রথম দুধ সন্তানের যাবতীয় রোগের প্রতিষেধক। এ দুধ অত্যন্ত উপকারী এবং তা শিশুকে অবশ্যই পান করাতে হবে। শুধু সন্তানের জন্যই দুধ উপকারী নয়– সন্তানকে দুধ পান করানোর মধ্যে মায়ের জন্যও বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেছে, যে মায়েরা সন্তানকে দুধ পান করায় সেই মায়েদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে না।

মাতৃগর্ভে সন্তান যেন বৃদ্ধি হয়, এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মায়ের একটি নাড়ী সন্তানের নাভীর সাথে যুক্ত করে দিয়ে ঐ নাড়ীর মধ্য দিয়ে শিশুর দেহে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। এরপর শিশু যখন পৃথিবীতে এলো তখন তার দেহ থেকে ঐ নাড়ী বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। গর্ভে থাকাবস্থায় মাত্র একটি লাইন দিয়ে শিশুর দেহে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা করেছিলেন। আর সেই একটি লাইন বিচ্ছিন্ন করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তার খাদ্য সরবরাহের জন্য মায়ের বুকে দুইটি লাইনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মায়ের বুকের দুধ এমন শক্ত নয় যে শিশু চুষে পান করতে পারবে না। মায়ের বুকের দুধে ছিদ্র একটি নয়। একটি ছিদ্র থাকলে প্রবল বেগে দুধ নির্গত হয়ে শিশুর কণ্ঠনালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মায়ের বুকের দুধে বত্রিশটি ছিদ্র দিয়েছেন। এই ছিদ্রসমূহ দিয়ে এমন গতিতে দুধ নির্গত হয় যেন শিশুর শ্বাস বন্ধ হয়ে না যায়।

www.pathagar.com

সন্তানের এটা বড় অধিকার যে, সে মায়ের দুধ পান করার অধিকার পাবে। নারীর স্বভাব এবং সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেও এটা গণ্য যে, সে তার গর্ভজাত সন্তানকে দুধ পান করাবে এবং এটা মাতৃত্বের দাবী। বৈধ কোনো কারণ না থাকলে মা অবশ্যই তার সন্তানকে দুধ পান করাবে। মায়ের দুধ শিশুর জন্য অপূর্ব সুষম খাদ্য। মানব সন্তান হোক অথবা পশু শাবকই হোক, নিজের মায়ের দুধের মোকাবেলায় অন্য কোনো খাদ্যই তার জন্য সুষম নয়। মায়ের দুধ সন্তানের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সন্তানের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধিতে মায়ের দুধের যতটা মুখ্য ভূমিকা আছে অন্য কোনো খাদ্যে তা নেই। সন্তানের সুন্দর স্বাস্থ্য গঠনে মায়ের দুধ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এ খাদ্য শুধু সন্তানের দেহের জন্যই প্রযোজ্য নয়-সন্তানের আত্মিক, চারিত্রিক, নৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং সন্তানের আবেগ অনুভূতিও নিয়ন্ত্রণ করে মায়ের দুধ।

বর্তমান বিজ্ঞানও একথার সাক্ষ্য বহন করে, যে খাদ্য মানুষ আহার করে সে খাদ্য মানুষের আবেগ-অনুভূতি, চরিত্র-স্বভাব এবং মানুষের সার্বিক ব্যবহার ও কর্মের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। সন্তান শুধু মায়ের দুধই মায়ের বুক থেকে পান করে না। মায়ের স্বভাব চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি মায়ের দুধের সাথে সাথে সন্তানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এ কারণে মা'কে হতে হয় অত্যন্ত পরহেযগার-আল্লাহভীরু। দুধ যেহেতু মানব সন্তানের প্রথম খাদ্য এ কারণে মায়ের দুধ পান করানোর বিষয়টি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ পিতামাতার অন্তরে সন্তানের প্রতি অসীম মায়া মমতা ভালোবাসা প্রেম এবং আবেগ-উচ্ছাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানসিকভাবে সন্তানকে লালন পালন করার প্রবণতাও দিয়েছেন। সন্তানের জন্য যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, কষ্ট সহ্য করার মতো মানসিক প্রস্তুতিও আল্লাহ তা'য়ালা পিতামাতার মধ্যে দিয়েছেন। পৃথিবীকে সচল রাখা ও মানব জাতীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই আল্লাহ তায়ালা এসব অনুপম গুণ-বৈশিষ্ট্য পিতামাতা ও সন্তানের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দিয়েছেন। পিতামাতার কাছে সন্তানের যতগুলো দাবী রয়েছে, তাকে প্রতিপালন করবে– সন্তানের এটা অন্যতম দাবী। পৃথিবীতে সন্তানের অস্তিত্বের জন্য যেমন পিতামাতা প্রয়োজন তেমনি তাকে প্রতিপালনের জন্যও পিতামাতার সান্নিধ্য পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শৈশবকালে সন্তানের বড় হয়ে ওঠা, তার বুদ্ধির বিকাশ, মানসিক গঠন যথাযথভাবে হওয়ার জন্য পিতামাতার পরম স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, আদর-যত্ন একান্ত প্রয়োজন। কারণ শিশুর জন্য তার শৈশবকাল অত্যন্ত অসহায়ের সময়। এ সময় সে

www.pathagar.com

প্রতিটি প্রয়োজনে থাকে অন্যের মুখাপেক্ষী। এ জন্য পিতামাতার কাছে সন্তানের বড় অধিকার যে তাকে তার পিতামাতা অন্তর দিয়ে প্রতিপালন করবে। পিতামাতা সন্তানের প্রতিপালনের জন্য যে ভূমিকা পালন করে, এই ভূমিকা পিতামাতা ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষেই যথাযথভাবে পালন করা অসম্ভব।

সন্তানকে প্রতিপালন করতে হলে প্রয়োজন অসীম ধৈর্য, সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা, হৃদয় ভরা প্রেম-ভালোবাসা, অসীম মমতা, যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করার মানসিক ক্ষমতা। কোন আয়া বা নার্সের কাছ থেকে শিশু সন্তান উল্লেখিত বিষয়সমূহ যেমন লাভ করতে পারে না, তেমনি পারে না অর্থের বিনিময়ে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পিতামাতার অন্তরে সন্তানকে প্রতিপালনের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি এবং যাবতীয় গুণাবলী দান করেছেন যেন পিতামাতা সন্তানের অধিকার আদায় করতে পারে। এ কারণেই সন্তানকে প্রতিপালন করার সময় পিতামাতা নানামুখী কষ্ট, দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেও কোনো অভিযোগ করে না। মনে কোন ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে না, বরং অন্তরে নিবিড় এক প্রশান্তি অনুভব করে।

সন্তানের জন্য পিতামাতা যতই দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করুক না কেনো, সন্তানের প্রতি যখন তারা একবার মমতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন তাদের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ চিহ্নটুকু মুছে যায়, ভুলে যায় তারা যন্ত্রণার সাগর পাড়ি দেওয়ার কথা। এ যে আল্লাহর কত বড় নে'মাত তা কল্পনাও করা যায় না। পিতামাতার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা এই গুণ-বৈশিষ্ট না দিলে কারো পক্ষেই সন্তানকে প্রতিপালন করা সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না এ অসীম দুঃখ যন্ত্রণামূলক কর্তব্য পালন করা।

মা! সারা পৃথিবীর মাধুর্যতা জড়িয়ে রয়েছে এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে। মায়ের কী অসীম মমতা! নির্দিষ্ট মাস পর্যন্ত সন্তানকে গর্ভে বয়ে বেড়ানো, নিজের জীবনীশক্তি একটু একটু করে ক্ষয় করা মা ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব! সন্তান পেটে করে মা একটি দিনও আরামে ঘুমাতে পারেনি। খেতে বসেছে মা, গর্ভের সন্তান নড়ে উঠেছে, হাত-পা হাঁটু দিয়ে আঘাত করেছে। মা খাদ্য পেটে রাখতে পারেনি, বমি করে ক্ষুধার্ত থাকতে বাধ্য হয়েছে। নিজেকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে সন্তানকে জন্ম দিয়েছে মা। সেই শিশু সন্তানের তখন কতই না অসহায় অবস্থা! না নড়তে পারে, আর না কথা বলতে পারে। শরীরে ব্যথা পেলে বা পেটে ক্ষুধা অনুভব হলেও বলতে পারে না। সন্তান তখন অসহায় গোস্তের একটি টুকরা। সন্তান প্রসব করে মা রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে-চরম অসুস্থ অবস্থায় নিজের জীবনের মমতা বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে মমতাময়ী মা।

www.pathagar.com

গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছে। নিজেকে নিয়োজিত করেছে সন্তানের যত্নে। সন্তান বারবার রাতে কেঁদে উঠেছে। প্রচণ্ড শীতের পরিবেশে মায়ের শরীরে মলমূত্র ত্যাগ করেছে সন্তান, রাতে ঘুমাতে দেয়নি। তবুও মায়ের নেই কোনো এতটুকু অভিযোগ। সন্তান সামান্য অসুস্থ হলে মায়ের কলিজায় তীর বিদ্ধ হয়েছে। সন্তানের কষ্ট দেখে মা যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। একই অবস্থা পিতারও। পিতা নিজের রক্ত পানি করে যা উপার্জন করেছে, তা শিশুর জন্য খরচ করতে মোটেই দ্বিধা করে না। শরীর ঝলসানো গরমে, কাঠ ফাটা রৌদে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এবং রক্ত জমে যাওয়া ঠাণ্ডায় অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে যা কিছু উপার্জন করে তা সন্তানদের জন্যই করে। কষ্টলব্ধ সে অর্থ সন্তানদের জন্য খরচ করে পিতা অন্তরে কষ্ট পায় না, বরং আত্মিক শান্তি অনুভব করে।

মা একাই সন্তানের সেবা-যত্ন করবে, পিতা শুধু সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করেই নিষ্কৃতি পাবে এমন হতে পারে না। মাতা ও পিতা সমানভাবে সন্তানের প্রতি যত্ন নেবে। একটি শিশুর সবদিকে প্রবৃদ্ধির প্রতি তারা লক্ষ্য রাখবে। শিশুর আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং তাকে নানা ধরনের বিপদ-প্রতিকুল অবস্থা থেকে হেফাজত করবে। শিশুর রুচির দিকে খেয়াল রাখবে। শিশুর ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য দেবে। শিশুর মধ্যে সচেতনতা, মানবিকতা, দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করবে পিতামাতা। তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির প্রতি যত্নবান হবে ও তার চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেবে। শক্তিমান, বুদ্ধিমান তথা সবদিক দিয়ে সুন্দর সন্তান পেতে চাইলে সন্তান গর্ভে থাকতেই যত্ন নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সন্তান বহনকারী মাতার প্রতি যত্ন নিলেই সন্তানের প্রতি যত্ন নেয়া হয়।

শিশুর আকীকা

মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো-বাতাসে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরে পিতামাতার প্রথম কর্তব্যই হচ্ছে আকীকা আদায় করা। আকীকা বলতে সেই পশুকে বুঝানো হয়, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিনের দিন যে পশুকে সাদকা হিসেবে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের সন্তান এবং নিজের মেয়ে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সন্তানদের আকীকা দিয়েছেন। সন্তানের আকীকা দেয়া অবশ্য কর্তব্য, কোনো কোনো চিন্তাবিদ বলেছেন অবশ্য কর্তব্য নয়– তবে দেয়া উত্তম। না দিলে গোনাহ্ হবে না। কিন্তু সামর্থ থাকলে অবশ্যই দেয়া উচিত। আকীকা সন্তানের জীবনের সাদকা বিশেষ।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটি শিশু সন্তান তার আকীকার নিকট বন্দী, তার জন্মের সপ্তম দিনে তার উপলক্ষ্যে পশু যবেহ করা হবে, তার নামকরণ করা হবে এবং তার মাথার চুল কাটা হবে। (বোখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, তিরমিজী)

প্রাচীন আরব সমাজে আকীকা করার প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল, এর মধ্যে নাগরিক মনস্তাত্বিক, সামাজিক তথা সর্বপ্রকার কল্যাণবোধ নিহিত ছিল। এসব কল্যাণকর কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীকার প্রথা চালু রেখেছিলেন। অন্যকে আকীকার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং স্বয়ং নিজেও আকীকা দিয়েছেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর আকীকা সম্পর্কে নবীজী নিজের মেয়েকে বলেছিলেন, হে ফাতিমা! এর মাথার চুল কেটে দাও এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সাদকা করে দাও।' আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর সন্তানদের মাথার চুল কেটে দিয়েছিলেন এবং সেই চুলের সমপরিমাণ রূপা সাদকা করেছিলেন। তিরমিযীর আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিনের দিন সন্তানের নামকরণ, মাথার চুল কেটে দেয়া ও আকীকা করতে বলেছেন।

আকীকা অনুষ্ঠানে যে পশু যবেহ করা হবে সে পশু সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পুত্র সন্তানের জন্য দুটো ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবেহ করাই যথেষ্ট হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাছায়ী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের খুবই আদর-যত্ন করতেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, উম্মে সুলাইম যখন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন তখন তাঁকে নবীজীর কাছে আনা হলো এবং সেই সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দেয়া হলো। নবীজী সে খেজুর নিজের মুখে নিয়ে ভালোভাবে চিবিয়ে খুব নরম করে নিলেন এবং নিজের মুখ থেকে বের করে তা শিশুর মুখে দিলেন এরপর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। (বোখারী)

ছাগলও যবেহ করা যায় ছাগীও যবেহ করা যায়। পুত্র সন্তানের জন্য দুটোই যে যবেহ করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। একটি যবেহ করলেও হবে। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনেই আকীকা করা উত্তম। সম্ভব না হলে ১৪ দিনে বা ২১ দিনে অথবা তার পরেও করা যায়।

www.pathagar.com

পুত্র সন্তানের খাত্না

মাতৃগর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে সন্তান যদি সুস্থ থাকে, দুর্বল না হয় তাহলে পুত্র সন্তানের খাতনা ঐ আকীকার দিনেই করে দেওয়া উচিত। খাতনা করার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। আকীকার দিন অর্থাৎ সাত দিন বয়সে পুত্র সন্তানের খাতনা করা এ জন্য উপকারী যে, শিশুর চামড়া সে সময় থাকে অত্যন্ত কোমল এবং পাতলা। খাতনা করার ফলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় সে সময় ঐ ক্ষত অত্যন্ত দ্রুত আরোগ্য হয়।

ইসলাম পাঁচটি কাজকে উত্তম স্বভাব বা সুন্দর প্রকৃতি হিসাবে অখ্যায়িত করেছে। এ পাঁচটি কাজই হলো পবিত্রতার নির্দশন। এ পাঁচটি কাজ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচটি কাজ সুন্দর স্বভাবের মধ্যে পরিগণিত। খাতনা করা, নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করা, বগলের চুল উঠানো, মোচ কাটা এবং নখ কাটা।'

খাতনা পদ্ধতি আবহমান কাল থেকেই নবী-রাসূলদের নিয়ম হিসেবে চলে আসছে। সকল নবী-রাসূল খাতনা করেছেন। প্রত্যেক শরীয়তেই খাতনার আদেশ ছিল। ইসলামী শরীয়তেও খাতনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। এ জন্য পুত্র সন্তান ভুমিষ্ঠ হবার সপ্তম দিনেই খাতনা করা প্রয়োজন। সম্ভব না হলে ৪০ দিন বয়সের মধ্যেই খাতনা করা উচিত। এর মধ্যেও সম্ভব না হলে পরেও করা যায়। তবে বেশী বয়স হলে নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেননা লজ্জাশীলতার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। সন্তানের মধ্যে লজ্জাশীলতা প্রবল হয়ে পড়লে সে নিজের লজ্জাস্থান অন্যকে দেখানো বা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করতে চাইবে না। বেশী বয়সে জোর করে সন্তানকে খাতনা করাতে গেলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। অপর দিকে বয়স বেশী হলে শরীরের চামড়া ঘন এবং মোটা হয়ে যায়। এ সময় খাতনা করতে গেলে যন্ত্রণা বেশী হবারই কথা।

আকীকা ও খাতনা অনুষ্ঠান

আকীকা ও খাতনা করার অনুষ্ঠানটি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সাথে সম্পর্কিত। যদি কেউ এই অনুষ্ঠান পালন করতে চায় তাহলে তা করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অনাড়ম্বরের সাথে। অর্থ-বিত্তশালী লোকজন আকীকা ও খাতনা উপলক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কার্ড ছাপিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হয়। অতিথিদেরকে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। তবে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে, উপহার লাভের উদ্দেশ্যে, প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে, গান-বাজনা এবং রং ছিটানোর ব্যবস্থা করে আকীকা ও খাতনা অনুষ্ঠান করলে সওয়াব পাওয়া যাবে না বরং মারাত্মক গোনাহ্ হবে।

বর্তমানে মুসলিম সমাজে আকীকা ও খাতনা অনুষ্ঠানের নামে অমুসলিমদের ন্যায় দোল পূজা চালু হয়েছে। রং ছিটিয়ে যুবক-যুবতীদের বেলেল্লাপনা চালু হয়েছে, শতশত মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয় উপহারের আশায়। নিজে কতটা অর্থ-সম্পদের মালিক তা জাহির করার উদ্দেশ্যে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর সাথে ইসলাম নির্দেশিত আকীকার দূরতম সম্পর্কও নেই। এই কর্মকান্ড আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে উপহাস করার শামিল।

ইসলামের সোনালী যুগে আকীকা বা খাতনা উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল না। কাউকে দাওয়াতও দেওয়া হতো না। তবে সৎ নিয়তে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। পরিচিত মহলে বা আত্মীয়দেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে, খোরমা খেজুর বা অন্য কোনো মিষ্টি বিতরণ করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে যে, তারা সন্তানের জন্য দোয়া করবে। কোনো বিনিময় পাবার আশায় বা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে খাতনা বা আকীকা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা ইসলামী শরীয়াতে জায়েজ নেই।

শিশুর নামকরণ

অর্থবোধক ও শ্রুতিমধুর সুন্দর নামে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও মনস্তাত্বিক দিক দিয়েও অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। নাম আবেগ-অনুভূতির উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এর বাস্তব প্রমাণ হলো, কাউকে অর্থহীন শ্রুতিকটু নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়-ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। আবার অর্থবোধক সুন্দর নামে কাউকে আহ্বান জানালে সে সন্তুষ্ট হয়-খুশী প্রকাশ করে। পিতামাতার কাছে সন্তানের এটা অধিকার যে, তারা সন্তানের একটি অর্থবোধক শ্রুতিমধুর সুন্দর নাম রাখবে। পিতামাতার মনেরও এটা স্বাভাবিক দাবী যে, তার সন্তানকে মানুষ সুন্দর শ্রুতিমধুর নামে আহ্বান করুক। শিশুও চায় তাকে উত্তম নামে সম্বোধন করা হোক। মানুষ নিজের উত্তম নাম শুনলে নিজেকে মর্যাদাবান গর্বিত মনে করে, তার আত্মমর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

শিশু বড় হয়ে সর্বত্র ঐ সুন্দর নামেই পরিচিতি পাবে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষ নামের অর্থ বোঝে না। মন যেমন চায় তেমন নাম রাখে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের পবিত্র এবং সুন্দর নাম রাখার আদেশ দিয়েছেন। ইসলামের স্বর্ণযুগে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে শিশুর পিতামাতা দরবারে নববীতে এসে

www.pathagar.com

সন্তানের নামের জন্য আবেদন করতেন। নবীজী অর্থবোধক পবিত্র নাম বলে দিতেন এবং নামের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। নতুন কেউ তার কাছে এলে তিনি প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা করতেন।

আগন্তুকের নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি খুশী প্রকাশ করে তার জন্য দোয়া করতেন। নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি এত খুশী হতেন যে, তাঁর চেহারা মোবারকে খুশীর চিহ্ন প্রকাশ পেতো। নাম পছন্দ না হলেও সে চিহ্ন তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে ফুটে উঠতো। নতুন স্থানে গেলে তিনি সে স্থানের নাম জানতে চাইতেন। স্থানের নাম তাঁর পছন্দ হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন। পছন্দ না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি সে স্থানের নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম দিতেন।

অর্থহীন, শ্রুতিকটু, শিরকমূলক কোনো নামই নবীজী বরদাস্ত করতেন না। নাম তাঁর অপছন্দ হলে তিনি পরিবর্তন করে সুন্দর নাম প্রস্তাব করতেন। যদি নামের অর্থ ইসলামের বিপরীত বা অর্থহীন হতো, কোনো ক্ষতিকর খারাপ জিনিষের নামের সাথে মিলে যেত, তাওহীদের ধ্যান-ধারনার বিপরীত অর্থ প্রকাশ পেত, নামের অর্থে কোনোরূপ অহংকার বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর দাসত্ব প্রকাশ পেত তাহলে তিনি সে নাম পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর কাছে সবথেকে পছন্দের নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান।'

এর অর্থ এই নয় যে, সকলেই নিজের নাম আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান রাখবে। আব্দুল্লাহ শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর গোলাম। আর রহমান হলো মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম এবং এর পূর্বে আব্দ শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ হলো রহমানের গোলাম। সুতরাং এমন নাম রাখতে হবে যা শির্কের গন্ধমুক্ত এবং যে নামের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর দাসত্বের ভাবধারা প্রকাশ পায়। কোনো ধরনের বস্তুবাদী নাম বা ধর্মনিরপেক্ষ নাম রাখা যাবে না।

তিরমিযী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থহীন খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন।' নবীজী বলেছেন, আখিরাতের ময়দানে তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নামে আহ্বান করা হবে। সুতরাং ভালো নাম রাখো। (আবু দাউদ)

আল্লাহর গুণবাচক নামের পূর্বে আবদ্ শব্দ যোগ করে যে নামসমূহ রাখা হয়েছে, যেমন আব্দুস সাত্তার, আব্দুর রহমান, আব্দুস সালাম ইত্যাদি। এসব নামের ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

শুধু সালাম, সাত্তার বলে ডাকা ঠিক নয়। পুরো নাম উচ্চারণ করে ডাকতে হবে অথবা তার পছন্দনীয় কোনো ছোট সংক্ষিপ্ত নামে ডাকতে হবে। মানুষ প্রিয়জনকে ভালোবাসার আবেগে নানা নামে ডেকে থাকে। তেমন কোনো আদরের নামেও ডাকা যেতে পারে। কাউকে ডাকার সময় এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, তার নাম যেন কিছুতেই বিকৃত না হয়। নাম বিকৃত করা মারাত্মক গোনাহ। কারো নাম যদি মনে না থাকে, তাকে ডাকার প্রয়োজন হলে কোনো উত্তম শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগ করে নিজের দিকে ডাকতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারো নাম মনে না থাকলে তিনি তাকে হে আব্দুল্লাহর সন্তান অর্থাৎ হে আল্লাহর গোলামের ছেলে বলে ডাকতেন। বর্তমানেও এভাবে নবীজীর অনুকরণে ডাকতে হবে।

মানুষের শারীরিক কোনো ত্রুটি বা কোনো মুদ্রাদোষ অথবা স্বভাবের মধ্যে মন্দ কিছু থাকলে সে দিকগুলো উল্লেখ করে তাকে ডাকা হারাম। কারো অনুপস্থিতিতে তার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার নামের পূর্বে কোনো খারাপ বিশেষণ ব্যবহার করা হারাম। এসব বিষয়ে মুসলিম সমাজকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আদর করে অনেককেই সংক্ষিপ্ত নামে ডেকেছেন, নামের পূর্বে সুন্দর বিশেষণ দিয়েছেন। আয়েশা শব্দ উচ্চারণ না করে আয়েশ, ওসমান শব্দ উচ্চারণ না করে ওস্‌ম ইত্যাদী সংক্ষিপ্ত নামে ডেকেছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে তিনি অত্যন্ত সুন্দর বিশেষণে ডেকেছেন। শিশুর নাম রাখার ব্যাপারে পিতামাতা বা অভিভাবকদের একটি দিকে অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, আমি আমার ছেলে বা মেয়েকে কেমন দেখতে চাই! বিষয়টি স্মরণে রেখে সেই আশা আকাংখা অনুযায়ী শিশুর নাম রাখতে হবে। যদি কেউ মনে করে অমুক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, যোদ্ধা, নেতা, ব্যবসায়ী, লেখক, সমাজকর্মী, বিজ্ঞানী ইত্যাদী ব্যক্তির মতো আমার সন্তান হোক। তাহলে তারা অবশ্যই তাদের নামের অনুকরণে সন্তানের নাম রাখে।

কিন্তু মুসলমানদের বিষয়টি ভিন্ন। তারা নাম রাখবে ইসলামী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী, তার সন্তান বড় হয়ে ইসলামী জ্ঞানে আকাশের সূর্যের মতোই প্রদীপ্ত হবে-এ আশায় সে তার সন্তানের নাম রাখবে সামসুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের সূর্য। কেউ যদি আশা করে তার সন্তান বড় হয়ে আল্লাহর তরবারী হিসেবে পৃথিবী থেকে মিথ্যে ও বাতিল শক্তিকে নির্মূল করবে, এ কথা মনে করে সে তার সন্তানের নাম রাখলো সাইফুল্লাহ অথবা সাইফুল ইসলাম। অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী বা ইসলামের তরবারী।

www.pathagar.com

কেউ যদি আশা করে তার শিশু কন্যা বড় হয়ে হযরত আয়েশা, খাদিজা, হাবীবা, উম্মে সালমা, যয়নব, সওদা, আসমা, ফাতিমা, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম, উম্মে আম্মারা, সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা আজমাইন অথবা জয়নব আল গাজালী, হামিদা কুতুব বা মরিয়ম জামিলা ইত্যাদী মহিয়ষী নারীদের মতো হবে। তাহলে তাদের নামের সাথে মিল রেখে নাম রাখা যেতে পারে। অনেকে আরবী শব্দ দেখে ইসলামী নাম মনে করে নিজের সন্তানদের নাম রাখে। যেমন গোলাম নবী অর্থাৎ নবীর চাকর, নবী বখস্ অর্থাৎ যা নবী দিয়েছেন, গোলাম গাউছ, গোলাম রাসূল ইত্যাদী। এসব নাম রাখা ঠিক নয়। নাম সংক্রান্ত ইসলামী বই-পুস্তক পাওয়া যায়, এগুলো দেখে অথবা ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নাম জেনে নিতে হবে।

শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পরই তার শিক্ষা শুরু হবে। শিশু কথা বলতে না পারলেও তার চোখ বড়ই সজাগ। অবোধ শিশুর সামনে এমন কোনো কথা বা আচরণ মোটেও করা যাবে না- যে কথা বা আচরণ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে বলা বা করা যায় না। শিশুর দৃষ্টির সম্মুখে যা ঘটে তার সব কিছুই শিশুর মন-মানসিকতায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর। দৃষ্টির সম্মুখে সে যা ঘটতে দেখবে, কানে যে শব্দ শুনবে, শিশু তাই করা বা বলার চেষ্টা করবে।

সুতরাং শিশুর সামনে শুধু পিতামাতাই নয়-পরিবারের বড় সদস্যদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে আচরণ করতে হবে। কোরআন-হাদীস, দ্বীনের মুজাহিদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিশুর সামনে বড়রা যদি আলাপ-আলোচনা করে তাহলে শিশুও তাই শিখবে। নরম মাটি যেদিকে ইচ্ছে ঘুরানো যায়। যেমন খুশী তেমনভাবে নরম মাটি দিয়ে আকৃতি তৈরী করা যায়। নরম মাটি দিয়ে মানুষের অপূর্ব সুন্দর মূর্তিও নির্মাণ করা যায় আবার পশু-প্রাণীর মূর্তিও নির্মাণ করা যায়। মানব শিশুও নরম মাটির ন্যায়। ইচ্ছে করলে তাকে মানুষ বানানো যায় আবার ইচ্ছে করলে তাকে পশু প্রাণীতেও পরিণত করা যায়।

মুসলিম পিতামাতার দায়িত্ব হলো, শিশুর মন-মগজে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক, একক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো অংশীদার নেই। কেউ তাকে সৃষ্টি করেনি বরং তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করেন। সৃষ্টি জগতের মধ্যে যা কিছু আছে-সব কিছুর সমস্ত প্রয়োজন তিনি পূরণ করেন। তিনি যে নবী পাঠিয়েছেন- কোরআন অবতীর্ণ

www.pathagar.com

করেছেন মানুষকে তাই অনুসরণ করতে হবে। কোরআন-হাদীস ব্যতীত মানুষের মুক্তি ও শান্তির কোনো পথ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয় নেতা, কোরআন আমাদের জীবন বিধান। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আমাদের জাতির পিতা-অন্য কেউ নয়। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মানলে জাহান্নামে যেতে হবে। তাঁর আইন ব্যতীত আর কারো আইন মানা যাবে না। কেননা তিনিই আমাদের একমাত্র রব বা প্রতিপালক।

শিশুকে প্রথম থেকেই পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে পড়া শিখাতে হবে। কোরআনের সম্মান-মর্যাদা তাকে বোঝাতে হবে। নামাযের নিয়ম-কানুন তাকে শিখাতে হবে। সন্তানকে সাথে নিয়ে মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে হবে। তাহলে সন্তানের মধ্যে মসজিদে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত তাকে মুখস্থ করাতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের নীতিমালা অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস সন্তানদের মধ্যে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সৃষ্টি করতে হবে।

শিশুর খেলার ব্যবস্থা করা এবং একটু বড় হলে তাদের ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী বানানোর জন্য ব্যায়াম বা শরীর চর্চার শিক্ষা দিতে হবে। কিভাবে উঠা-বসা করতে হবে, দাঁড়াতে হবে, খেতে হবে, খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে দোয়া পড়া, হাঁচি দিয়ে কি বলতে হবে, কিভাবে শুতে হবে ইত্যাদী সন্তানকে শিখাতে হবে। সন্তান বারবার ভুল করবে কিন্তু পিতামাতাকে ধৈর্যহারা হলে চলবে না। ইসলাম সম্পর্কে শিশুদের জন্য অনেক বই পাওয়া যায়। তা সংগ্রহ করে কোরআন-হাদীস, আল্লাহ-রাসূল সম্পর্কে যে সমস্ত ছড়া ও কবিতা রয়েছে, তা মুখস্থ করিয়ে আবৃত্তি করাতে হবে।

শিশুরা সাধারণত নানা ধরনের গল্পকাহিনী শুনতে পছন্দ করে। পরিবারের প্রবীন ব্যক্তি অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানী নাতীদেরকে অবান্তর কল্প-কাহিনী শোনায়, রূপকথার গল্প, যাদুকরের অবান্তর কাহিনী, জ্বীনের কাহিনী, কাল্পনিক ভূতের কাহিনী, দৈত্য-দানবের অমূলক গল্প কাহিনী শোনায়। এ সব কাহিনী মুসলিম শিশু-কিশোরদের শোনানো বা পড়ানো মোটেও উচিত নয়। ইসলামের দুশমনরা এসব কাহিনী বই আকারে লিখে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে, যেন মুসলিম শিশু বাল্যকাল থেকেই ভিন্ন চিন্তা-চেতনায় বড় হয়। ইসলামী চিন্তা-চেতনা যেন শিশুর মগজে প্রবেশ করতে না পারে।

নবী-রাসূলদের কাহিনী, সাহাবায়ে কেরামের কাহিনী, দ্বীনের মুজাহিদদের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এসব ঘটনা সম্বলিত শিশুদের উপযোগী করে রচিত বই রয়েছে।

www.pathagar.com

এগুলো শিশুদেরকে পড়ে শোনাতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে কয়েকগুণ বেশী সৈন্য ও অস্ত্রের সামনে মুসলিম মুজাহিদরা সামান্য সৈন্য আর দুর্বল অস্ত্র নিয়ে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে অসীম সাহসে যুদ্ধ করে কিভাবে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন-এসব কাহিনী সন্তানকে শোনাতে হবে। এতে করে সন্তানের মধ্যে মুসলিম হবার কারণে ঈমানী শক্তি, সাহস-বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে।

বদর, ওহুদ, হুনাইন, ইয়ারমুকের যুদ্ধের কাহিনী, তাবুক অভিযান, মুসলিম শাসকদের নানা ঘটনা, গাজী সালাহউদ্দিনের কাহিনী, বালাকোটের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, সিপাহী বিপ্লবের গৌরব গাঁথা, টিপু সুলতানের কাহিনী, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কাহিনী, হাজী শরিয়তুল্লাহ, মুন্সি মেহেরুল্লাহসহ অগণিত মুজাহিদের গৌরব গাঁথা রয়েছে, এসব কাহিনী সন্তানকে শোনাতে হবে। শিশু এসব ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

শিশুকে নামাযের প্রতি অভ্যস্থ করে তোলা

মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে নামায। নামাযের গুরুত্ব সন্তানকে বোঝাতে হবে। পিতামাতাকে নামাযের প্রতি যত্নবান হতে হবে, সময় মতো যত্নের সাথে নামায আদায় ও কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে। শীত বা গরমের মৌসুমে ফজরের নামাযসহ অন্যান্য ওয়াক্তের নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করতে হবে। পিতাকে দেখে সন্তানও অনুপ্রাণিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا–

তোমার পরিবার-পরিজনকে নামায আদায়ের নির্দেশ দাও এবং তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাকো। (সূরা ত্বাহা-১৩২)

অত্যন্ত সহনশীলতার মাধ্যমে সন্তানকে আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পিতামাতা নামায-রোযা তথা ইসলামী অনুশাসনের ব্যাপারে যদি সামান্য অবহেলা করে সেটা সন্তানের চোখে পড়বে এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে ক্ষতিকর। ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনা সভা, কোরআন তাফসীর মাহফিল, দরসে হাদীসের মাহফিল বা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যদি মিছিল, জনসভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়, সন্তানকে সাথে নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ফলে সন্তানের মধ্যে ইসলামী চেতনা ও ঈমানী জজবা বৃদ্ধি পাবে।

সন্তানকে নামাযের আদেশ দিতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন তার বয়স সাত বছর হয় তখন সন্তানকে নামায আদায়ের তাকিদ

www.pathagar.com

দাও। যখন তার বয়স দশ বছর হয়ে যায় তখন নামায আদায়ের জন্য তার উপর কঠোরতা আরোপ করো এবং এ বয়স হবার সাথে সাথে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

আপন সহোদর ভাই ছাড়া অন্য কোনো সমবয়সিদের সাথে সন্তানকে এক বিছানায় শুতে দেয়া যাবে না। নানা ধরনের খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হতে পারে। সম্ভব হলে সন্তানের জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। টিভি, ভিসিআর, সিডি, টেপরেকর্ডার ব্যবহার করেও সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কোরআন তিলাওয়াত, কোরআন-হাদীসের আলোচনা, ইসলামের উপরে নির্মিত চলচিত্র, নাটক, কোরআন তাফসীরের মাহফিল ভিসিআর বা টেপ রেকোর্ডারের মাধ্যমে সন্তানকে শোনানো ও দেখানো যেতে পারে। শিশুকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত ধৈর্যের কাজ। এই কাজ বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও মমতার সাথে সন্তানকে শিখাতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানদের সাথে মায়া-মমতাপূর্ণ ব্যবহার করো এবং তাদেরকে ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও।

সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতাকে কিয়ামতের ময়দানে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সন্তানকে কি ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে-এ প্রশ্ন করা হবে তার অভিভাবককে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যে বান্দাকেই স্বল্প সংখ্যক বা অধিক সংখ্যক মানুষের দায়িত্বশীল বানান না কেনো, আখিরাতের ময়দানে অবশ্যই তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, সে অধীনস্থ লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীনের পথে পরিচালিত করেছিলো না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

সন্তানকে উত্তম শিক্ষাদানকারী পিতামাতার মর্যাদা অত্যন্ত বেশী। আখিরাতের দিন মানুষ যখন অকল্পনীয় বিপদের ঘনঘটা দেখে মাতালের মতো হয়ে যাবে, তখন উত্তম শিক্ষা দানকারী পিতামাতা থাকবেন নিঃশঙ্কচিত্তে। স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে সম্মান দিবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়লো, শিখলো এবং কোরআন নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালিত করলো, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে নূরানী টুপি পরিধান করানো হবে। সূর্যের আলোর মতো তার আলো হবে এবং তার পিতামাতাকে এমন মূল্যবান দু'টি পোশাক পরানো হবে যার মূল্য সমগ্র দুনিয়াও হতে পারবে না। তখন পিতামাতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ পোশাক তাদেরকে কিসের বিনিময়ে পরিধান করানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে,

www.pathagar.com

তোমাদের সন্তানের কোরআন অর্জনের বিনিময়ে এটা পরিধান করানো হচ্ছে। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজ সন্তানকে একটি ইসলামী আদব শিক্ষা দেওয়া আনুমানিক সাড়ে তিন শস্য সাদকা প্রদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (তিরমিযী)

সন্তানকে তার পিতামাতা যথার্থ শিক্ষাদান করবে-এটা সন্তানের অধিকার। সন্তানের দৈহিক বৃদ্ধির প্রতি যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তার চেয়েও সহস্রগুণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তার শিক্ষার ব্যাপারে। তাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দিলে পিতামাতার সমস্ত পরিশ্রমই এক কথায় বৃথা। যে পবিত্র কামনা আশা-আকাংখা নিয়ে পিতামাতা সন্তান কামনা করে, তার কোনো কিছুই পূরণ হবে না সন্তানকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দিলে।

সন্তানের অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো পিতামাতা তাকে অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা, ধৈর্য, মননশীলতা, উদারতা, রুচিশীলতা, সহানুভূতি, একাগ্রতা, উৎসাহ উদ্দীপনা, মমতার সাথে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সন্তানের এই অধিকার আদায় করার পরে পিতামাতা সন্তানের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারেন যে, তাদের সন্তান এবার তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে, ইসলাম ও মুসলিম জাতির একজন সিপাহসালার হবে এবং কিয়ামতের দিন এই সন্তানই হবে মুক্তির মাধ্যম।

সন্তান যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অনুগত থাকে, ইসলামী আদর্শ পালনে একনিষ্ঠ হয়, নিজেকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচাতে পারে-এই শিক্ষা দেয়া পিতামাতার প্রতি ফরজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন পিতার পক্ষে তার সন্তানকে উত্তম আদবের শিক্ষা দানই উৎকৃষ্ট দান। অর্থাৎ সন্তানকে ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দেওয়াই পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। (তিরমিযী)

সন্তানের ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদকায়ে জারিয়া। আপনার কাজের সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি সুসন্তান রেখে যান, তাহলে মৃত্যুর পরে আপনার আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানকে প্রশিক্ষণের অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উম্মাতকে এ দায়িত্বের প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্য হলো, উম্মাতের কোনো গৃহেই যেন সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করা না হয়। উদ্বুদ্ধ করণের সাথে সাথে তিনি এ ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন, যে সকল পিতামাতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

www.pathagar.com

শিশুর অহংবোধ ও পিতামাতার আচরণ

পিতামাতার জন্য ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানদের সাথে মায়া-মমতাপূর্ণ ব্যবহার এত গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেদিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরপর উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। সন্তানদের সাথে মায়া-মমতাপূর্ণ ব্যবহার করার অর্থ হলো তাদের মান-মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সাথে এমন আচরণ বা কথা বলা যাবে না যাতে তাদের অহংবোধে আঘাত লাগে এবং তারা নিজেদেরকে নীচু ভাবতে থাকে। সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সময়ই এ ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং শিশুর মর্যাদা ও অহংবোধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবকালই উত্তম সময় যখন আপনি শিশুর মন-মস্তিষ্কে আপনি যে ধরনের ইচ্ছা সে ধরনের ছবি এঁকে দিতে পারেন। এ ছবি বা চিত্র আজীবন চরিত্র ও কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিশুর ভাঙ্গা-গড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের সম্মান মর্যাদা দাও এবং তাদেরকে উত্তম স্বভাব চরিত্র শিক্ষা দাও।'

শিশুর মধ্যে উত্তম অভ্যাস সৃষ্টির ব্যাপারে পিতার তুলনায় মায়ের কর্তব্য অনেক বেশী। কারণ অর্থোপার্জনের জন্য পিতাকে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হয়। সন্তানকে পিতা তেমন সময় দিতে পারেন না এবং শিক্ষা-শিষ্টাচার শিখানোর সুযোগ তার ঘটে না। মায়ের সান্নিধ্যই সন্তান বেশী লাভ করে। সন্তানের গোটা জীবন ও ব্যক্তিত্ব মায়ের সামনে পরিষ্কার থাকে। মায়ের সান্নিধ্য সন্তান বেশী লাভ করার কারণে মা সম্পর্কে সন্তান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা জড়তায় ভুগে না। মায়ের অসীম স্নেহ-মমতা, নরম মেজাজ, সীমাহীন ধৈর্য ইত্যাদীর কারণে সন্তান যেমন মায়ের নিয়ন্ত্রণে বেশী থাকে, মায়ের আদেশের অনুগত বেশী হয়, মা সম্পর্কে সন্তানের মনে তেমন ভীতিও থাকে না।

এসব কারণে সন্তান মায়ের সাথে রসিকতা ও দুষ্টুমি করে, নির্ভীক চিত্তে মায়ের কাছে নানা দাবী পেশ করে, সময়ে প্রতিবাদের কণ্ঠে কথাও বলে। সন্তানের এই আচরণ মা অনুভব করে অর্থাৎ মা সন্তানের মন-মেজাজ, স্বভাব-চরিত্র পিতার চেয়ে বোঝে বেশী। এক কথায় সন্তানের কোন্ রোগের কি ওষুধ দিতে হবে-মা-ই ভালো জানেন। এজন্য সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, দোষ-ত্রুটির সংশোধন মা অত্যন্ত দ্রুত করতে পারেন।

www.pathagar.com

শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান তথা যে কোনো ব্যাপারেই মায়ের চেয়ে পিতা অতি দ্রুত অধৈর্য হয়ে পড়েন। চোখ গরম করে সন্তানের দিকে তাকান। কিন্তু মায়ের ধৈর্য অসীম, মা সহজে ধৈর্য হারান না, ফলে শিক্ষার ব্যাপারে সন্তান পিতার চেয়ে মা'কেই বেশী পছন্দ করে। সন্তান কোনো অন্যায় করলে পিতা তেড়ে মারতে যান। কিন্তু মা হঠাৎ করেই সন্তানকে মারেন না। ক্ষেত্র বিশেষে পিতা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সন্তানকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবার আদেশ দেয়। কিন্তু মা এমন করেন না। শত অপরাধ করলেও মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা চালিয়ে যান। এসব দিক সামনে রেখেই চিন্তাবিদগণ বলেছেন, 'মা-কেবলমাত্র মা-ই পারেন সন্তানকে উত্তম শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দান করে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত করতে।'

পিতামাতার জন্য সন্তান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ এবং আমানত বিশেষ। সর্বোত্তম আচার ব্যবহার দিয়ে এ আমানতের হক আদায় করতে হবে। আমানতকে নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। সন্তানের সাথে মধুর ব্যবহার না করলে সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের সাথে মাতাপিতাকে এমন সুন্দর আচরণ করতে হবে যে, তারা যেন পৃথিবীতে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয় এবং পরকালে তারা পিতামাতার কল্যাণে আসে।

পিতামাতা সন্তানের সাথে গভীর মমতা নিয়ে মেলামেশা করবে। সন্তানের ইচ্ছা, আবেগ অনুভূতির মর্যাদা দেবে, তাদেরকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যে ব্যবহারের কারণে তাদের মন ভেঙ্গে যায়। তাদের আত্মসম্মান ও অহংবোধে আঘাত লাগে। শিশু সন্তান পিতামাতার আদর স্নেহ ভালোবাসার মুখাপেক্ষী, তারা মমতা পাওয়ার আশায় পিতামাতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অবোধ শিশু এমন অনেক কিছুই করে, অনেক কথা বলে যা পিতামাতার পছন্দ নয়। এসব কারণে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। আদরের সাথে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিশু-শিশু সুলভ আচরণই কররে এটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় সে বাড়ির মূল্যবান আসবাবপত্রের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু এ কারণে কোনোক্রমেই শিশুর সাথে কষ্টকর আচরণ করা যাবে না।

শিশুকে অমূলক কোনো ভয় দেখানো বা তার সাথে মিথ্যে কথা বলা যাবে না। আপনি হয়ত বললেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, না হলে তোমার খাবার বিড়াল এসে খেয়ে নেবে। আবার বললেন, একা একা বারান্দায় যেও না, ওখানে বাঘ আছে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো, নইলে ভূত এসে ভয় দেখাবে। এসব মিথ্যে ভয় দেখাবেন না। যদি দেখান তাহলে আপনারই কারণে আপনার সন্তান মিথ্যেবাদী ও ভীতু হবে। কেননা আপনার কাছ থেকেই সে মিথ্যে কথার ছবক পাচ্ছে। আপনি শিশুকে

www.pathagar.com

বললেন, এখন যদি পড়তে বসো তাহলে তোমাকে একটি সুন্দর খেলনা কিনে দেবো। অথবা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। অথবা আপনি নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শিশুকে বললেন, ঐ কাজটি করো তাহলে আমার হাতে মিষ্টি আছে তোমাকে দেবো।

সরল বিশ্বাসে আপনি যা বলবেন আপনার শিশু তাই করলো। কিন্তু আপনি যে কথা শিশুকে বললেন সে কথা অনুযায়ী কাজ করলেন না। আপনি আপনার সন্তানের সাথে প্রতারণা আর ধোকাবাজী করে তাকেও প্রতারণা আর ধোকাবাজীর ছবক দিলেন। আপনি যা পারবেন না তেমন কোনো কথা বা ওয়াদা সন্তানের সাথে করবেন না।

শিশুর প্রশংসা করার উপকারিতা

মনে রাখবেন, আপনার যাবতীয় আচার-ব্যবহার অনুকরণ করবে আপনার শিশু। এমন আচরণ করবেন না, যাতে পরিশেষে আপনাকেই আফসোস করতে হয়। তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় শিশুর সাথে রাগারাগি বা চিৎকার করবেন না। শিশুকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবেন না। তাদেরকে অকর্মা, অপদার্থ ইত্যাদী বিশেষণে বিশেষিত করবেন না। আপনি আপনার শিশুকে তার ইচ্ছা-স্বাধীনতা অনুযায়ী চলাফেরা করতে দিন। এতে করে আপনার সন্তান সাহসী হবে, স্বাধীনচেতা হবে, তার আত্মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

শিশু কোনো কাজ করলে আপনি তাকে আরো উৎসাহ দিবেন। এতে করে তার মধ্যে কর্মের স্পৃহা জাগবে। শিশুর প্রশংসা করবেন, শিশুর সামনে অন্যের প্রশংসা করবেন, এতে করে আপনার শিশু নিজের এবং অন্যের মূল্য উপলব্ধি করতে শিখবে। শিশুর কোনো কাজের সমালোচনা করবেন না এতে করে শিশু হীনমন্যতায় ভুগবে। শিশুর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন, শিশুর সামনে ঝগড়া করবেন, এতে করে আপনার শিশু নিষ্ঠুর এবং কলহপ্রিয় হবে।

আপনি শিশুর প্রতি রহম করুন আপনার শিশুও বড় হয়ে আপনার প্রতি রহম করবে। শিশুর জন্য এমন সুন্দর শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করুন, শিশু যেন সর্বদা হাসিখুশী থাকতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করবেন এতে আপনার শিশু বড় হয়ে নির্মম-নিষ্ঠুর ও আপরাধী হবে। পরিশেষে আপনিই সন্তানের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে যত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ, অপরাধী, খুনী,

www.pathagar.com

চোর ডাকাত সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তাদের শিশু কাল সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, পিতামাতার কোনো ভুলের কারণেই তাদের সন্তান আজ এই পরিণতি লাভ করেছে।

সুতরাং সন্তানকে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যে সন্তান মানবতার কল্যাণ সাধন করবে। যে সন্তান আল্লাহর পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠাই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করবে। তাহলে এই সন্তান কিয়ামতের ময়দানে মুসিবতের দিনে জান্নাতে যাবার কারণ হবে। আর পিতামাতা সন্তানকে যদি সন্ত্রাসী, বেদ্বীন, নাস্তিক, মানুষের বানানো আইন-কানুনে বিশ্বাসী হিসেবে গঠন করে, সেই সন্তানের কারণে যতবড় পরহেজগার পিতামাতাই হোক না কেনো, তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে।

সন্তান– সাদকায়ে জারিয়াহ্

ইসলামী আদর্শে আদর্শবান সন্তানের এত বড় মর্যাদা যে, তার কারণে তার মরহুম পিতামাতার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকে। এসব সন্তানই হলো সাদকায়ে জারীয়াহ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ (এ সবের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকে)। কাজ তিনটি হলো, এমন সাদকাহ প্রদান যা তার পরও অব্যাহত থাকে। অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে যান যে তারপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকেন। অথবা এমন নেক সন্তান রেখে যান যে, মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, যখন মৃত মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ সে দোয়া কবুল করেছেন।

শিশুর দৃষ্টিকটু অভ্যাস

শৈশবে সন্তানের মধ্যে যেন কোনো অরুচিকর, দৃষ্টি কটু অভ্যস সৃষ্টি না হয় সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ শৈশবের অভ্যাস সহজে দূর হতে চায় না। অনেক পিতামাতাকে বলতে শোনা যায়, বড় হলেই ওসব অভ্যাস চলে যাবে। একথা ভুল। শৈশবই উপযুক্ত সময় শিশুর চরিত্র থেকে দৃষ্টিকটু অভ্যাস দূর করা।

হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন। বড় হয়ে তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমি তখন খুই ছোট

www.pathagar.com

ছিলাম। আল্লাহর রাসূলের কোলে থাকতাম। খাবার সময় আমার হাত প্লেটের চারপাশে ঘুরছিল। এ সময় তিনি আমাকে বললেন, পুত্র! বিসমিল্লাহ পড়ে ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের দিক থেকে খাও। ব্যাস, এরপর থেকে এটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হলো।

শিশু যখন ওঠা-বসা, হাঁটা, চলাফেরায় স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, নিজে নিজে খেতে, পোষাক পরতে, গোসল করতে ও টয়লেট ব্যবহার করতে শিখে, তখন তার এসব দিকে পিতামাতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে। শিশু রুচির বিপরীত ভঙ্গিতে ওঠা-বসা, হাঁটা ও চলাফেরা করছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে। হাঁটার সময় পায়ের জুতা বা স্যান্ডেল ঘষে ঘষে হাঁটছে কিনা লক্ষ্য করুন। এভাবে হাঁটার সময় বিশ্রী শব্দ হয়। এ ব্যাপারে শিশুকে বারবার সতর্ক করে দিন। সকলের সম্মুখে পায়ের ওপর পা উঠিয়ে সোফা বা চেয়ারে বসছে কিনা বা তার দাঁড়ানো ও বসার মধ্যে উদ্যত ভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে কিনা লক্ষ্য করুন। এ ধরনের কিছু নজরে এলে সংশোধন করুন।

শিশু কিভাবে খাদ্য মুখে দিচ্ছে এবং খাদ্য চিবানোর সময় শ্রুতিকটু শব্দ হচ্ছে কিনা, দুধ, পানি বা চা পানের সময় বিশ্রী শব্দ করছে কিনা এসব দিক লক্ষ্য করে শিশুকে সংশোধন করতে হবে। পোষাক পরিধানের সময় শিশুকে শিক্ষা দিন, কারো সামনে নয়– আড়ালে পোষাক পরতে হয়। গোসলের পরে শিশুর শরীর মোছার জন্য পৃথক টাওয়াল, খাওয়ার প্লেট ও পানপাত্রের ব্যবস্থা করুন। বড়দের টাওয়াল, অন্যের চিরুনী, থালা, পানপাত্র এবং নোংরা-ময়লা পোষাক ব্যবহারে শিশুকে নিরুৎসাহিত করুন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে শিক্ষা দিন। শিশুর স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, তার পিতামাতা ও অন্যদের অবস্থা সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে চাইলে কিভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে জবাব দিবে, তা শিক্ষা দিন। তোমার লেখাপড়া কেমন হচ্ছে, প্রশ্নকারীর এ কথার জবাবে শিশু যেনো এভাবে জবাব দেয়, আল হামদু লিল্লাহ– ভালো হচ্ছে বা আমি ভালো আছি। এভাবে আল হামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মায়াশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ যেখানে যে শব্দ প্রযোজ্য, তা শিক্ষা দিন। আপনি যখন বাসার বাইরে যাবেন বা শিশু স্কুলে বা অন্য কোথাও যাচ্ছে, এ সময় শিশুর সাথে সালাম বিনিময় করুন এবং ফি আমানিল্লাহ বাক্যটি উভয়ে উচ্চারণ করুন। এ বাক্যটির অর্থ, তোমাকে আল্লাহর জিম্মায় সোপর্দ করলাম বা তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহকে দিলাম– এ কথাটি শিশুকে বুঝিয়ে দিন।

খাওয়া শেষ করে বা অন্য কোনো কাজ শেষে যেখানে যে দোয়া পাঠ করতে হবে, তা শিশুর সম্মুখে উচ্চশব্দে পাঠ করুন, এতে করে আপনার শিশুও শিখবে এবং

www.pathagar.com

অনুপ্রাণিত হবে। শিশুকে টাটা অথবা বাই বাই এসব না শিখিয়ে আল্লাহ হাফেজ অথবা ফি আমানিল্লাহ্ শিক্ষা দিন। বাড়ির বাইরে যাবার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া পাঠ করতেন, তা আপনি পাঠ করুন। বাইরে যাবার সময় শিশুকে দরজা পর্যন্ত নিয়ে এসে তার সাথে সালাম বিনিময় করে শিশুকে শুনিয়ে বাইরে যাবার দোয়া পাঠ করুন, আপনার শিশু আপনারই অনুকরণ করবে।

পিতা বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের ধুমপানের অভ্যাস থাকলে তা পরিহার করুন। এটি একটি ক্ষতিকর অভ্যাস। এতে যেমন অর্থের অপচয় হয় তেমনি ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। শিশুর সম্মুখে কোনোক্রমেই ধুমপান করা যাবে না। অনেক অভিভাবক এমন রয়েছেন যে, তারা শিশুর মাধ্যমে দোকান থেকে সিগারেট কিনে এনে ধুমপান করে থাকেন। এটা একটি মারাত্মক অন্যায় কাজ, এতে করে সেই শিশু ক্রমশ ধুমপানের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং অপরিণত বয়সে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবে।

শিশুকে মিতব্যায়ী হতে শিক্ষা দিন এবং আপনার দরজায় সাহায্যপ্রার্থী এলে শিশুর হাত দিয়ে সাহায্য দেওয়াবেন। এতে করে শিশুর মধ্যে দান করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। সাহায্যপ্রার্থী বা অভাবী লোকদেরকে ভিখারী, ভিক্ষুক বা ফকির বলে সম্বোধন করা শিখাবেন না এবং আপনি নিজেও বলবেন না। এসব শব্দ মানুষের সম্মান-মর্যাদার পক্ষে একান্তই হানীকর। অভাবী বা সাহায্যপ্রার্থীকে মেহমান অথবা সাহায্যপ্রার্থী বলে সম্বোধন করা শিখাবেন এবং আপনি নিজেও বলবেন।

আপনার বাসা-বাড়িতে কাজের যে মানুষ রয়েছে, আপনার প্রতি তার অধিকার রয়েছে। আপনি নিজে যা খাবেন, তাকেও তাই খেতে দিবেন এবং তার সাথে কখনো রূঢ় আচরণ করবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তেও কাজের লোকদের অধিকারের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাজের লোক বয়সে ছোট বা বড় হোক, আপনার শিশু যেনো তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করে এবং তাদের গায়ে হাত না ওঠায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। শিশুকে এভাবে বুঝাবেন, 'কাজের যে শিশুটি একান্ত বাধ্য হয়ে দু'মুঠো ভাত আর পরনের কাপড়ের জন্য তোমার বাসায় কাজ করছে, আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে তোমাকেও অনুরূপ অবস্থার মধ্যে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি দয়া করে তোমাকে ভালো অবস্থায় রেখেছেন। এর জন্য তুমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করো।'

শিশুকে পানির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিখাবেন এবং কোনোভাবেই পানির অপব্যবহার যেনো শিশু করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নদীর কিনারায় বসেও পানির অপব্যবহার করা যাবে না।' প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে বা পানির অপচয় করলে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতি শিশুর মধ্যে জাগ্রত করুন।

মানুষ হিসেবে প্রাণীর প্রতি কি দায়িত্ব রয়েছে, তা শিশুকে শিক্ষা দিন। প্রাণীর প্রতি আপনার শিশু নিষ্ঠুর আচরণ করছে কিনা লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রাণীর প্রতি মমতা শিক্ষা দিন। এ ব্যাপারে আল্লাহর নবী কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কোনো প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা যাবে না, প্রাণী ক্ষতিকর হলে অন্যভাবে মারতে হবে। খেলাচ্ছলে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া যাবে না এবং খাওয়ার জন্য যে প্রাণীকে যবেহ করা হবে, তাকে কষ্ট না দিয়ে দ্রুত ধারালো ছোরা দিয়ে যবেহ করতে হবে, এসব বিষয় শিশুকে শিক্ষা দিন। শিশুরা কারণে অকারণে পিঁপড়া হত্যা করে থাকে এবং এতে তারা আনন্দ অনুভব করে। তাকে শিক্ষা দিন, পিঁপড়া হত্যা করা যাবে না। পিঁপড়া অসুবিধার সৃষ্টি করলে যথাসম্ভব হত্যা না করে ভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

শিশুর আরেকটি অভ্যাস হলো, কারণে অকারণে গাছের পাতা ছিঁড়া। এ কাজ থেকে শিশুকে বিরত রাখুন এবং তাকে শিক্ষা দিন, গাছের প্রত্যেকটি পাতা মহান আল্লাহর যিক্‌র করে। অধিকাংশ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাসায় এসে পিতামাতা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে সহপাঠিদের সমালোচনা বা প্রশংসা করে। প্রশংসা করার গুণটি অবশ্যই উত্তম কিন্তু সমালোচনা করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। এতে করে শিশুর মধ্যে অন্যের গিবত করা বা পরচর্চা করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। গিবত করা, অন্যের কথা আড়াল থেকে শোনা এবং অন্যের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা খুবই খারাপ গুণ এবং এসব কাজে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আদালতে আখিরাতে এসব কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে, এ কথা শিশুকে শিক্ষা দিন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু বাসায় এলে তাকে বুঝতে না দিয়ে তার ব্যাগ অনুসন্ধান করুন। আপনার শিশু সহপাঠির খাতা, কলম, কলম-পেন্সিল এনেছে কিনা দেখুন। বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের পরস্পরের মধ্যে সিডি বিনিময় শুরু হয়েছে। এসব সিডিতে কোন্ ধরনের ছবি রয়েছে নিজে প্রথমে দেখে তারপর শিশুকে দেখতে দিন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাগেও নীল ছবির সিডি পাওয়া গিয়েছে। সন্তান বাইরে গেলে ভিন্ন স্বভাবের ছেলেদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যাবে, এ ভয়ে পিতামাতা সময় কাটানোর জন্য সন্তানকে কম্পিউটার, ভিসিডি বা ডিভিডি কিনে দিয়েছে।

www.pathagar.com

পিতামাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সন্তান এসব ইলোট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে ঐ বিপদ ডেকে আনছে না তো, যে বিপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য তারা সন্তানকে এসব ইলোট্রনিক্স গুড্স কিনে দিয়েছেন।

পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে তার বয়স পাঁচ বা ছয় হলেই এমন পোষাক কিনে দিবেন না, যে পোষাক পরিধান করলে উরু দেখা যাবে বা হাঁটু অনাবৃত থাকবে। কন্যা সন্তান হলে তাকে ছোট থেকেই সেই পোষাকে অভ্যস্থ করুন, যে পোষাক পরিধান করলে পর্দার হক আদায় হবে। অনেক পিতামাতাকে দেখা যায়, কন্যা ছোট বলে তাকে পশ্চিমা ধাঁচের পোষাক পরিধান করান এবং বলে থাকেন, উপযুক্ত বয়সে মেয়েকে পর্দায় অভ্যস্থ করবেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল, ছোট থেকে আপনার কন্যা যে পোষাকে অভ্যস্থ হবে, সে অভ্যাস পরিত্যাগ করে হঠাৎ করে তার পক্ষে পর্দার পোষাকে অভ্যস্থ হওয়া কঠিন হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে আপনার কন্যা পর্দার পোষাকের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।

সন্তানের প্রতি আদর-ভালোবাসা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিশু বাচ্চা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দশ বছর যাবৎ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীর অনেক কাজ করে দিতাম। আমি ছিলাম তখন এত অল্প বয়সের যে, উচিত-অনুচিত জ্ঞান তখন পর্যন্ত আমার হয়নি। কিন্তু আল্লাহর নবী একদিনও আমার প্রতি সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করেননি। মধুর কণ্ঠ ব্যতীত আমার সাথে তিনি কখনো উঁচুকণ্ঠে কথা বলেননি। তিনি নিজে যেমন সন্তানদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল অপর কাউকে স্নেহ করতে দেখলেও তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন।

নবীজীর কাছে এক ব্যক্তি এলো। তাঁর কোলে ছিল শিশু। সে শিশুকে স্নেহভরে আদর করতে লাগলো। তিনি এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তার প্রতি কি তোমার দয়া হয়? সে বললো, কেনো হবে না। তিনি বললেন, তুমি এ শিশুর প্রতি যত দয়া করো, আল্লাহ তা'য়ালা এর থেকেও বেশী তোমার উপর দয়া করে থাকেন। কেননা তিনি সকল দয়াকারীর চেয়ে বেশী দয়াকারী।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললো, আপনারা কি সন্তানের মুখে চুম্বন দিয়ে থাকেন? আমরা কিন্তু দেই না। নবীজী বললেন, আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে সন্তান বাৎসল্য উঠিয়ে নিয়ে গেলে আমি কি করতে পারি? (বোখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

পিতামাতার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক হতে হবে অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সন্তান সর্বদা পিতামাতাকে দেখে ভয়ে ভয়ে থাকবে, অস্বস্তি বোধ করতে এটা ঠিক নয়। সন্তানের সাথে সম্পর্ক এমন যেন হয়-সে সন্তান যেন পিতামাতার সাহায্যকারী হয়। পিতামাতার উচিত অবসরে সন্তানদের সাথে শিক্ষামূলক গল্প, সত্যাশ্রয়ী কৌতুক বলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা।

একশ্রেণীর মানুষ রয়েছেন, যারা মনে করেন সন্তানদের সম্মুখে খুব গম্ভীর থাকতে হবে। তাদের সাথে খোলামেলা আচরণ পরহেজগারীর বিপরীত। সন্তান থাকবে সন্তানের জগতে আর পিতামাতা থাকবে পিতামাতার জগতে। এতে করে সন্তান আর পিতামাতার মধ্যে বিরাট ব্যবধান এবং বাধার অলংঘনীয় অদৃশ্য প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এই আচরণ ইসলামের বিপরীত। সন্তানদের সাথে নিয়ে অবসরে খেলা করলে পরহেজগারী হ্রাস পাবে না বরং নবীর সুন্নাত আদায় হবে পরহেজগারী বৃদ্ধি পাবে।

একদিন হযরত হাসান অথবা হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম নবীজীর কাঁধ মোবারকে সওয়ার ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তা দেখে বললেন, বাঃ! খুব সুন্দর সওয়ারী পেয়েছে তো! নবীজী এ কথা শুনে বললেন– সওয়ারও খুব ভালো সওয়ার।

হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার শিশু কন্যা উমামাকে নবীজী খুব ভালোবাসতেন। প্রায় নামাযের সময়ই সে নবীজীর কাছে থাকতো। তিনি নামাযে দাঁড়ালে সে কাঁধের উপর সওয়ার হয়ে যেত। রুকূ'র সময় তিনি তাকে নামিয়ে দিতেন। তিনি পুনরায় দাঁড়াতেন, সে আবার সওয়ার হতো।

একবার এক ব্যক্তি নবীজীর খিদমতে তোহফা হিসেবে কিছু জিনিস পাঠালেন। তার মধ্যে সোনার হারও ছিল। সে সময় শিশু উমামা সেখানে খেলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এ হার আমি তাকে দিব ঘরে যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। মহিলারা মনে করলেন যে, তিনি এ হার হযরত আয়িশাকেই দেবেন। কিন্তু তিনি উমামাকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং স্বয়ং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তার গলায় সে হার পরিয়ে দিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। শিশু হোসাইন রাস্তার উপর খেলা করছিলেন। তিনি দু'বাহু আপত্য স্নেহে প্রসারিত করে দিলেন। যাতে হযরত হোসাইন তাঁর কাছে চলে আসেন। হযরত হোসাইন হাসতে হাসতে তাঁর কাছে আসতেন এবং দুষ্টুমী করে আবার সরে যেতেন। অবশেষে তিনি তাঁকে ধরে ফেললেন এবং এক হাত তাঁর থুতনীর উপর ও অপর হাত মাথার উপর রেখে পবিত্র বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হোসাইন আমার, আর আমি হোসাইনের।

www.pathagar.com

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোলে নিয়ে এক উরুর উপর আমাকে ও অন্য উরুর উপর হযরত হাসানকে বসাতেন এবং আমাদের দুজনকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলতেন– হে আল্লাহ! এ দু'জনের উপর রহম করো। আমি তাঁদের উপর দয়া দেখিয়ে থাকি। (বোখারী)

হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, এরা আমার চোখের মনি। তিনি মেয়ের বাড়িতে গেলেই হযরত ফাতিমাকে বলতেন, আমার বাচ্চাদেরকে আনো। তাঁদের আনা হলে তিনি তাঁদেরকে কোলে করতেন, চুমু দিতেন এবং বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতেন। হযরত হোসাইনকে তিনি প্রায়ই কোলে নিতেন এবং তার মুখের উপর মুখ রেখে আদর করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি এবং তাকেও ভালবাসি যে একে ভালোবাসে।

সন্তানদেরকে প্রাণভরে আদর করতে হবে। তাদেরকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বয়স অনুযায়ী হাতে, গালে, কপালে, মাথায় চুমো দিতে হবে। এতে করে সন্তানের মন-মানসিকতায় এক অপূর্বভাবের সৃষ্টি হবে। সন্তানকে ভালোবাসলে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসানকে চুমো দিলেন এবং আদর করলেন। সে সময় আকরা বিন হারিসও সেখানে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমার তো ১০টি বাচ্চা। কিন্তু আমি তো কখনো একটি বাচ্চাকেও আদর করিনি। আল্লাহর রাসূল তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, যে রহম করে না, আল্লাহ্ও তার প্রতি রহম করেন না।

যে ব্যক্তি অন্যকে আদর ভালোবাসা দিতে জানে নিঃসন্দেহে এটা তার উপরে মহান আল্লাহর অত্যন্ত বড় মেহেরবাণী। কেননা তার অন্তরে আল্লাহ মায়া-মমতা দিয়েছেন। মায়া-মমতাহীন মানুষ সভ্য সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত। যারা অপরকে ভালোবাসে এবং খোলামনের অধিকারী সমাজের সবাই তাকে স্নেহ-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। যে মানুষ নিজের সন্তানের প্রতি মমতাশীল নয়-নিজের সন্তানের মর্যাদা মূল্য বোঝে না-সে অপরের সন্তানের মূল্যও উপলব্ধি করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, সন্তানের বয়স দু'তিন বছর হলেই সে খেলার সঙ্গী চাইবে। আরেকটু বড় হলে সে প্রাণ খুলে গল্প করতে চাইবে। কিশোর-তরুণ বয়সে একটি পরিবেশ চাইবে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

www.pathagar.com

পিতামাতা যদি এ সময়ে সন্তানকে সঙ্গ না দেয়, ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার তুচ্ছ অহমিকায় সন্তানের সাথে গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে, তাহলে সে সন্তান পিতার এই গাম্ভীর্যতার কারণে বিকল্প বন্ধু অবশ্যই খুঁজে নেবে। সে বন্ধুর মাধ্যমে সন্তান যদি ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা শিখে তখন পিতামাতাকে অনুশোচনা করতে হবে। এ জন্য পিতামাতাকে এমন ভূমিকা পালন করতে হবে, সন্তান যেনো তাদেরকেই অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করে।

আদর-ভালোবাসায় সমতা রক্ষা

সন্তানের সাথে শুধু ব্যবহারই নয়- প্রত্যেক সন্তান-সন্ততির সাথে একই রূপ আচরণ ও সমতা রক্ষা করতে হবে। পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ তারা আইন অনুসারে লাভ করবে। কিন্তু পৃথিবীতে পিতামাতা সন্তানদেরকে যখন কোনো উপহার, পোষাক, খাবার দিবে তখনও সমানভাবে দিতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো, তাদের মাঝে ন্যায়পরতা সংস্থাপন করো, এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করো।'

পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সর্বতোভাবে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা-প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের মধ্যে সাম্য কায়েম ও রক্ষা করা।

সন্তান যদি দেখে পিতামাতা তাদের সাথে ইনসাফ করছে না এতে তাদের মন-মানসিকতা ভেঙ্গে যাবে। পিতামাতার প্রতি তাদের বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে। তারা বড় হয়ে ইনসাফ করা শিখবে না। কারো মধ্যে তারা ন্যায়-নীতিও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। এ সম্পর্কে বোখারীসহ অন্যান্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত নোমান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমার পিতা আমাকে একটি তোহফা দিয়েছিলেন। এতে (আমার মা) উমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, তুমি যদি এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলকে সাক্ষী বানাও তাহলে আমি রাজী হবো। এরপর আমার পিতা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট এলেন এবং বললেন, উমরাহ বিনতে রাওয়াহার পক্ষ থেকে আমার যে পুত্র রয়েছে তাকে আমি একটি তোহফা বা উপঢৌকন দিয়েছি। এতে উমরাহ আপনাকে সাক্ষী করার দাবী জানিয়েছে।

এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকেই এ ধরনের তোহফা দিয়েছো? তিনি বললেন, না, সবাইকে তো দিইনি। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে

www.pathagar.com

ইনসাফ করো। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং নিজের সে তোহফা ফেরত নিলেন। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর নবী বললেন, আমি যুলুমের উপর সাক্ষী হই না। অন্য আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বশির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললেন, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের আচরণ করুক এটা কি তুমি পছন্দ করো? তিনি জবাব দিলেন, কেনো নয়। নবীজী বললেন, তাহলে তুমি এ ধরনের করো না। (বোখারী)

এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। যদি বিশেষ কোনো কারণ না থাকে, তাহলে এ সমতাকে কিছুতেই অবহেলা করা এবং দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে তারতম্য করা উচিত হবে না। যদি কোনো সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কিছু দান করা হয় তবে তা চরম অন্যায় হবে। আবার অনেকে রাসূলের এ আদেশকে 'মুস্তাহাব' বলে ধরে নিয়েছেন। যদি কেউ এক সন্তানকে অপর সন্তান অপেক্ষা বেশী কিছু দান করে, তবে সে দান ঠিকই হবে, তবে তা অবশ্য মাকরুহ্ হবে।

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে বিখ্যাত ইসলামী গবেষকদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন, প্রকৃত বিষয় হলো সন্তানদের মধ্যে উপহার দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, কাউকে অল্প কাউকে বেশী দেয়া স্পষ্ট হারাম।

পিতামাতার কাছে এক সন্তানের তুলনায় অন্য সন্তানের মূল্যও কম নয় আবার সন্তানের প্রতি ব্যথাও কম নয়। প্রত্যেক সন্তানের প্রতিই তাদের ব্যথা-বেদনা একই রকম। তবে শুধু পিতামাতাই নয়-কোনো মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, সে তার নিজের সকল সন্তান-সন্ততির প্রতি একই ধরনের মায়া-মমতা ও প্রেম-ভালোবাসার মনোভাব পোষন করবে। মানুষের এটা সহজাত ব্যাপার যে, সে বিশেষ কোনো কারণে কোনো সন্তানের প্রতি বেশী দুর্বল থাকে। আকর্ষণের বিষয়টি কোনো সন্তানের প্রতি একটু বেশী হয়।

প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা ভালোবাসার ব্যাপারে কোনো মানুষের কাছ থেকেই সমান অংশ আশা করা যায় না। আর এ ধরনের আশা করাও অযৌক্তিক। আর এমন কোনো দাবী ইসলাম মানুষের কাছে করেনি। ইসলাম পিতামাতার কাছে দাবী করেছে বৈষয়িক ব্যাপারে তথা আচরণগত ব্যাপারে। সন্তানের পিতামাতা যারা তাদের কাছে নিজের সব সন্তানই সমান এবং পিতামাতার কাছে সব সন্তানের অধিকারও একই রূপ।

www.pathagar.com

অতএব পিতামাতার এ অধিকার নেই যে, সে এক সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করবে, একজনকে সবদিক থেকে বেশী দেবে এবং অন্য জনের সাথে দুর্ব্যবহার করবে, দেওয়ার সময় তাকে কম দেবে। এই আচরণ যেসব পিতামাতা করেন তারা আরেক সন্তানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন। সন্তানের সাথে ইনসাফ না করলে সন্তানদের মধ্যেও গর্হিত আচরণের অশুভ প্রভাব পড়ে। যাকে বেশী দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে আত্মঅহংকার বা আমিই উত্তম– এমন মনোভাব সৃষ্টি হয়। সে অন্যান্য ভাইবোনদের ছোট জ্ঞান করতে থাকে।

আর যে সন্তানকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা সৃষ্টি হয়, আমি অত্যন্ত নীচু এবং অযোগ্য। এভাবে আপনারই সন্তান আপনার ইনসাফহীনতার কারণে আত্মমর্যাদা বোধহীন এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। অন্যান্য ভাই-বোনদের সে হিংসা করতে থাকে, মানসিকভাবে প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে ওঠে। পিতামাতার প্রতি সম্মানবোধ ঐ সন্তানের হৃদয়ে থাকে না। পিতামাতা তাকে অন্য ভাইবোনদের তুলনায় কেনো সুনজরে দেখতে পারে না, কেনো কম দেয়-এ চিন্তায় চিন্তায় আপনার সন্তান একসময় মানসিক রোগী হয়ে পড়তে পারে।

তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার

হযরত লুকমান আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তা উল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পরিবারই হলো মানব সন্তানের শিক্ষার সূতিকাগার এবং মানব সন্তানের শিক্ষার সূচনা পরিবার থেকেই করতে হবে। পারিবারিক আচার-আচরণ, ব্যবহার সন্তানের চরিত্রে সবথেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাব হয় স্থায়ী। প্রত্যেক পরিবারে যখন নতুন অতিথি তথা শিশু আগমন করে, তখন শিশুর জীবনের প্রথম দিনগুলোয় বাকশক্তি থাকে না। শিশু তার নিজের প্রয়োজন ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিশু অনুভূতি শক্তিহীন। শিশুর অনুভূতি ক্ষমতা রয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক শব্দাবলীর মাধ্যমে সে প্রভাবিত হয়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আচার-আচরণ দ্বারা শিশু সর্বাধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে।

শুধু মানব শিশুই নয়– বাকশক্তিহীন বন্য বা গৃহপালিত প্রাণীরও অনুভূতি শক্তি প্রবল। গৃহস্থের বাড়িতে যে পশু-প্রাণী রয়েছে, এদের সেবক বা মনিবকে এরা ঠিক ই চিনতে পারে এবং খাদ্যের প্রয়োজনে বা আদর নেওয়ার জন্য সেবক বা মনিবের

www.pathagar.com

কাছেই এরা আসে। যে গরুটির বড় বড় শিং, মারকুটে স্বভাবের– সেটি কিন্তু তার সেবক বা মনিবকে সহজে আঘাত করে না। পোষা ময়না বা কাকাতুয়া পাখি অপরিচিত কাউকে বাড়িতে দেখলে সতর্ক সংকেত দেয়। এ থেকে বুঝা গেলো, অনুভূতি শক্তি শুধুমাত্র মানব শিশুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়– পশু-প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন, আমি আমার সকল সৃষ্টিকে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী অনুভূতি শক্তি দান করেছি।

সুতরাং শিশু বাকশক্তিহীন হলেও তার অনুভূতি শক্তি থাকে প্রবল এবং সে হয় অনুকরণ প্রিয়। শিশু যখন পারিবারিক পরিমন্ডলে বড় হতে থাকে তখন থেকেই তাকে তাওহীদের জ্ঞান দিতে হবে। এ জন্য সর্বপ্রথমে তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার গঠন করতে হবে। শিশু যেন পারিবারিক পরিমন্ডলেই তাওহীদের শিক্ষা লাভ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, একটি রাষ্ট্রের প্রথম স্তর হলো পরিবার। মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি হলো পরিবার আর পরিবারের সামগ্রিক তথা বিকশিত রূপই হলো রাষ্ট্র। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তথা অনেকগুলো মানব সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি পরিবার। অনেকগুলো পরিবারের সামষ্টিক রূপই হলো সমাজ। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায়, সুসংগঠিত পদ্ধতিতে যে সমাজ গড়ে ওঠে, এসব সমাজের সমন্বিত রূপই হলো রাষ্ট্র।

সুতরাং রাষ্ট্রের ভিত্তিই হলো পরিবার। পরিবার না থাকলে সমাজ থাকে না, আর সমাজের অস্তিত্ব না থাকলে রাষ্ট্রের কল্পনাও করা যায় না। পরিবার হলো সমাজের ভিত্তি আর সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত সমাজের বাস্তব ফলশ্রুতি হলো রাষ্ট্র। প্রত্যেক পরিবার থেকে আদর্শ মানুষ সরবরাহ করা হলে, সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরিবার থেকে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে, এই শিক্ষায় শিক্ষিত লোক সংখ্যা গরিষ্ঠ হলে তাদের প্রভাবেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রভাবিত হতে বাধ্য। মুসলিম দেশের প্রত্যেক পরিবার যদি তাওহীদ ভিত্তিক পরিবার হয় এবং সেই পরিবারে যে শিশু আগমন করবে, সেই শিশুও স্বাভাবিকভাবেই তওহীদের শিক্ষায় প্রভাবিত হবে।

বর্তমান সমাজের প্রত্যেক পরিবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, পরিবারে যা কিছুর চর্চা হয়, সেই পরিবারে যে শিশু বড় হতে থাকে, সেই শিশুও পারিবারিক প্রভাব মুক্ত থাকে না। পিতামাতা যদি গান-বাজনা, কবিতা-সাহিত্য চর্চা করে, সেই পরিবারের শিশুর ঝোঁক-প্রবণতাও পিতামাতার অনুরূপ হয়ে থাকে। পিতা বা মাতা যদি চিকিৎসক হয়, তাদের শিশুও বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, খেলার ছলে নিজেকে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। পিতামাতা বা পরিবারের কোনো

www.pathagar.com

সদস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য হলে, সেই পরিবারের শিশুও সেই সদস্যকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। পরিবারের সদস্যদেরকে নামায আদায় করতে দেখলে শিশু বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, পিতামাতার পাশে গিয়ে নামায আদায় করতে থাকে। যে পরিবারে পিতামাতা বিপদের সময় আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর-বুযর্গদের ডাকে, মাজারে গিয়ে মানত দেয়, সেই পরিবারের শিশুও এর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। শিশু যখন দেখে তার পিতামাতা জড়পদার্থের সম্মুখে গড় হয়ে প্রণাম করছে, শিশুও তা অনুকরণ করে।

এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–প্রত্যেকটি শিশুই প্রকৃতপক্ষে মানবিক প্রকৃতির ওপরই মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতাই তাকে পরবর্তীকালে ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে।

মুসলিম বাহিনী কোনো এক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের শিশুদের হত্যা করলে এ সংবাদ আল্লাহর রাসূলের কাছে পৌঁছলে তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন– লোকদের হলো কি, তারা সীমা অতিক্রম করেছে এবং শিশুদেরও হত্যা করেছে?' একজন বললো, ওসব শিশু কি মুশরিকদের সন্তান ছিলো না?' নবীজী বললেন, তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম লোকজন তো মুশরিকদেরই সন্তান। প্রত্যেক প্রাণসত্তা প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে, এমনকি যখন কথা বলতে শিখে তখন তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী খৃষ্টানে পরিণত করে। (আহ্‌মাদ, নাসায়ী)

শিশুর অভিভাবকের এটা দায়িত্ব যে, তিনি ঐ সত্তার সাথে শিশুকে পরিচয় করে দিবেন, যে সত্তা শিশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ সর্বপ্রথম শিশুকে সেই সত্তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে, যে সত্তার নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের কোনো শিশু যখন কথা বলতে শিখতো, তখন তিনি সেই শিশুকে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি শিখিয়ে দিতেন–

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا–

যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্‌দীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। (সূরা আল ফুরকান-২)

www.pathagar.com

আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যখন তোমাদের শিশুরা কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে শিক্ষা দাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' শিশুকে শুধু কালেমা মুখস্থ করার কথা বলা হয়নি, এই কালেমা তৈয়্যেবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

অর্থাৎ শিশুকে সর্বপ্রথম তাওহীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু কথা বলা শিখলেই পবিত্র কোরআনের যে আয়াত শিখিয়ে দিতেন, সেই আয়াতের মধ্যে তাওহীদের সমগ্র শিক্ষা পরিপূর্ণ রয়েছে। শিশুর মন-মানসে তাওহীদের পরিপূর্ণ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের শিশুর মুখে কথা ফুটলে বা শৈশবে যখন বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে তখনই শিশুর মন-মস্তিষ্কে সূচনাতেই তাওহীদের ঐ ছবি অঙ্কন করে দিতে হবে, যে ছবি উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অঙ্কন করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারকেই এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে এবং পরিবারকে শিক্ষার সূতিকাগারে পরিণত করতে হবে। পরিবারকে তাওহীদের রঙে এমনভাবে রঙিন করতে হবে, শিশুর মন-মানস যেনো স্বাভাবিকভাবেই তাওহীদের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে।

হযরত লুকমান (আঃ) ও তাঁর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা লুকমান নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং এই সূরায় লুকমান নামক এক মহান ব্যক্তির প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন এ জন্য যে, তিনি তাঁর সন্তানকে ওহী উপকরণের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয় ছিলো বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা বিষয়টি পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে প্রত্যেক পিতামাতাকে উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজ সন্তানদেরকে হযরত লুকমান কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

হযরত লুকমানের পরিচিতি সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ইসলামী চিন্তবিদদের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত লুকমান নবী ছিলেন না। কারণ আল্লাহর কোরআন একজন নবী-রাসূলের বর্ণনা পেশ করতে গিয়ে যে ধারা অবলম্বন করেছে, তাঁর ব্যাপারে তা অবলম্বন করা হয়নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হযরত লুকমানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাপক মতানৈক্য ও মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সে যুগে কোনো লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না বা মানুষ লিখিত ইতিহাস রচনায় অভ্যস্থ ছিলো না।

www.pathagar.com

শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী মানুষ বংশ ও গোত্র পরম্পরায় যা কিছু শুনতো, এসব তারা স্মৃতির কোঠায় সংরক্ষিত করে পরবর্তী বংশধরদের শোনাতো। এভাবে বংশ পরম্পরায় শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে অনেকে হযরত লুকমানকে শক্তিশালী আ'দ জাতির বাসস্থান ইয়েমেনের শাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী (রাহঃ) 'আরদুল কোরআন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইতিহাসে ধ্বংস প্রাপ্ত যেসব জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আ'দ জাতি হলো তাদের অন্যতম। এরা মহান আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী ছিলো। হযরত হূদ আলাইহিস্ সালামকে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো। আল্লাহর প্রেরিত নবীর সাথেও তারা বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর আযাব প্রেরণ করেন। এরপর হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোকদের নিয়ে আযাবের স্থান থেকে হিজরত করেন। হিজরতকারী সেই লোকগুলো থেকে যে মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটে তারা ইয়েমেনে বসবাস করতো। তাদের বংশের সন্তান ছিলেন হযরত লুকমান এবং তিনি ছিলেন ইয়েমেনের শাসক।

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তীকালের চিন্তাবিদগণ হযরত লুকমানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হযরত লুকমান সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ছিলেন হাবশী শ্রেণীভুক্ত একজন দাস।

পরবর্তীকালের অনেক গবেষক তাঁদের মতামত সমর্থন করেছেন। আবার হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত লুকমান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, হযরত লুকমান ছিলেন নুবা নামক স্থানের অধিবাসী। হযরত সাঈদ ইবনে মাসাইয়্যেব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মন্তব্য করেছেন, মিশরের কালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত লুকমান।

হযরত লুকমান সম্পর্কে উল্লেখিত মনীষীবৃন্দের মতামতে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। কারণ সে যুগে আরবের অধিবাসীরা কালো বর্ণের মানুষদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাবশী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবেই চিহ্নিত করতো। হযরত লুকমান সম্পর্কে যাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, তিনি ছিলেন নুবা নামক স্থানের অধিবাসী, তাঁদের মন্তব্যের সমর্থনে গবেষকগণ বলেছেন– নুবা হলো সুদান নামক দেশটির উত্তরে এবং মিশর নামক দেশের দক্ষিণে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম। এই অঞ্চলের লোকগুলোর গাত্রবর্ণ কালো। হযরত লুকমান কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন, এ সম্পর্কে মতপার্থক্য এখানে যে, কেউ বলছেন তিনি হাবশী গোলাম ছিলেন কেউ

www.pathagar.com

বলছেন, তিনি মিশরের অধিবাসী আবার কেউ বলছেন, তিনি নুবা নামক অঞ্চলের লোক ছিলেন। সকলের মন্তব্যে শব্দের পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি কালো বর্ণের লোক ছিলেন।

হযরত লূকমান সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বলেছেন, তিনি নুবা অঞ্চলের লোক হলেও বসবাস করতেন মাদ্‌য়ান– বর্তমানে পরিবর্তিত নাম আকাবাহ্ নামক এলাকায়। আর এই এলাকার ভাষা ছিলো আরবী, এ জন্যই তিনি আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের বিষয়টি আরব এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করেছিলো।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত লূকমানের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে সূরা লূকমানে বলেছেন, 'আমি লূকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে ভূষিত করেছিলাম যেনো সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।'

তাঁকে কি ধরনের সুক্ষ্মজ্ঞান দান করা হয়েছিলো, তা সূরা লূকমানে বর্ণিত হযরত লূকমান কর্তৃক তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন– তা বিশ্লেষণ করলেই অনুভব করা যায়। তিনি তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন, এই নয়টি উপদেশ পালন করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের জীবনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এবং সফলতা। তিনি তাঁর সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা শুধুমাত্র সেই যুগের মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য ছিলো না, বরং তা কালজয়ী এবং বিশ্বজনীন অবশ্যই পালনীয় উপদেশ। পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য অনুসরণীয় এবং পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ এবং সফলতা অর্জনের একমাত্র ও সর্বশেষ মাধ্যম।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত খালিদ রাবঈ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত লূমানের মনিবের কাছে কিছু সংখ্যক লোকজন এসে তাঁর সম্পর্কে জানালো, আপনার গোলামটি প্রবল জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সে মানুষকে নানা ধরনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে থাকে।

লোকজনের কথা শুনে মনিব তাঁর গোলাম লূকমানের জ্ঞানের পরিধি যাচাই করার উদ্দেশ্যে একদিন তিনি হযরত লূকমানকে বললেন, একটি ছাগল জবেহ করো এবং ছাগলের দেহের সবথেকে উৎকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। তিনি মনিবের কথা অনুসারে ছাগল জবেহ করে ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা একটি পাত্রে মনিবের সামনে উপস্থিত করে বললেন, এটাই ছাগলের গোটা দেহের মধ্যে উৎকৃষ্ট অংশ।

www.pathagar.com

এরপর মনিব পুনরায় তাঁকে আদেশ দিলেন, আরেকটি ছাগল জবেহ করো এবং সেই ছাগলের দেহের সবথেকে নিকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। মনিবের আদেশে হযরত লূকমান আরেকটি ছাগল জবেহ করলেন এবং এবারও তিনি ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা একটি পাত্রে মনিবের সামনে উপস্থিত করলেন।

মনিব অবাক দৃষ্টিতে তাঁর গোলাম হযরত লূকমানের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, লোকজনের মুখে তোমার জ্ঞানের প্রশংসা শুনি। তুমি নাকি লোকজনকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে থাকো। এখন দেখছি, তোমার মাথায় কিছুই নেই। তোমাকে আমি বললাম, ছাগলের দেহের উৎকৃষ্ট অংশ আমার সামনে উপস্থিত করো। তুমি আমাকে ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা এনে দিলে। আবার যখন তোমাকে আমি আদেশ দিলাম একটি ছাগল জবেহ করে তার দেহের সবথেকে নিকৃষ্ট অংশ আমার সামনে আনো। তুমি এবারও ছাগলের কলিজা ও জিহ্বা এনে আমার সামনে রাখলে, বিষয়টি কি?

হযরত লূকমান মনিবের কথার উত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন– আপনি ছাগলের দেহের উৎকৃষ্ট অংশ ও নিকৃষ্ট অংশ উপস্থিত করতে বলেছেন। আমি আপনার আদেশ অনুসারেই কাজ করেছি। মনিব অবাক কণ্ঠে বললেন, বিষয়টি কি আমাকে বুঝিয়ে বলো। হযরত লূকমান বললেন, দেহের মধ্যে কলিজাই হলো সবথেকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অংশ। কারণ এই কলিজা যদি কারো ভালো থাকে, তাহলে তার গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর এই কলিজা যদি কারো খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তার গোটা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। মনিব তার গোলামের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিধি অনুভব করে অবাক হয়ে গেলেন। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দেহের মধ্যে এমন একটি গোস্তপিন্ড রয়েছে, তা যখন সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকবে, সমস্ত দেহও সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকবে। আর ঐ গোস্তপিন্ডটি যখন রোগাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন সমগ্র দেহটিই চরমভাবে রোগাক্রান্ত ও বিষ-জর্জরিত হয়ে পড়বে। তোমরা জেনে রাখো যে, ঐ গোস্তপিন্ডটিই হলো কল্‌ব বা হৃদপিন্ড।'

এ কথা স্বতসিদ্ধঃ যে, দূষিত হৃদয়-মন থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। হৃদয়-মনে যে চিন্তা-চেতনার উদ্রেক হয়, মানুষের স্বভাব হলো তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা। যারা শুভ চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত, তাদের কাজকর্মে তা যেমন প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে যারা অশুভ চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত তাদের কর্মকান্ডেও তা প্রকাশ পায়। এ জন্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে হৃদয়কে অশুভ চিন্তা-চেতনা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব

www.pathagar.com

আরোপ করে বার বার মানুষকে স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন, তারা কি জানতো না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন। (সূরা তওবা-৭৮)

মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখন কি চিন্তা-পরিকল্পনা করে, মনের গহীনে কখন কোন্ মুহূর্তে কি কল্পনা ও আশার উদ্রেক হয়, তা জানার মতো কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের মনের জগৎ তথা চিন্তার জগৎ অজ্ঞাত নয়। কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে, তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (সূরা নাম্‌ল-৭৪)

আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি মানুষের মনের কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবগত রয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতা মানুষের সমস্ত সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষে একা একা নীরবে নির্জনে মনে মনে যে চিন্তা-কল্পনা করে, সেটা যেমন আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের বাইরে নয়, তেমনি দুই জন মানুষ যখন কোথাও নির্জনে গোপন সলাপরামর্শ করে, সেটাও আল্লাহর কাছে অজানা থাকে না। সর্বত্র আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা বিরাজ করছে।

হৃদয়-মন ও মস্তিষ্ক সুস্থ এবং শুভ চিন্তা-চেতনা দ্বারা সার্বক্ষণিক প্রভাবিত রাখার বিষয়টি হযরত লুকমান পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন বিধায় তিনি তাঁর মনিবের নির্দেশ অনুসরণ করতে গিয়ে দুই বারই ছাগলের কলিজা এনে মনিবের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। আপন সন্তানকে দেয়া সুক্ষ্মজ্ঞানের অলঙ্কারে সুসজ্জিত নয়টি উপদেশ আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

হযরত লুকমান মহান আল্লাহর দেয়া যাবতীয় উপকরণ আপন মনিব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে চেনা ও জানার কাজে ব্যবহার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা এত বেশী বৃদ্ধি করেছেন যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের কাছে তাঁকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে চিরন্তন করে দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন ক্রীতদাস, তাঁর মনিব নিজের ক্রীতদাসের সুক্ষ্মজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাঁর সম্মান-মর্যাদা এতই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যে, তাঁর বলা কথাগুলো মহাগ্রন্থ আল কোরআনে স্থান দিয়েছেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালাও তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। কিয়ামত

www.pathagar.com

পর্যন্ত যে সকল মানুষ ধৈর্য্য সহকারে আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আল্লাহ ছুব্‌হানুহু তা'য়ালাও তাঁর সে বান্দাকে নে'মাত দানে ধন্য করবেন– এটাই তাঁর স্থায়ী নীতি এবং তাঁর নীতিতে কখনো পরিবর্তন সূচিত হয় না।

সন্তানের প্রশিক্ষণ ও হযরত লূকমান (আঃ)

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনটি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের রব, ইলাহ, মা'বুদ, বাদশাহ তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের অধিপতি মহান আল্লাহর সাথে জড়িত। পরের ছয়টি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে জড়িত। ইনসাফের দৃষ্টিতে এটাই সঠিক যে, মানুষ সর্বপ্রথম নিজের মনিবের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তাঁর হক আদায় করবে। এরপর সে নিজের এবং নিজের সাথে যারা জড়িত তাদের হক আদায় করবে। এ জন্য হযরত লূকমান প্রথমেই তাঁর সন্তানকে আপন মনিব মহান আল্লাহর হক সম্পর্কে সচেতন করেছেন। তাঁর উপদেশের ধরন এবং যে ব্যাপারটি সর্বপ্রথমে বলা প্রয়োজন, তিনি তা-ই বলেছেন। এদিকে দৃষ্টি দিলেও তাঁর সূক্ষজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি যে ভাষায় ও শব্দ ব্যবহার করে সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَاِذْقَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ –اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ–

স্মরণ করো যখন লুকমান তার নিজের পুত্র সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, কারণ শির্‌ক হলো সবথেকে বড় জুলুম।' (সূরা লূকমান)

হযরত লূকমান যে উপদেশ দিলেন, এই উপদেশের ভাষা, ভাব ও ভঙ্গির দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দুটো প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। প্রথম প্রশ্ন হলো, এই উপদেশ তিনি কি তাঁর ঔরসজাত সন্তানকে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন না তিনি জাতির প্রধান হিসেবে গোটা জাতিকে লক্ষ্য করে দিয়েছিলেন? কারণ জাতির প্রধান হিসেবে গোটা জাতি ছিলো তাঁর নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি ছিলেন সেই পরিবারের প্রধান। রাষ্ট্র নামক পরিবারের প্রধান হিসেবে তার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যই ছিলো, জাতিকে শির্‌ক মুক্তকরণ এবং নৈতিক মানে উন্নীতকরণ। অথবা সমাজের শীর্ষস্থানীয় সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন একজন জ্ঞানবান পিতা কর্তৃক তাঁর সন্তান ও সমকালীন তরুণ-যুবসমাজকে লক্ষ্য করে তিনি এই উপদেশ দিয়েছিলেন? কারণ

www.pathagar.com

সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হিসেবেও সমাজকে কলুষ মুক্তকরণের দায়িত্ব তাঁর ছিলো এবং সমাজে বসবাসরত মানুষগুলোকে নৈতিক মানে উন্নতকরণের কর্তব্যও তাঁর ছিলো।

প্রথম প্রশ্নের তথ্য নির্ভর জবাব চিন্তাবিদ ও গবেষকদের কাছে এ জন্য নেই যে, হযরত লূকমান রাষ্ট্র বা সমাজের প্রধান ছিলেন অথবা সাধারণ একজন নাগরিক ছিলেন, এ বিষয়টি স্পষ্ট না হলেও এ তথ্য অবশ্যই নির্ভুল যে, তিনি একজন সুক্ষ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেনো ছিলেন জ্ঞানের কুঞ্জবন এবং জ্ঞান পিপাসু মধুমক্ষিকার দল তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো।

জ্ঞান সুধা আহরণের লক্ষ্যে জ্ঞান পিয়াসী মানুষ তাঁর চার পাশে ভীড় জমাতো, তাঁর কাছ থেকে মানুষ নিজের মনিব মহান আল্লাহ সম্পর্কে যেমন নির্ভুল ধারণা লাভ করতো, তেমনি পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ এবং সফলতা অর্জনের পথের সন্ধান লাভেও ধন্য হতো। এ জন্যই তিনি সে যুগের একজন জনপ্রিয় বিখ্যাত জ্ঞানী ও অন্যের কল্যাণকামী ব্যক্তি হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত ছিলেন। এর প্রমাণ হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী তাঁকে কেন্দ্র করে চর্চা, তাঁর জ্ঞানের সংরক্ষণ সর্বোপরি তাঁর বিষয়টি মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ করা।

তা ছাড়া তিনি যে শব্দে সম্বোধন করেছেন–ইয়া বুনায়্যা অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান। এই শব্দটি এক বচন। এতে মনে হয় তিনি তাঁর নিজ সন্তানকেই উপদেশ দিচ্ছিলেন। যদি সমকালীন কোনো যুবসমাবেশে বক্তৃতা উপলক্ষ্যে এই উপদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে সম্বোধনের ভঙ্গী হতো, ইয়া বানী- অর্থাৎ হে সন্তানগণ! এবং ইসরাঈলীদের সম্বোধন করে যদি উপদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সম্বোধনের ভঙ্গী হতো ইয়া বানী ইসরাঈল। অর্থাৎ হে ইসরাঈলের সন্তানরা! সুতরাং তাঁর সম্বোধনের ভাষা থেকে অনুভব করা যায় যে, তিনি তাঁর সন্তানকেই লক্ষ্য করে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, তিনি 'ইয়া ইবনু' অর্থাৎ ওহে ছেলে, শব্দ ব্যবহার না করে 'ইয়া বুনায়্যা' হে আমার প্রিয় সন্তান, শব্দ কেনো ব্যবহার করেছেন?

কারণ ইবনু আর বুনায়্যা– এই শব্দ দুটোর মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আরবী আবনাউ- শব্দের অর্থ হলো পুত্রগণ, একবচনে ইবনু।

ইবনাতী শব্দের অর্থ হলো, আমার পুত্র। বানুন শব্দের অর্থও ছেলে কিন্তু এটা বহুবচন। আর বানিয়্যা বা বুনায়্যা শব্দের অর্থ হলো, আমার ছেলে– আমার প্রিয় সন্তান বা আমার প্রিয় বৎস।

www.pathagar.com

একজন পিতা তার সন্তানকে সম্বোধন করলো, এই ছেলে! আরেকজন পিতা তার সন্তানকে সম্বোধন করলো, বাবা অথবা আব্বু আমার। ছেলে চঞ্চলতা প্রকাশ করছে, পিতা তা দেখে সন্তানকে বললো, এই ছেলে! শয়তানী করে না! একই কারণে আরেকজন পিতা সন্তানকে বললো– আব্বু আমার, দুষ্টামী করে না!

এই উভয় সম্বোধনের ভাষা ও ভাব প্রকাশের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। প্রথম সম্বোধনের ভাষা সন্তানের মর্ম স্পর্শ করবে না এবং এই সম্বোধন শুনে সন্তানের মন বিগলিত হবে না বা পিতার আহ্বানে সাড়া দেয়ার জন্যে প্রবল আগ্রহেরও সৃষ্টি হবে না। কারণ এই সম্বোধনের ভাষা স্নেহের পরশ বর্জিত।

চঞ্চলতা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রেও প্রথমে যে ভাষায় সম্বোধন করা হলো, এর মধ্যেও ধমক বা হুশিয়ারী রয়েছে এবং চঞ্চলতা পরিহার না করলে শাস্তি দেয়ার বিষয়টিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই সম্বোধনে সন্তানের মনে ভীতির সঞ্চার করবে। দ্বিতীয় সম্বোধনের ভাষা ও ভাবের মধ্যে রয়েছে পরম মমতা আর স্নেহের পরশ। এই সম্বোধনে সন্তানের মনে পিতার প্রতি এক আবেগের সৃষ্টি করবে।

হযরত লুকমানকে আল্লাহ তা'য়ালা সুক্ষ্মজ্ঞান দান করেছিলেন। তিনি আপন সন্তানকে কোনো মামুলী বিষয়ে সতর্ক করছিলেন না। বিষয়টি এমনও নয় যে, সন্তান তার কথা মেনে চলুক বা না চলুক। তার বলা প্রয়োজন তিনি বলেছেন, এতে করেই তার দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এ কারণে তিনি ওহে ছেলে বা ইয়া ইবনু বলে সম্বোধন করেননি। কারণ এই সম্বোধন একেবারেই সাধারণ পর্যায়ের এবং এই সম্বোধনে সন্তানের মনে কথা মেনে চলার প্রবণতা সৃষ্টি করবে না।

তিনি আপন সন্তানকে এমন এক বিষয়ে সতর্ক করছিলেন, যে বিষয়টির সাথে মানব জীবনের সার্বিক সফলতা ও কল্যাণ জড়িত। এ ব্যাপারে সামান্যতম অসতর্ক হলেই মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ জন্যই তাঁর অন্তরে প্রবল আগ্রহ ছিলো যে, সন্তান তাঁর কথা অনুসরণ করুক এবং তাঁর কথা যেনো সন্তানের মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর উপদেশ আমৃত্যু যেনো সন্তান স্মরণে রেখে সতর্ক হয়ে পথ চলে পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা ও কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। এ জন্যই তিনি পরম স্নেহের ভাষায় মিষ্টি-মধুর ভঙ্গিতে, হৃদয়ের অতল তলদেশে যেনো তাঁর আহ্বান স্পর্শ করে, সেই ভাষা ও ভাবে সন্তানকে সম্বোধন করলেন, ইয়া বুনায়্যা অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান।

আব্বু আমার, এদিকে এসো তো! সন্তানকে এই ভাষায় যখন আহ্বান জানানো হয়, সন্তানের মনে তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রবল এক ভাবাবেগের উদ্রেক হয়। অবাধ্য সন্তানও বিনয়-বিগলিত অবস্থায় পিতার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। পিতা যা বলেন তা

www.pathagar.com

মেনে চলার জন্যে সন্তান নিজেকে প্রস্তুত করে। ঠিক এই বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে প্রথম উপদেশেই বললেন– বাবা আমার! এই মহাবিশ্ব, গোটা সৃষ্টি জগৎ, আমাকে এবং তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন, সৃষ্টিসমূহ যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি এক, একক এবং অদ্বিতীয়। এসব কাজে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং প্রয়োজনও হয় না। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বা গোলামী করতে হবে, অন্য কারো গোলামী তথা আইন-কানুন, বিধি-বিধান অনুসরণ করা যাবে না। এ জন্যই তিনি নিজ সন্তানকে এভাবে বলেছেন 'হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, কারণ শিরক হলো সবথেকে বড় জুলুম।'

শরীক বা অংশীদারিত্বের প্রয়োজন নেই

এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবীতে মানুষ সাধারণত কোনো ব্যাপারে পার্টনারসিপ বা অংশীদারিত্বে যায় তিনটি অবস্থার কারণে। ব্যবসার কথাই ধরা যাক, মানুষ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে তিনটি কারণে। প্রথম কারণ হলো, স্বল্প পুঁজির বা পুঁজির অভাবের কারণে। দ্বিতীয় কারণ হলো, ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞান, কলা-কৌশল বা বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার কারণে। অর্থাৎ শুধু পুঁজি দ্বারা ব্যবসা হয় না। যে ব্যবসা করা হবে, তা সম্পর্কে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বাজারজাতকরণের কলা-কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তৃতীয় কারণ হলো, শক্তি-সামর্থ। দৈহিক শক্তি-সামর্থ না থাকলে কেউ ব্যবসা করতে পারে না। ব্যবসার প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে হয়, বুদ্ধি মত্তা ও শ্রম প্রয়োগ করতে হয়। দৈহিক শক্তিহীন, রোগী, বৃদ্ধ, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া অথর্ব মানুষের পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সফল ব্যবসা করতে হলে পুঁজি, বুদ্ধিমত্তা ও দৈহিক শক্তি থাকতে হবে।

উল্লেখিত এই তিনটি জিনিসের অভাব হলেই মানুষ তখন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে। পুঁজি আছে কিন্তু ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞান নেই, পুঁজি ও ব্যবসা সম্পর্কিত জ্ঞানও আছে কিন্তু দৈহিক শক্তি নেই। যার পুঁজি আছে, অপর দুটো উপকরণ নেই এ জন্য সে অপর দুটো উপকরণ যার আছে, তার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করে। এটা একটি সাধারণ বিষয় এবং এই ব্যাপারটি মানুষের সম্মুখে প্রতি নিয়তই ঘটে চলেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানুষ চোখের সামনে বা নিজের জীবনে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে প্রকৃত সত্যে পৌঁছতে চায় না। এই বিষয়টি নিয়েই যদি মানুষ চিন্তা করতো, তাহলে স্পষ্টই সে অনুভব করতো, মহান আল্লাহর কোনো শরীক থাকতে পারে না এবং কোনো শরীকের তাঁর প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

ঐ তিনটি জিনিসের কোনো একটি জিনিসের অভাব হলেই না আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে শরীক করবেন– কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতি বা মানুষের নিজের দেহও সাক্ষ্য দিচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালার কোনো অভাব নেই সুতরাং শরীকেরও কোনো প্রয়োজন নেই। এ পর্যন্ত আমরা তাওহীদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালার ঐ তিনটি জিনিসের একটিরও অভাব নেই, তিনি অভাবমুক্ত, অসীম জ্ঞানের অধিকারী এবং তাঁর শক্তি-ক্ষমতা অবিনশ্বর, তিনি কল্পনাতীত শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ভান্ডার প্রত্যেক মুহূর্তে পরিপূর্ণ থাকে। তাঁর দান মানুষের সেই অজানা-অজ্ঞাত সময় থেকে প্রত্যেক মুহূর্তে স্রোতের মতই প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু তাঁর ভান্ডার সামান্যতমও হ্রাস পায় না। তিনি অমর-অক্ষয়, চিরঞ্জীব, যা খুশী তাই করতে পারেন, কোনো কিছু করতে ইচ্ছা হলে তিনি শুধু বলেন, হও– আর অমনি তা হয়ে যায়। এই বিষয়টি অনুভব করার পরও যারা শির্‌কে লিপ্ত হয়, তাদেরকে নির্বোধ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে।

যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি মারাত্মক তিনটি মিথ্যে অপবাদ আরোপ করে। এর প্রথমটি হলো, আল্লাহ তা'য়ালা অভাবমুক্ত নন– তিনি অভাবী। অভাবের দুর্বলতা তাঁর রয়েছে এবং তাঁর ভান্ডার অপূর্ণ-অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়টি হলো, তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ, মহাবিশ্বের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন না, এ জন্য তাঁকে ভিন্ন শক্তির ওপরে নির্ভর করতে হয় বা কোনো মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়। তৃতীয়টি হলো, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁকে অন্যের শক্তির ওপরে নির্ভর করতে হয়।

যারা শির্‌ক করে, তারা এই তিনটি মারাত্মক মিথ্যে অপবাদ মহান আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, শির্‌ক হলো, সবথেকে বড় জুলুম।

শির্‌ক হলো ধারণা, কল্পনা ও অনুমান নির্ভর, এর কোনো বুনিয়াদ বা ভিত্তি নেই। শির্‌কের পক্ষে কোনো সনদ-প্রমাণ বা দলীল নেই। কল্পিত যেসব বস্তু বা শক্তিকে মহান আল্লাহর অংশীদার মনে করা হয়, স্থূল দৃষ্টিতে দেখলেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসব কিছুই একজন অদ্বিতীয় স্রষ্টার সৃষ্টি আর এরা হলো সেই মহান স্রষ্টার দাস। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ–

তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করে আর যাদেরকে আহ্বান করো, তারা তো তোমাদের মতই দাসানুদাস মাত্র। (সূরা আরাফ-১৯৪)

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মানুষ আমাকে ত্যাগ করে, আমাকে বাদ দিয়ে যেসব শক্তির সামনে মাথানত করছে, মানুষ কি চিন্তা করে দেখছে না, এসব শক্তির স্রষ্টা আমি এবং সেগুলো আমারই দাসত্ব করছে। আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা বলেন, জড় পদার্থের সামনে তোমরা মাথানত করো, মূর্তির সামনে তোমরা তোমাদের হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করো, তাদের কাছে তোমরা প্রার্থনা করো, সন্তান কামনা করো, ধন-দৌলত কামনা করো, বিপদ থেকে পরিত্রাণ চাও, রোগ থেকে মুক্তি চাও, তারা কি তোমাদের ডাক শোনে? তাদের সামনে তোমরা নানা ধরনের মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সাজিয়ে রেখেছো, সেসব খাবার তারা খেতে পারে না, সেসব খাবারে যদি একটা মাছি বসে, সে মাছিকেও তারা তাড়িয়ে দিতে সক্ষম নয়, তাহলে তোমরা কেনো এমন অথর্ব, অক্ষম মূর্তিকে ডাকো?

তোমাদের কি চোখ নেই? তোমাদের কি কান নেই? তোমাদের কি চিন্তা করার মত মগজ নেই? তোমরা কি চিন্তা করে দেখো না? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা এমন সব শক্তিকে ডাকে, তাদের কাছে প্রার্থনা করে, যারা তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্তও উত্তর দিতে সক্ষম নয় আর তারা তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই শ্রেণীর লোকজনদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? (সূরা আহ্কাফ-৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন্ বলেন, এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব শক্তির পূজা-অর্চনা করে, তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, এসব মূর্তি তাদের প্রার্থনা শোনে না, শোনার ক্ষমতা তাদের নেই। প্রার্থনাকারী কি প্রার্থনা করছে, সে সম্পর্কে এসবের কোনো চেতনা নেই। এরা মানুষের উপকার বা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনো শক্তিকে ডাকবে না, যারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না, তোমার কোনো ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়। তুমি যদি তাদেরকে ডাকো, তাহলে তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুছ-১০৬)

www.pathagar.com

তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে, যিনি প্রার্থনা শোনেন, যিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। যিনি মানুষের প্রতিপালক। যিনি কখনও ধ্বংস হন না যিনি চিরঞ্জীব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

هُوَالْحَيُّ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَفَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা ডাক কেবল তাঁকেই একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য সহকারে। আর সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, যিনি গোটা জাহানের প্রতিপালক। (সূরা মু'মিন-৬৫)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা যাদেরকে ডাকছো, যাদের কাছে দোয়া করছো, তারা কোনো জিনিসের মালিক নয়–নয় কোনো বস্তুর স্রষ্টা। তারা স্বয়ং আমারই সৃষ্টি। তারা তোমার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ-اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের কাছে দোয়া করো, তাদের কেউই একবিন্দু তুচ্ছ জিনিসের মালিক নয়। তারপরও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো, তাদের কাছে দোয়া করো, তবে তারা তো তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না, শুনতে পারে না তোমাদের দোয়া। (সূরা ফাতির-১৩-১৪)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন, আফালা তা'কিলুন–আফালা তুবছিরুন, তোমরা কি বোঝো না? তোমরা কি চিন্তা করো না? তোমাদের কি জ্ঞান নেই? আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছি, চোখে যে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি, তা ব্যবহার করো, প্রয়োগ করো তোমার চিন্তাশক্তি। তাহলেই তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তোমরা যাদের মা'বুদ মনে করছো তাদের বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। মাছির মতো ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর পাখাও নির্মাণ করার শক্তি তাদের নেই।

সকল ক্ষমতা ও শক্তির একমাত্র উৎস হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা, তাঁর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না– এ কথা পবিত্র কোরআনের বহুস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ 'আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার উৎস' এটা স্বীকার করতে চায় না। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র একটি মুখরোচক শ্লোগান আবিষ্কার করেছে, 'সমস্ত

www.pathagar.com

ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।' এই কথাটি আসলে প্রতারণামূলক। এই শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারণা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা হয়। জনগণের নাম ভাঙ্গিয়ে একশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবর্গ নিজের স্বার্থে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের শ্লোগান দেয়া বা এ কথা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ কথা যারা বিশ্বাস করবে এবং প্রচার করবে, তারা অবশ্যই শিরক্ করবে। আর শিরক্ হলো সবচেয়ে বড় গোনাহ্ এবং আল্লাহর সাথে কৃত এক জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হলেন সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং তাঁরই সৃষ্টি মানুষ সম্পর্কে তিনি বলছেন–

وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا–

মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আন্ নিসা-২৮)

মানুষের দুর্বলতা স্বয়ং মানুষের চোখেই স্পষ্ট, এই দুর্বল মানুষ কিভাবে সকল ক্ষমতার উৎস হতে পারে? এ ধরনের কথা যারা বলে আর যারা বিশ্বাস করে, উভয়েই শিরক করে- সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে সব ধরনের গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু শিরককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

আল্লাহর সাথে শিরক্ করা হলে তিনি তা ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য গোনাহ্ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করে দেন। (সূরা নিসা–১১৬)

'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ কথাটি বিশ্বাস করা শিরক তথা কুফ্রী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ–

যারা শিরক্ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত হারাম করেছেন।

এ জন্যই জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে শিরকমুক্ত রাখার লক্ষ্যেই হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন, 'হে আমার প্রিয় সন্তান, আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করো না, শিরক অবশ্যই সবথেকে বড় জুলুম।' এ জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে শিরক থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে তাওহীদের চেতনাভিত্তিক জীবন-যাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

শিরক সবথেকে বড় জুলুম হবার কারণ

হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে মহান আল্লাহর সাথে শিরক স্থাপন করতে নিষেধ করে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর সাথে শিরক করা হলো সবথেকে বড় জুলুম। হযরত লুকমান (আঃ) উপদেশ দিচ্ছিলেন নিজের প্রিয় সন্তানকে। এই পৃথিবীতে একজন পিতা নিজের ব্যতীত অন্য কারো স্বার্থে যখন লাভজনক কোনো কাজ করে, তখন সর্বপ্রথম সে তার নিজের সন্তানের জন্যই সেই লাভজনক কাজটি করে থাকে। আর অবস্থা যদি এমন হয় যে, সচেতনভাবে হোক আ অসচেতনভাবে হোক, মানুষ অকল্যাণ, ব্যর্থতা আর মারাত্মক ক্ষতির দিকেই দ্রুত বেগে এগিয়ে যেতে থাকে। এ সময় এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে নিজেকে হেফাজত করার মতো কোনো উপায় যদি পিতার জানা থাকে, তাহলে পিতা সর্বপ্রথম সেই উপায়টি নিজের প্রিয় সন্তানকেই জানিয়ে দেয়।

আরেকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ে অনেকের সন্তান লেখাপড়া করে। ঘটনাক্রমে যদি সেই বিদ্যালয়ে অগ্নিকান্ড ঘটে, তাহলে প্রত্যেক সন্তানের পিতা নিজের সন্তানের ব্যাপারেই সবথেকে বেশী উদ্বিগ্ন থাকে এবং নিজের সন্তানকেই বাঁচানোর চেষ্টা করে। মহান আল্লাহর সাথে শিরক করার বিষয়টিকে যদি সর্বগ্রাসী আগুনের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে বলা যায় যে, এই শিরক মানুষকে নিঃশেষ করে দেয়- ধ্বংসের শেষ স্তরে পৌছে দেয়। জ্ঞানী পিতা যখন অনুভব করেন, আমার সন্তান নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, ধ্বংসের অতল তলদেশে পৌছে যেতে পারে, তার জীবনের সবটুকু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এই ভয় আর আশঙ্কা একজন প্রতারক ব্যক্তিকেও চরমভাবে উৎকণ্ঠিত করে তোলে। সে প্রতারক হলেও নিজের সন্তানের সাথে এই অবস্থায় কোনোক্রমেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সে জানে, এখন যদি সে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তার প্রিয় সন্তান মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে। এ জন্যই পিতা তার সন্তানকে মহাক্ষতি থেকে হেফাজত করার জন্য তার জ্ঞান অনুযায়ী সন্তানকে সত্য-সঠিক পথে অগ্রসর হবারই পরামর্শ দেয়।

শিরক-কে ব্যাপক বিধ্বংসী বর্তমান যুগের আণবিক বোমার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি নগর, একটি সভ্যতা অগণিত অর্থ ব্যয় ও দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপী পরিশ্রমের বিনিময়ে গড়ে ওঠে। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাশক্তি আমেরিকা আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেছিলো। এই শহর দুটো ধ্বংসের পূর্বে সেখানে বিশাল আকারের অট্টালিকা, কলকারখানা ও অন্যান্য উপকরণ গড়তে অগণিত অর্থ ব্যয় করতে

www.pathagar.com

হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষের মেধাশক্তি ও শ্রম ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু আণবিক বোমা মুহূর্তেই তা ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিলো। অর্থাৎ ঐ শহর দুটো গড়তে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু ধ্বংস করতে সময়ের প্রয়োজন হয়নি। অনুরূপভাবে একজন মানুষ তার জীবনকাল ব্যাপী নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত আদায় করেছে, কিন্তু আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে বা সমর্থন ব্যক্ত করে যে শির্ক সে করেছে, এই শির্ক তার সমস্ত ভালো কাজ বিনষ্ট করে দিয়েছে।

জীবনব্যাপী অর্জিত ভালো কাজগুলো ধ্বংস করার জন্য একটি মাত্র শির্ক নামক গোনাহ্ই যথেষ্ট। যে ব্যক্তির আমলনামায় শির্কের গন্ধ থাকবে, মহান আল্লাহ আখিরাতের ময়দানে তার দিকে দৃষ্টিও দিবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا–

এবং তাদের সমস্ত কৃত কর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো। (সূরা ফুরকান-২৩)

আদালতে আখিরাতে মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের আমলনামা দেখবেন। আমলনামার দিকে তিনি মনোনিবেশ করবেন এবং যার আমলনামায় শির্ক দেখতে পাবেন, মুহূর্তকালের মধ্যে সেই আমলনামায় উল্লেখকৃত ভালো কাজসমূহ বিক্ষিপ্ত ধুলোয় পরিণত করবেন। শির্ক মিশ্রিত আমলের কোনোই মূল্য নেই। পৃথিবীতে যে যতো বিখ্যাতই হোক না কোনো, মানুষের জীবন যাত্রা উন্নয়নে এবং দেশ ও জাতিকে সুন্দর করে সাজাতে যিনি যতো বড় অবদানই রাখুক না কোনো, তার আমলনামায় যদি শির্ক থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনোই মূল্য নেই, তার সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, লুকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞান দেয়া হয়েছিলো এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি জানতেন যে, মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করার পরিণতি হলো, জীবনের যাবতীয় অর্জন শেষ হয়ে যাওয়া এবং নিজেকে ধ্বংসের অতল তলে নিক্ষেপ করা। হযরত লুকমান সর্বপ্রথমে নিজের সন্তানকে সেই মহাক্ষতি থেকে হেফাজত করার জন্যে প্রিয় সন্তানকে বলেছিলেন– হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।

হযরত লুকমান তাঁর নিজের সন্তানকে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক না করার উপদেশ দিয়ে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যথার্থই শিরক অনেক বড় জুলুম। জুলুম আরবী শব্দ, এই শব্দটি ইনসাফ বিরোধী কাজ করার ক্ষেত্রে, কারো অধিকার হরণ করার ক্ষেত্রে, অবিচার, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যে

www.pathagar.com

জিনিস যে স্থানে থাকার যোগ্য, তাকে সে স্থানে না রেখে অন্যত্র রাখার অর্থ হলো, সেই জিনিসের সাথে জুলুম করা। শির্‌ক এজন্যই সবথেকে বড় জুলুম যে, মহান আল্লাহর জন্য যা প্রযোজ্য নয় এবং যা প্রযোজ্য– শির্‌কারীরা এর বিপরীত কাজই করে থাকে। যে গুণ-বৈশিষ্ট্য একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কারো নেই, সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সৃষ্ট কোনো বস্তু বা প্রাণীর প্রতি আরোপ করা। যে ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর, সেই ক্ষমতা অন্য কারো মধ্যে রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। যে অধিকার একমাত্র আল্লাহর, অন্য কাউকে সেই অধিকার প্রদান করা বা তাকে সেই অধিকারের অধিকারী বলে মনে করা। এসবই হলো সুস্পষ্ট জুলুম।

একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য যে গুণ-বৈশিষ্ট্য, অধিকার, ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ধারিত, তা যখন মানুষ অন্য কারো প্রতি আরোপ করে, তখন সে মানুষ যা কিছুই ব্যবহার করে, তা-ও মহান আল্লাহরই সৃষ্টি। মানুষকে দেহ, মন, দেখা, শোনা, চিন্তা করার ক্ষমতা, দৈহিক ও কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা। এসব কিছু এবং মহান আল্লাহর সৃষ্ট নানা জিনিসও ব্যবহার করে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসব কিছু তাকে দান করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার জন্য– অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করার জন্য নয়।

কিন্তু শির্‌ককারী এর বিপরীত কাজই করে আর এটাই হলো জুলুম। মানুষকে সৃষ্টিসহ যাবতীয় ব্যাপারে যিনি প্রতিপালন করছেন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করলে মানুষের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের অবস্থানও যথাস্থানে থাকে। আর এর বিপরীত করলে মানুষ নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যায় এবং মানুষ হিসেবে তার অবস্থান যথাস্থানে থাকে না। সুতরাং যারা শির্‌ক করে, তারা নিজেদের সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করে নিজেদেরকে অসম্মান ও ঘৃণা-লাঞ্ছনার অবস্থানে নিক্ষেপ করে– আর এটাও সুস্পষ্ট জুলুম। কারণ কোনো মানুষকে এই অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে অসম্মানিত করবে।

অধিকার সচেতন করা আল্লাহর নিয়ম

সূরা লুকমানের ১৩ নম্বর আয়াত থেকে হযরত লুকমানের উপদেশের কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর সন্তানকে যে নয়টি উপদেশ দিয়েছেন– তা শেষ হয়েছে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা হযরত লুকমানের উপদেশের কথাগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ না করে ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়াতে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ১৬ নম্বর আয়াত থেকে পুনরায় হযরত লুকমানের উপদেশের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত লুকমানের উপদেশের সমগ্র কথাগুলো একের পর এক উল্লেখ না করে, প্রথম উপদেশের কথাগুলো উল্লেখ করেই পিতামাতার প্রসঙ্গ কেনো উল্লেখ করলেন?

হযরত লুকমানের প্রথম উপদেশের কথাগুলোর মধ্যেই উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে–'হে আমার প্রিয় সন্তান, আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করো না, শিরক অবশ্যই সবথেকে বড় জুলুম।'

একজন সচেতন পিতা হিসেবে সন্তানের প্রতি হযরত লুকমানের যে দায়িত্ব-কর্তব্য ছিলো, তিনি তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। সন্তানের প্রতি তাঁর প্রথম দায়িত্বই ছিলো, তিনি সন্তানকে সেই সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন, যে সত্তা একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর এককত্ব, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট, অসীম ক্ষমতা, সীমাহীন জ্ঞান এবং অন্যান্য যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন করতে হবে। মানুষের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে হক বা অধিকার রয়েছে, পিতা সেই হক বা অধিকার সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন ও দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তুলবেন। হযরত লুকমান নিজ সন্তানের প্রতি সেই দায়িত্ব এমন সুন্দর ভাষা ও পদ্ধতিতে পালন করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তা খুবই পছন্দ হয়েছে এবং এ জন্যই তিনি তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে সমগ্র মানব মন্ডলীর শিক্ষার জন্য পেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে হযরত লুকমান যখন এই গুরু দায়িত্ব অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নের সাথে পালন করলেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালাও খুশী হয়ে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য ও সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে সন্তানকে সজাগ-সচেতন করে দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা যেনো হযরত লুকমানকে এ কথাই জানিয়ে দিলেন, তুমি যেমন আমার সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে তোমার সন্তানকে সজাগ-সচেতন করলে, আমিও তোমাদের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে তোমার সন্তানকে সতর্ক করে দিলাম। পিতামাতা হিসেবে সন্তানের কাছে তোমাদের কি মর্যাদা এবং তোমাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, তা জানিয়ে দিলাম।

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন অনেকগুলো অধিকার আর কর্তব্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার ও কর্তব্যকে দুই অংশে বিভক্ত করে এক অংশের নাম দেয়া হয়েছে আল্লাহর হক বা অধিকার এবং অপর অংশের নাম দেয়া হয়েছে বান্দার হক বা অধিকার। যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, একান্ত অনুগ্রহ করে সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছেন, তার জন্যে এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করেছেন, অগণিত নে'মাত দিয়ে ধন্য করেছেন, তাকে প্রতিপালন করছেন, সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য জীবন বিধান দিয়েছেন, সেই আল্লাহর প্রতি মানুষের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব হলো, মানুষ তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর দাসত্ব করবে।

অলৌকিক পন্থায় এই পৃথিবীতে আসার কোনো পদ্ধতি মানুষের নেই, মানুষকে পিতামাতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে আসতে হয় এবং তাদের আপত্য স্নেহ-ভালোবাসায় সে বেড়ে ওঠে। এখানে মানুষকে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকজনের সাহায্য-সহযোগিতায় জীবন-যাপন করতে হয়। এসব লোকজনের অধিকার রয়েছে একের প্রতি অন্যের। শুধু তাই নয়, মানুষ যে পৃথিবীতে বসবাস করছে, এই পৃথিবীতে মানুষ জীব হিসেবে শুধু একাই বসবাস করে না। আরো অসংখ্য জীব রয়েছে যারা এই পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল এবং এসব জীব মানুষেরই প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। শুধু জীবই নয়– অগণিত বস্তু সম্ভারে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীর প্রত্যেক স্তর। এসব বস্তু সম্ভারও কোনো না কোনোভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত এবং এসব বস্তু মানুষের কল্যাণেই দান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ–

তিনি তোমাদের উপকারার্থে আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে তোমরা জানোই না। (সূবা আন্ নাহ্ল-৮)

নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের প্রত্যেক স্তরে এমন অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে, এসব সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ এখন পর্যন্ত কিছুই জানে না। অথচ এসব সৃষ্টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে মানুষের এসব প্রত্যেক বস্তু ও জীবের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষ কিভাবে পালন করবে, সে দিকনির্দেশনাও মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন অবতীর্ণ করে তাঁর নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কাছে কি দাবী করেন এবং সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহর প্রতি মানুষের কি অধিকার রয়েছে, এ ব্যাপারেও আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর অধিকারের বিষয়টি এক কথায় এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে, অন্য কারো দাসত্ব করবে না এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

বিষয়টি বোখারী ও মুসলিম হাদীসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর এই অধিকার রয়েছে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও বন্দেগী

www.pathagar.com

করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মানুষ যদি এই অধিকার আদায় করে তখন আল্লাহ তা'য়ালার ওপর মানুষের যে অধিকার সৃষ্টি হয়, তাহলো আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে আযাবে নিক্ষেপ করবেন না।

হযরত লুকমান তাঁর নিজের সন্তানকে মহান আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে সজাগ, সচেতন করে পৃথিবীর সমস্ত পিতামাতা ও অভিভাবকদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন, নিজের সন্তান ও অধীনস্থদের প্রতি সর্বপ্রথম কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানুষের সাথে মহান আল্লাহর কোন্ ধরনের সম্পর্ক এবং আল্লাহর প্রতি মানুষকে কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে, এ ব্যাপারে সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে যেমন জানিয়ে দিয়েছেন, তেমনি প্রত্যেক নবী-রাসূলদের মাধ্যমেও মানুষকে মানুষের ভুলে যাওয়া সেই পাঠ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রুহের জগতে সমস্ত রুহ্কে একত্রিত করে আল্লাহ নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' প্রত্যেক রুহ্ একবাক্যে স্বীকার করেছিলো, 'অবশ্যই আপনি আমাদের রব।' এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি মানুষের কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণের সময় জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের দিকনির্দেশনা তোমার কাছে যেতে থাকবে।' এরপরও প্রত্যেক নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো এবং সর্বশেষে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হলো যে–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে। (সূরা আন্ নাহ্ল-৯)

মানুষকে সত্য ও মিথ্যা এবং অধিকার সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজের ওপরে একান্ত অনুগ্রহ করে নিয়েছেন। এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে না জানিয়ে মানুষের ভুলের জন্য গ্রেফতার করা মহান আল্লাহর নীতি নয় এবং তিনি ইনসাফের বিপরীত কোনো কাজ করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً–

আর আমি হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝানোর জন্য রাসূল প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি দেই না। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৫)

www.pathagar.com

পূর্বেই নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম ও আল্লাহর হক এবং বান্দার হক সম্পর্কে যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে না জানিয়ে মানুষকে গ্রেফতার করা তাঁর নিয়ম নয়। অধিকার সচেতন না হবার কারণে অধিকার আদায় করতে পারলো না এ জন্য তাকে গ্রেফতার করা হবে, এটা কোনোক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى–

আমি রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করার পূর্বেই যদি কোনো শাস্তি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে এই লোকেরাই বলতে পারতো যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠালে না কেনো? তাহলে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলা শুরু করে দিতাম। (সূরা ত্বাহা-১৩৪)

এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজের উদ্যোগে তাঁর বান্দাদেরকে অধিকার সচেতন করেছেন। ন্যায়-অন্যায়বোধ মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দান করেছেন। এরপর নবী-রাসূল প্রেরণ করে এবং আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করে মানুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা সজাগ-সচেতন করেছেন। হযরত লুকমান যখন আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার সম্পর্কে নিজের সন্তানকে সতর্ক করলেন, আল্লাহ তা'য়ালাও সন্তুষ্ট হয়ে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে সন্তানকে সতর্ক করলেন।

রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করার পর মানুষের নিজের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শাস্তি দেয়া হলে মানুষের কোনো ওজর-আপত্তি থাকে না। কারণ এই শাস্তির জন্য সে স্বয়ং দায়ী– অন্য কাউকে দায়ী করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে রাসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ করে মানুষকে কোনো কাজের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত না করা এবং সেজন্য তাকে কোনো শাস্তি না দেয়া আল্লাহর ওপর মানুষের হক। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের এই হক বা অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

পিতা-মাতার অধিকার

আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে জেনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। কারণ তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছরে উপনীত হয়ে সে দুধ পান করা ছেড়েছে। (এ কারণেই আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নিজের পিতামাতার প্রতিও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং সব শেষে তোমাদের সবাইকে) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান-১৪)

এই আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে, মানুষ পৃথিবীতে যাদের মাধ্যমে আগমন করেছে এবং যাদের আপত্য স্নেহ-বাৎসল্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে জেনে নিতে বলা হয়েছে। কোনো বিষয়ে যখন কোনো ব্যক্তিকে জেনে নিতে বলা হয়, তখন এটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় যে, উক্ত ব্যক্তিকে যে বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে বলা হচ্ছে, ইতোপূর্বে সে তা জানতো না। সন্তানের নিকট পিতামাতার প্রকৃত কি অধিকার রয়েছে, এ কথা পৃথিবীর কোনো সন্তানই জানে না বা জানার কোনো মাধ্যমই তার কাছে নেই। মানুষকে যতটুকু জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, এর সবটুকু প্রয়োগ করেও পিতামাতার প্রকৃত অধিকার সন্তানের পক্ষে আদায় করা সম্ভব ছিলো না বিধায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত দয়া করে মানব সন্তানকে তার পিতামাতার প্রকৃত অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান নবী-রাসূল প্রেরণ ও আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি মানুষকে তার পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছি।'

এই নির্দেশ পবিত্র কোরআনে যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকারের প্রত্যেক দিক সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সজাগ-সচেতন করেছেন। তিনি নিজের পিতা ও গর্ভধারিণী মা'কে শৈশবেই হারিয়ে ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁর দুধ মা এবং শৈশবে তিনি যাঁদের আপত্য স্নেহ-মমতায় লালিত-পালিত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-মমতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন, তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিতামাতার অধিকার আদায় করতে হবে, এই নির্দেশ কোনো নতুন নির্দেশ নয়– প্রত্যেক নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমকালীন জনগোষ্ঠীকে পিতামাতার অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ-وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاوَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْالِلنَّاسِ حُسْنًا-

স্মরণ করো, বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে আমি ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। পিতামাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে। (সূরা বাকারা-৮৩)

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে পিতা ব্যতীতই মাতৃগর্ভে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁকেও তাঁর মায়ের হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। তিনি নিজের জবানীতেই বলেছেন–

وَّبَرًّا بِوَلِدَتِىْ-وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا-

আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি। (সূরা মারয়াম-৩২)

মানুষের ওপর আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার সর্বপ্রথম এর পরেই মানুষের নিজের ওপর নিজের অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার সর্বপ্রথম এই জন্য যে, তিনিই এই মহাবিশ্বের মহান সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষই তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই নিখিল বিশ্ব, পৃথিবী ও মানুষকে একান্ত অনুগ্রহ করে তিনি সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব হতো না এবং কারো হক আদায়েরও কোনো প্রশ্ন উঠতো না। মানুষের নিজের ওপরে নিজের যে অধিকার রয়েছে, তা যদি আদায় না করে, তাহলে সেই মানুষের পক্ষে অন্যের হক সম্পর্কে সজাগ-সচেতন হওয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা আদায় করাও সম্ভব নয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বান্দার ওপরে আল্লাহর অধিকার এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করার পরই সর্বপ্রথমে মানুষের নিজের পিতামাতার অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে এই জীবন লাভ করা সম্ভব হতো না, এটা যেমন অকাট্য সত্য– তেমনি একথাও পরম সত্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে পিতামাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছেন। পিতামাতা ব্যতীত এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির যে ধারাবাহিকতার সূচনা করেছেন, এর সূচনায় সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষভাবে একজন পুরুষ মানুষকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন। এরপর একজন নারী

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে উভয়কেই দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ করে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এক পবিত্র বন্ধনে বেঁধেছেন এবং পবিত্রতার মাধ্যমেই মানব বংশের ধারা শুরু করেছেন। মানব বংশ যাদের মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করছে, সেই পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞশীল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এখানে এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, পিতামাতার প্রতি সন্তানকে কৃতজ্ঞশীল হওয়ার পূর্বে মানব সন্তানকে ঐ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞশীল তথা আল্লাহর হক আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا الاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا–اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا–وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا–

এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছে যায় তাহলে তাঁদেরকে উহ্ শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভর্ৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সঙ্গে আদব ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো, হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল–২৩-২৪)

যে কোনো বিচার বিশ্লেষণে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা পিতা ও মাতা। পিতামাতাই হলেন একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে উঁচু স্থানের অধিকারী। আল্লাহ্র পরেই পিতামাতার স্থান। ব্যক্তির কাছে সকল বিবেচনায় যে কোনো বিষয়ে প্রথম হকদার হলো তার পিতা ও মমতাময়ী মাতা, যাদের ত্যাগ-তীতিক্ষার সামান্য একবিন্দুর মূল্য সন্তানের পক্ষে পরিশোধ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এ জন্য সন্তানকে পিতামাতার প্রতি অনুগত, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদবোধ সম্পন্ন হতে হবে। সমাজের সকল স্তরের নৈতিক মূল্যবোধ এমন পর্যায়ে উপনীত করতে হবে যেনো, সন্তান পিতামাতার মুখাপেক্ষীহীন হয়ে না পড়ে– বর্তমানে যা পশ্চিমা দেশগুলোয় হয়েছে। বরং সন্তান নিজেদেরকে পিতামাতার অনুগৃহীত মনে করবে এবং তাদের বৃদ্ধ বয়সে ঠিক

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে সেবা-যত্ন করার প্রশিক্ষণ দিবে, যেভাবে শৈশবে পিতামাতা তাদের পরিচর্যা, লালন-পালন করেছেন এবং নানা ধরনের ব্যবহার-মান-অভিমান সহ্য করেছেন।

ঠিক এই কারণেই ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর সভ্যতা-সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পিতামাতার প্রতি সন্তানের আচার-আচরণ, আনুগত্য ও তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পিতামাতার অধিকারের বিষয়টি চিরকালের জন্য এক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র আইন-কানুন, প্রথা-পদ্ধতি, নিয়ম-বিধি, বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনামূলক বিধি-বিধান এবং শিক্ষানীতির মাধ্যমে পারিবারিক ব্যবস্থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সংরক্ষণ করার যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করবে।

পিতামাতার সম্মুখে সন্তানের বিনীত আচরণ

সূরা বনী ইসরাঈলের উল্লেখিত আয়াতে পিতামাতার হক আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথমে মানব সন্তানকে তাওহীদের দাবী আদায় অর্থাৎ মহান আল্লাহর হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন– একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে, তাঁরই বিধান অনুসরণ করতে হবে, তাঁর বিধান ব্যতীত অন্য কারো বিধি-বিধান অনুসরণ করা বা দাসত্ব করা যাবে না। এক কথায় মহান আল্লাহর সাথে কারো শরীক করা যাবে না। এরপরই পিতামাতার হক আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই দুটো নির্দেশ একই আয়াতে পরপর দেওয়ার কারণ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেন, মানুষকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ও পিতামাতার বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে একান্তভাবে বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। মানুষের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালনকারী হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং বান্দা সর্বপ্রথম তাঁরই হক আদায় করবে। কিন্তু মানব শিশুকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যক্ষভাবে নিজে প্রতিপালন করেন না, করেন পিতামাতার মাধ্যমে। এ কারণেই বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকারের বিষয়টি বর্ণনা করার পরপরই পিতামাতার অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পিতামাতার মাধ্যমে মানব সন্তানকে কিভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন তা সন্তানের প্রতি পিতামাতার অকৃত্রিম আচরণের প্রতি লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের প্রতি যে আকর্ষণ, মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এ কারণে সারা পৃথিবীর সমগ্র

www.pathagar.com

ধনরাশির বিনিময়েও পিতামাতা স্বয়ং সন্তানের সামান্যতম অমঙ্গল করতে পারে না। সন্তানের জন্য যাবতীয় বিপদ-আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মতো হিম্মত পিতামাতার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে সন্তানকে নিরাপদ রাখার মতো মমতা পিতামাতার হৃদয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-যৌবন, সুখ-সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশ কোরবানী দেয়ার মতো মানসিকতা পিতামাতাকে আল্লাহই দিয়েছেন। সন্তানের কান্না তীরের মতোই পিতামাতার কলিজায় বিদ্ধ হয়, কান্না শোনার সাথে সাথে সমস্ত কাজ ত্যাগ করে পিতামাতা সন্তানের কাছে ছুটে আসেন, এ ব্যাবস্থাও আল্লাহই করেছেন।

সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য রৌদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, নিজের শারীরিক অসুস্থতা বা যে কোনো বিরূপ পরিবেশ উপেক্ষা করে অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে পরিশ্রম করার সাহস আল্লাহই পিতার হৃদয়ে সৃষ্টি করেছেন। পিতামাতাই প্রয়োজনে ক্ষুধার্ত থেকে সন্তানকে পেট ভরে খেতে দেন। রোগে আক্রান্ত সন্তানের মাথার কাছে পিতামাতাই নির্ঘুম রাত অতিবাহিত করেন, পরম মমতায় বারবার সন্তানের শরীরে স্নেহমাখা হাত রাখেন। রোগে আক্রান্ত সন্তান মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হলে পিতামাতাই অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়ে মহান আল্লাহকে বলতে থাকেন, 'হে আমার আল্লাহ! আমাকে নিয়ে যাও আর আমার নয়নের মণিকে ভিক্ষা দাও!' পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের জন্য এই যে, মায়া-মমতা কে সৃষ্টি করেছেন? ঐ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন– যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে প্রতিপালন করছেন। সুতরাং পিতামাতাকে আল্লাহ তা'য়ালা মানব সন্তানের প্রতিপালনের মাধ্যম করেছেন।

এই জন্যই পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে বার বার সচেতন করে দিয়েছেন। তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার ও অন্তর দিয়ে খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসে, মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে যায়। সমস্ত দিকে খেয়াল রাখতেও পারে না। বিরক্তিকর কর্মকাণ্ড করতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সন্তানদেরকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, তারা যখন ছোট ছিল, সে সময়ে কত ভাবেই না মা-বাপকে যন্ত্রণা দিয়েছে। চোখের সামনে যা দেখেছে, সে সম্পর্কে মা-বাপকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে, কষ্ট করে মা-বাপ খাওয়াছেন সেই খাবার বমি করে দিয়েছে। মা-বাপ আবার কষ্ট স্বীকার করে খাওয়ায়েছেন। প্রসাব-পায়খানা করে মা-বাপের শরীর মাখিয়ে দিয়েছে। মা- বাপ বিরক্ত হননি।

ঠিক এই অবস্থা যখন বৃদ্ধ পিতামাতার হয়-তখন সন্তানও নিজের শিশুকালের কথা স্মরণ করে মা-বাপের খেদমত করবে। মা-বাপ যেমন মানুষকে দেখানোর জন্যে বা

www.pathagar.com

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে সন্তানের খেদমত করেনি, খেদমত করেছেন অন্তর দিয়ে গভীর মমতার সাথে। তেমনি সন্তানকেও মা-বাপের খেদমত করতে হবে পরম মমতা ভরে।

বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা এখানে-সেখানে থুথু বা কফ্, সর্দ্দি ফেলতে পারেন। প্রসাব-পায়খানা করে দিতে পারেন। গভীর মমতায় সন্তানকে এসব পরিষ্কার করতে হবে। মা-বাপ বয়সের ভারে না বুঝে বিরক্তিকর কথাবার্তা বলতে পারেন, ক্ষতিকর কর্মকান্ড করতে পারেন, রুক্ষ মেজাজ দেখাতে পারেন, অকারণে অভিমান করতে পারেন। এসব ব্যাপারে সন্তান যদি চোখ বড় করে মা-বাপের দিকে তাকায়, বিরক্ত হয়ে উহ্ আহ্ শব্দ প্রকাশ করে তাহলে জান্নাতের বদলে জাহান্নামেই যেতে হবে।

কঠিন স্বরে, ধমকের ভাষায়, বাপ-মায়ের সামনে বেআদবের ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠে কোনোক্রমেই কথা বলা যাবে না। বাপ-মায়ের সাথে কথা বলার সময় ভাষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন কোনো শব্দও ব্যবহার করা যাবে না, যে শব্দ বাপ-মায়ের অন্তরে ব্যথার সৃষ্টি করে। বৃদ্ধ পিতামাতার দিকে দৃষ্টি দিয়েই সন্তানকে বারবার নিজের শিশুকাল, নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করতে হবে। তার প্রতি তারই বৃদ্ধ পিতামাতা কি অসীম ধৈর্যসহকারে দায়িত্ব পালন করেছেন– একথা স্মরণে রেখে পিতামাতার প্রতি যত্ন নিতে হবে।

পিতামাতার খেদমত করার সময় সন্তানকে একথা মনে রাখতে হবে যে, পিতামাতার খেদমত করে পিতামাতার প্রতি কোনো দয়া, অনুগ্রহ করছে না, বরং সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছে। শুধু তাই নয়– মহান আল্লাহ পিতামাতার খেদমত করার সুযোগ দিয়ে তার প্রতিই অসীম অনুগ্রহ করেছেন। এই চেতনা প্রত্যেক সন্তানের মনে জাগ্রত রেখে মা-বাপের সেবা-যত্ন করতে হবে।

সন্তানকে মহান আল্লাহর দরবারে বারবার সিজদা দিতে হবে এজন্যে যে, ঐ আল্লাহ তাকে পিতামাতার খেদমত করার মতো এক মহান কাজ আঞ্জাম দেয়ার তওফিক দিচ্ছেন। এই মহান কাজ সম্পাদন করার সুযোগ সবার ভাগ্যে হয়না। পরিবারের সকলের প্রয়োজন পূরণের পূর্বে পিতামাতার প্রয়োজন পুরণ করতে হবে। নিজের স্ত্রী এবং সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে প্রথমে নিজের বৃদ্ধ পিতামাতার প্রয়োজন পূরণ করতে হবে এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি।

পিতামাতার সেবা-যত্ন করার সময় পিতামাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মানস পটে ভাসিয়ে তুলতে হবে সুদূর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া সেই দিনগুলোর স্মৃতি, যখন সে ছিলো এক অসহায় শিশু। আজকের অথর্ব বৃদ্ধ পিতামাতা সেদিন ছিলেন

www.pathagar.com

তারই মতো এক প্রাণোচ্ছল তরুণ-যুবক। মা ছিলেন লাবণ্যময়ী এক যুবতী। মাথায় ছিলো ভ্রমর কৃষ্ণ কুন্তল রাশি। কালের আবর্তনে সব হারিয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহর অমোঘ বিধানে সেই প্রাণোচ্ছল যুবক পিতা আর লাবণ্যময়ী যুবতী মাতা বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়েছে। মাথার চুলগুলোয় রূপালী শুভ্রতার নির্মম ছোঁয়া, দেহে লাবণ্যের স্থলে কুচকানো চামড়ায় নিষ্ঠুর বার্ধক্যের রেখা সুস্পষ্ট। তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি নেই, চোখ দুটো কোঠরাগত, ক্ষীণ দৃষ্টি, পা দুটোয় চলার শক্তি নেই, হাত দুটোও দুর্বলতার কারণে থির থির করে কাঁপে। এই পিতামাতার সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়েই সে আজ পূর্ণ এক যুবক। একদিন ছিলো সে অসহায় আর এই পিতামাতাই ছিলো তার একমাত্র মমতার আশ্রয়স্থল। এই পিতামাতাও তো এক দিন তার মতো ছিলো এবং তাকেও একদিন এমনই হতে হবে। সন্তানকে এসব কথা স্মরণ করতে হবে এবং গভীর মমতায় পিতামাতার সেবা-যত্ন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আনকাবুত-এর ৮ নং আয়াতে বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا–

আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি।

সর্বপ্রথমে আল্লাহর হক কেনো আদায় করতে হবে

সূরা লুকমানে সন্তান গর্ভে ধারণ, গর্ভকালীন কষ্ট, প্রসব যন্ত্রণা, প্রতিপালনের কষ্ট এবং নিজের দেহের রক্তে প্রস্তুত দুধ পান করানোর বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়ার পরেই পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থাৎ তাদের হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, সন্তানের ব্যাপারে কষ্টের বর্ণনা দেয়া হলো মায়ের, সুতরাং প্রথমে গর্ভধারিণী মায়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ না দিয়ে প্রথমে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ কেনো দেয়া হলো?

এর কারণ হলো, মা ইচ্ছে করলেই সন্তান গর্ভে ধারণ, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গর্ভাধারে বয়ে বেড়ানো, প্রসব করা, দুধ পান করানো ও প্রতিপালন করতে পারতেন না। যে নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করে মাতৃত্ব অর্জন করলো, আল্লাহ তা'য়ালা ইচ্ছে করলে সেই নারীকে বন্ধ্যা করতে পারতেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ–يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ–يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ–اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ–اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا–وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا–

www.pathagar.com

যমীন ও আকাশের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ– তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। (সূরা আশ্ শূরা-৪৯-৫০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির চির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কার্যকর করেছেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছাকাছি এলেই স্ত্রী গর্ভে সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকবে, বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তা'য়ালা এক জটিল ও অকল্পনীয় পদ্ধতির মাধ্যমে মাতৃগর্ভে মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন। পুরুষের সহযোগিতা ব্যতীত স্ত্রী গর্ভে সন্তান জন্ম লাভ করতে পারে না। পুরুষের দেহ অভ্যন্তরের নিম্ন অংশ থেকে নির্গত বিশেষ এক পদার্থ যে ক্যানালে জমা হয় এই ক্যানালকে এপিডিডাইমিস বলে। এরপর তা স্পারম্যাটিক কর্ডের মাধ্যমে ইউরেথ্রা-এর ওপর অংশে চলে যায় এবং সেমিন্যাল ভেসিকেল, প্রোসটেট এবং কুপারস গ্রন্থির নিঃসৃত রস স্পারমের সাথে যোগ দেয়। যে স্পার্ম থেকে সন্তান জন্ম নেবে, সেগুলোকে সিমেন নামক রস সতেজ-সুস্থ রাখে। পুরুষের দেহে আল্লাহ তা'য়ালা যদি এই সিমেন রস না দিতেন, তাহলে সেই পুরুষের সান্নিধ্যে এসেও নারীর পক্ষে গর্ভ ধারণ করা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ এই পুরুষও হতো বন্ধ্যা পুরুষ– সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, স্ত্রী-পুরুষের প্রত্যেক মিলনে শত-সহস্র মিলিয়ন শুক্রবিন্দু বিশেষ সময়ে দুটো শুক্র স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে লেগে সন্তান উৎপাদন ক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌছার পূর্বেই পথে অগণিত শুক্রকীট মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি নারীর গর্ভাশয়ে পৌছানোর পথে এদের মৃত্যু না দিতেন, তাহলে নারীর গর্ভে একত্রে মিলিয়ন মিলিয়ন সন্তান জন্ম নিতো। অবস্থা যদি এই হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোনো নারী কি জীবিত থাকতো? সাবালিকা নারীর প্রত্যেক মাসে একটি মাত্র ডিম্বাণু পরিপক্কতা লাভ করে এবং কোনো নারীর সারা জীবনে চারশত ডিম্বাণুর অধিক পরিপক্কতা লাভ করে না। এসব ডিম্বাণু আল্লাহ তা'য়ালা যদি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম করে দিতেন, তাহলে নারীর পক্ষে গর্ভধারণ করা সম্ভব হতো না।

মাতৃগর্ভে কোন্ জটিল প্রক্রিয়ায় সন্তান পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ধারণ করে, তা আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের ১৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই জটিল প্রক্রিয়ার কোনো একটি স্তরে আল্লাহ তা'য়ালা যদি সামান্যতম পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতেন, তাহলে নারীর পক্ষে গর্ভধারণ করা সম্ভব হবে না। ভ্রূণ গর্ভাশয়ে আশ্রয় নেয়ার সময় গর্ভাশয়ের যে ওজন থাকে, তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গর্ভকালীন সময়ে ওজন মাত্রারিক্ত বৃদ্ধি পেলে

www.pathagar.com

তা ফেটে গিয়ে গর্ভের সন্তানের মৃত্যু ঘটতে পারে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যেসব জটিল পর্যায় অতিক্রম করে, সেখানে পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন এলে মা ও সন্তান উভয়েই মৃত্যুবরণ করতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা যদি মায়ের গর্ভাধার দুর্বল করে দিতেন, তাহলেও নারীর পক্ষে মাতৃত্ব অর্জন করা সম্ভব হতো না। ভ্রুণ গর্ভে আশ্রয় নেয়া থেকে শুরু করে মানব সন্তান আকারে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করেন বিধায় নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান জন্ম দিতে পারে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে শিশুর এমন অবস্থা থাকে যে, তার পক্ষে পৃথিবীর কোনো খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে জন্মদাত্রী মায়ের বক্ষে এমন খাদ্য সন্তানের জন্য অনেক পূর্বেই মওজুদ করে রেখেছেন, সেই খাদ্য এবং এর পুষ্টিগত উপাদান পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সেই খাদ্য এমন গরম বা ঠান্ডা নয়, যা সন্তানের অসুবিধা ঘটাবে। অথবা এমন বিস্বাদ নয় যে, সন্তান খেয়ে তৃপ্তি পাবে না বা খাবে না।

অর্থাৎ মানব সন্তান পৃথিবীতে আসার ও প্রতিপালনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ভূমিকাই প্রধান, ঠিক এই কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা মানব সন্তানকে সূরা লূকমানের ১৪ নম্বর আয়াতে আদেশ দিয়েছেন, সর্বপ্রথম মায়ের নয়– সর্বপ্রথমে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অর্থাৎ আমার সাথে কাউকে শরীক করো না, তোমার ওপরে আমার যে হক বা অধিকার রয়েছে, এটা আদায় করো এবং সেই সাথে পিতামাতার অধিকার আদায় করো।

সূরা লূকমানের এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'দুই বছরে উপনীত হয়ে সে দুধ পান করা ছেড়েছে।' গবেষক ও পন্ডিতগণ আল্লাহ তা'য়ালার এ কথার অর্থ করেছেন, মা তার শিশুকে দুই বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবেন এবং এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো শিশু যদি সেই নারীর দুধ পান করে তাহলে সে শিশুর জন্যে ঐ নারী দুধ মা হয়ে যাবে, ঐ নারীর সন্তান-সন্ততি দুধ পানকারী শিশুর দুধ ভাই-বোন হয়ে যাবে এবং তাদের সাথে তার বিয়েও হারাম হয়ে যাবে। দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে কেউ যদি ঐ নারীর দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে আড়াই বছর পর্যন্ত দুধ পানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যদি দুই বছর বা এর থেকে কম সময়েও শিশুকে মায়ের দুধ পান থেকে বিরত করা যায় বা শিশু পান না করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে, তাহলে সেই নারীর দুধ অন্য কোনো শিশু পান করলেও সে

www.pathagar.com

তার দুধ মা হবে না। শিশু মায়ের দুধও পান করে এবং অন্যান্য খাদ্যও গ্রহণ করে, এই অবস্থায় অন্য শিশু যদি সেই নারীর দুধ পান করে তাহলে সে তার দুধ মা হয়ে যাবে।

শিশুকে পূর্ণ দুই বছরই দুধ পান করাতে হবে বিষয়টি এমন নয়। কোনো কারণ বশতঃ শিশু স্বয়ং দুই বছরের পূর্বেই দুধ পান ছেড়ে দিতে পারে। অথবা শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যগত কারণেও চিকিৎসকের নির্দেশে দুধ পান নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বন্ধ করা যেতে পারে। সন্তান কত দিন বা মাস পর্যন্ত গর্ভে থাকে– এ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত হলো, ৪০ সপ্তাহ বা ২৮০ দিন। যেদিন ভ্রূণ মায়ের গর্ভাধারে প্রবেশ করে, সেদিন থেকে মোট ৪০ সপ্তাহ বা ২৮০ বা ৩০ দিনে মাস ধরা হলে ৯ মাস ১০ দিনে ভ্রূণ পূর্ণ মানব শিশুর আকৃতি ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু সকল নারীর ক্ষেত্রে এই অভিমত প্রযোজ্য নয়। ভ্রূণের দুর্বলতার কারণে, মায়ের কোনো দুর্বলতার কারণে অথবা ভিন্ন কোনো কারণে ভ্রূণ পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকৃতি ধারণ করার পূর্বেও ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি-মজ্জা, মাথার চুল, দেহের পশম সৃষ্টি হয় না অথবা দৃষ্টিও মেলতে পারে না। হাসপাতালে এসব শিশুকে সাধারণত ব্রুডারে রেখে শিশুকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়।

অর্থাৎ মানব শিশু ৬ মাস থেকে শুরু করে ৯ মাস ১০ দিন বা ২৮০ দিনের পূর্বেও যে কোনো সময় ভূমিষ্ঠ হতে পারে। আধুনিক মেডিকেল সাইন্স একটি ভ্রূণ মায়ের গর্ভে পরিপূর্ণ মানব আকৃতি ধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ধরেছে ২৮ সপ্তাহ বা ১৯৬ দিন যা সাড়ে ৬ মাসের কিছু বেশী। এ সময়ের মধ্যে পরিপুষ্ট শিশুও জন্মগ্রহণ করতে পারে। সূরা আহ্কাফ-এর ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَحَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا–

তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে। (সূরা আহ্কাফ)

এ কারণেই নারী-পুরুষের বিয়ের দিন থেকে ৬ মাস পূর্ণ হবার পর স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে, সেই সন্তানের পিতা হিসেবে ঐ ব্যক্তিকেই সাব্যস্ত করা হবে, যে পুরুষের সাথে ঐ নারীর বিয়ে হয়েছিলো। ইসলামের সোনালী যুগে এ ধরনের একটি ঘটনার জন্ম হয়েছিলো। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর ও আহকামুল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলের ঘটনা। একজন পুরুষ লোক জুহায়না গোত্রের একটি মেয়েকে বিয়ে করার ৬ মাস পূর্ণ হবার পর তার স্ত্রী পরিপূর্ণ দেহধারী একটি সুস্থ মানব শিশু প্রসব করে। পুরুষ লোকটি হযরত উসমানকে বিষয়টি জানায়। তিনি ঘটনা শুনে ধারণা করলেন,

www.pathagar.com

মেয়েটি বিয়ের পূর্বেই গর্ভধারণ করেছে, সুতরাং সে ব্যভিচারিণী এবং তাকে ব্যভিচারের শাস্তি পেতে হবে। সেভাবেই তিনি রায় ঘোষণা করলেন। বিষয়টি হযরত আলী ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম শোনার পরে খলীফার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি এটা কেমন ধরনের রায় ঘোষণা করলেন?

খলীফা জানালেন, বিয়ের মাত্র ৬ মাস পরেই ঐ নারী পরিপূর্ণ সুস্থ মানব শিশু প্রসব করেছে, এটা কি তার ব্যভিচারিণী হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ নয়? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জানালেন–না, এটা ঐ নারীর ব্যভিচারিণী হওয়ার প্রমাণ নয়।

এরপর তিনি পবিত্র কোরআন থেকে সূরা বাকারার ২৩৩ নম্বর আয়াত, সূরা লূকমানের ১৪ নম্বর আয়াত ও সূরা আহ্কাফের ১৫ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, 'মহান আল্লাহর বলা এসব কথা থেকে জানা যায় যে, গর্ভধারণের সবথেকে কম সময় হলো ৬ মাস এবং বিয়ের পরে কোনো নারী ৬ মাস পূর্ণ হবার পর সন্তান প্রসব করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সে নারীকে ব্যভিচারিণী বলা যাবে না এবং যে পুরুষের সাথে তার বিয়ে হয়েছে, সেই পুরুষই হবে উক্ত সন্তানের পিতা।'

হযরত আলীর বক্তব্য শুনে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর রায় পরিবর্তন করে বলেছিলেন– বিষয়টি নিয়ে আমি এভাবে ভেবে দেখিনি।

পক্ষান্তরে গর্ভে সন্তান রয়েছে, এ কথা জেনে বুঝে কেউ যদি কোনো নারীকে বিয়ে করে এবং বিয়ের ৬ মাস পরে বা তার কম সময়ে অথবা বেশী সময় পর সন্তান প্রসব করে, তাহলে সে সন্তান অবশ্যই অবৈধ সন্তান হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর বিষয়টি যদি কারো জানা না থাকে, তাহলে বিয়ের পরে ৬ মাস পূর্ণ হলে কোনো স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করে তাহলে সে সন্তান ঐ ব্যক্তির পরিচয়েই পরিচিতি লাভ করবে, যার সাথে উক্ত নারীর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে, এ অবস্থায় অনেক নারীই সন্তান প্রসব করতে পারে আর এ কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটানো বা সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা জঘন্যতম অপরাধ। প্রকৃত সত্য না জেনে শুধু মাত্র অনুমানের ভিত্তিতে কারো প্রতি কোনো অপবাদ আরোপ করা যাবে না।

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হোক বা তার কম সময়েই হোক, সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা একমাত্র ভুক্তভোগী মা ব্যতীত আর কেউ অনুভব করতে পারে না। পিতামাতা নিজ সন্তানের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করে, এই কষ্টের মূল্য কোনো সন্তানই কখনো দিতে পারে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা সেই পিতামাতার হক আদায়ের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا–

আমি মানুষকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছি যে, তারা যেনো পিতামাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিলো এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে। (সূরা আল আহ্কাফ-১৫)

হযরত আবু বকর বায্যার (রাহঃ) তাঁর মাসনাদে বায্যার-এ উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার সময় তাঁর বৃদ্ধা মা'কে নিজের কাঁধে উঠিয়ে তাওয়াফ করছিলো। তাঁকে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, তুমি কি তোমার মায়ের অধিকার বুঝিয়ে দিতে পেরেছো? ঐ ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মায়ের বিন্দুমাত্র অধিকারও আদায় করতে পারিনি। এমনকি আমার মায়ের যন্ত্রণা-কাতর নিশ্বাস গ্রহণের হকও আদায় করতে পারিনি। আমার মা আমাকে গর্ভে বহন করার সময় যে কষ্ট পেয়েছেন, প্রসবের সময় যে কষ্ট অনুভব করেছেন, আমি তার কণা মাত্রও আদায় করতে পারিনি।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, ইয়েমেনের একজন লোক তাঁর মা'কে নিজের পিঠে বসিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। বিষয়টি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন। মা'কে নিজের পিঠে করে তাওয়াফকারী লোকটি ইবনে ওমরের কাছে জানতে চাইলেন– আচ্ছা বলুন তো, আমি আমার মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, মায়ের হক আদায়! তুমি যখন গর্ভে ছিলে, সে সময় তোমার মা যন্ত্রণা কাতর যে আহ্ শব্দ করেছে, সেই একটি শব্দের হকও আদায় করতে পারোনি।

গর্ভধারিণী মাতার অধিকার

পিতা ও মাতা এ উভয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সন্তান প্রেরণ করেন। পিতা ব্যতীত যেমন সন্তানের কল্পনা করা যায় না তেমনি মাতা ব্যতীতও সন্তানের আশা করা যায় না, এ জন্যই ইসলাম মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। কারণ সন্তানের জন্যে মা যে কষ্ট স্বীকার করে-এমন কষ্টের কোটি ভাগের এক ভাগও পিতাকে সহ্য করতে হয় না।

www.pathagar.com

সন্তান পেটে ধারণ করা, বয়ে বেড়ানো এবং প্রসব করা যে কি কষ্টের ব্যাপার সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মায়ের এসমস্ত কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ইসলাম বোধহয় পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে পিতামাতা সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়– সন্তানের জন্য মা যে ত্যাগ-তীতিক্ষা ও কষ্ট স্বীকার করে এ কষ্টের বিনিময় দেয়া সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। একবার এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো-হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেজাজের মানুষ। নবীজী বললেন, তোমার মা যখন তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, অব্যাহতভাবে যন্ত্রণা সহ্য করেছে, তখনতো সে খারাপ মেজাজের ছিল না। সেই ব্যক্তি বললো, আমি সত্য বলছি তাঁর মেজাজ খুবই কঠোর।

আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমারই জন্য সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং নিজের দুধ পান করাতো, সে সময়তো তার কঠিন মেজাজ ছিল না। সেই ব্যক্তি বললো, আমি আমার মায়ের সেই সব কাজের প্রতিদান দিয়েছি।

নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিতে পেরেছো? সে বললো, আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে হজ্জ্ব করিয়েছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিয়ে বললেন, তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের প্রতিদান দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় সে স্বীকার করেছে?

প্রসব যন্ত্রণা যে কি ধরণের যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগী মা ব্যতীত আর কেউ বলতে পারবে না। যন্ত্রণার এক একটি আঘাত যখন আসে মা তখন মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে যান। মা! একটি মাত্র শব্দ অথচ সারা পৃথিবীর সবটুকু মধু যেনো এই শব্দটির মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন। মা সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার সময় মৃত্যুকে কবুল করলেন। এরপর যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিকের মতো মা রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। সেই মায়ের অধিকার সন্তানের কাছে বেশী তো হবেই।

মা তার নিজের শরীরের রক্ত পানি করেন সন্তানের জন্য। সেই সন্তানের তো প্রথম দায়িত্ব মায়ের প্রয়োজন পূরণ করা। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনকালে খেজুরের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। একদিন অনেকে দেখলো যে হযরত উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খেজুরের গাছ কেটে মাথি বের করছেন। এতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ অভাবের বাজারে আপনি এভাবে খেজুরের গাছটি নষ্ট করছেন। বর্তমানে

www.pathagar.com

খেজুরের গাছ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি বলবো। আমার মা খেজুরের মাথি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মায়ের ইচ্ছা কি কখনো অবজ্ঞা করা যায়?

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক লোক বললো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার খেদমত ও সদ্ব্যবহার পাবার সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার ও যোগ্যতম ব্যক্তি কে? আল্লাহর রাসূল বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় বললো, তারপর? তিনি বললেন, তোমার মা। তারপর তোমার পিতা, তারপর যথাক্রমে তোমার নিকটতম আত্মীয়।

মা সন্তান পেটে ধারণ করেন, অকল্পনীয় প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেন এবং সন্তানকে বুকের দুধ পান করান। এর কোনোটিই পিতার পক্ষে সম্ভব নয়–বিধায় ইসলাম পিতার তুলনায় মাতার অধিকার তিন গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাবার সংকল্প করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললেন, জি হ্যাঁ আছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি তাঁকে আঁকড়িয়ে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের নিকট তোমার জান্নাত। (নাসায়ী)

হযরত জাহিমার পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। নবীজী তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের নীচেই তোমার জান্নাত। (নাছায়ী)

মায়ের মর্যাদার কারণে মায়ের বোন খালার মর্যাদাও মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মা জীবিত না থাকলে খালার খেদমত করতে হবে। হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একজন মানুষ নবীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বড় গোনাহ করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তওবার পথ কি খোলা আছে? নবীজী বললেন, তোমার

www.pathagar.com

মা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি বললো, আমার মা জীবিত নেই। আল্লাহর রাসূল বললেন, আচ্ছা তোমার খালা কি জীবিত আছেন? সে বললো-জ্বী, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, খালার সাথে সুন্দর আচরণ করো। (তিরমিযী)

পৃথিবীতে এমন কোনো আমল নেই, যে আমল করলে অত্যন্ত দ্রুত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কিন্তু মা! একমাত্র মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার এবং প্রাণভরে তার খেদমত করলেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি একস্থানে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অপর এক ব্যক্তি তার কাছে পয়গাম প্রেরণ করলে সে তা গ্রহণ করে। এটা মর্যাদা হানিকর ব্যাপার মনে করে এবং আবেগ তাড়িত হয়ে আমি সেই মেয়েকে হত্যা করি। আপনি বলুন, এখনো কি আমার জন্য তওবার কোনো পথ আছে? তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তোমার মা কি জীবিত আছেন! সে বললো, মা তো ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বললেন- যাও, খালেস অন্তরে তওবা করো এবং এমন কাজ করো যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো।

হযরত যায়েদ বিন আসলাম হযরত আবদুল্লাহর কাছে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি সেই ব্যক্তির কাছে তার মা জীবিত আছে কি না এ কথা কেন জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণের চেয়ে বড় আমল আমার জানা নেই।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে শিরীন (রাহঃ)-কে ফিকাহ ও হাদীসের ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর মা ছিলেন হিজাজের অধিবাসী। তিনি মায়ের সম্মান-মর্যাদা ও ইচ্ছার প্রতি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। যখন মায়ের জন্য কাপড় কিনতেন তখন কাপড়টি নরম কিনা ভালো করে দেখতেন। কাপড় শক্ত হলে মা যদি কষ্ট পায় এই ভয়ে তিনি শঙ্কিত থাকতেন। ঈদের সময় নিজের হাতে মায়ের কাপড় রং করতেন। মায়ের প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন যে, কখনো মায়ের সামনে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। মায়ের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন যেনো কোনো গোপন কথা বলছেন।

www.pathagar.com

মায়ের নেক দোয়া ও অসন্তুষ্টি

মায়ের দোয়ার বরকতে মানুষের সম্মান-মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালা কিভাবে বৃদ্ধি করে দেন, ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ) বয়সে তখন কিশোর। মায়ের পাশেই বিছানায় শুয়ে আছেন। আধো ঘুমের মধ্যেই মা অস্ফুটে বললেন, বাবা বায়েজীদ, আমি পানি পান করবো! কিশোর বালক বায়েজীদের কানে মায়ের কথা পৌঁছা মাত্র শয্যা ছেড়ে উঠে পানির পাত্রের কাছে গেলেন। পাত্রে পানি নেই-শূন্য পাত্র। বালক বায়েজীদ মা'কে সে কথা না জানিয়ে পাত্র হাতে বেরিয়ে পড়লেন পানির সন্ধানে।

গভীর রাত, চারদিকে সুনসান নরীবতা। সবাই গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন। পথে জনমানবের চিহ্ন নেই। চারদিকেই রাতের নিকষ কালো জমাট বাঁধা অন্ধকার থমথম করছে। বালক বায়েজীদ অন্ধকার ভেদ করে মায়ের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির সন্ধানে চলেছেন। রাতের অন্ধকার বায়েজীদের মনে একাকীত্বের কোনো ভয় জাগাতে পারেনি। কারণ তার মনে একটিই চিন্তা, মায়ের তৃষ্ণা মিটাতে হবে। পাত্রে পানি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন মায়ের শয্যাপাশে। মা পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। বালক বায়েজীদ মায়ের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে শয্যা পাশে পানির পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। মায়ের যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখন মা পানি পান করবে। মাকে ডেকে তার ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেন না কিশোর সন্তান বায়েজীদ।

এভাবে রাত শেষের দিকে পৌঁছে গেলো। কিশোর সন্তান না ঘুমিয়ে পানির পাত্র হাতে মায়ের শয্যা পাশে ঘুমন্ত মায়ের দিকে মমতাভরা দৃষ্টিতে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন-কখন মায়ের ঘুম ভাঙ্গবে আর তিনি পানি পান করবেন। পূর্বাকাশে পূর্বাশার ইশারা দেখা দিলো। ফজরের আজান কানে যেতেই মায়ের ঘুম ভাঙ্গলো। মা নামায আদায়ের জন্য উঠলেন। চোখ পড়লো সন্তানের প্রতি। তার কলিজার টুকরা পানির পাত্র হাতে তারই শয্যা পাশে ঘুমহীন চোখে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের মনে পড়লো, রাতের প্রথম প্রহরে তিনি পানি পান করতে চেয়েছিলেন। তারপর তিনি ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। আর তার কলিজার টুকরা তারই তৃষ্ণা মিটানোর জন্য পানির পাত্র হাতে সারা রাত না ঘুমিয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে! মায়ের অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। ফজরের নামায আদায় করে মা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে আমার আল্লাহ! আমার বায়েজীদকে তুমি সুলতানুল আরেফীন বানিয়ে দিও!

মা দোয়া করলেন তার সন্তান যেনো আওলিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আওলিয়া হয়। ইতিহাস সাক্ষী, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তানের জন্য মায়ের দোয়া কবুল করে

www.pathagar.com

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ)-কে সুলতানুল আরেফীন বানিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ)-এর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মায়ের নেক দোয়ার বরকতে তিনি পৃথিবীতে স্বরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। মায়ের দোয়ার বরকতে মহান আল্লাহ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহঃ) কে নিজের প্রিয় পাত্রে পরিণত করেছেন।

হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। একজন নবীজীকে জানালেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন যুবক মৃত্যুপথযাত্রী। অনেকে ঐ যুবককে কালেমা শাহাদাত পড়ার কথা বলছে। কিন্তু যুবকের মুখ দিয়ে কালেমা বের হচ্ছে না। নবীজী উপস্থিত লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, ঐ যুবক কি নামায আদায় করতো? উপস্থিত লোকজন জানালো, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ যুবক নামায আদায় করতো।

এ কথা জানার পরে আল্লাহর নবী কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ঐ যুবকের কাছে গেলেন। যুবকের তখন মুমূর্ষ অবস্থা। নবীজী তাকে কালেমা পড়তে বললেন। বেশ কষ্টের সাথে যুবক জানালো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুখে কালেমা আসছে না, আমি পারছি না।

আল্লাহর রাসূল এর কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, এই যুবক তার মায়ের সাথে নাফরমানী করতো। তিনি লোকদের কাছে জানতে চাইলেন, এই যুবকের মা কি জীবিত আছে? লোকজন জানালো, তার মা এখন পর্যন্ত জীবিত আছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের মা'কে নিয়ে আসার আদেশ দিলে লোকজন তার মা'কে নিয়ে এলো। তিনি উক্ত যুবকের মা'কে প্রশ্ন করলেন, এই যুবক কি তোমার সন্তান? বৃদ্ধা সম্মতি জানালে তিনি তাকে বললেন, ভয়ঙ্কর আগুনের কুণ্ড বানিয়ে সে আগুনের মধ্যে তোমার সন্তানকে নিক্ষেপ করার পূর্বে যদি তোমাকে বলা হয়, তুমি সুপারিশ করলেই তোমার সন্তান রক্ষা পাবে। এ অবস্থায় তুমি কি সন্তানের জন্য সুপারিশ করবে?

বৃদ্ধা জবাব দিল, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আমি আমার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য সুপারিশ করবো। আল্লাহর নবী বৃদ্ধাকে বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহকে এবং আমাকে সাক্ষী রেখে বলো, তুমি তোমার সন্তানকে ক্ষমা করে দিয়েছো। তুমি তোমার সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট।

বৃদ্ধা বললো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো আমি তোমার রাসূলের উপস্থিতিতে বলছি, আমি আমার সন্তানকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি আমার সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট।

www.pathagar.com

এরপর নবীজী যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন– পড়ো, আশ্‌হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। মৃত্যু পথযাত্রী যুবক নবীজীর সাথে সাথে কালেমা পাঠ করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর শোকর আদায় করে বললেন, ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি এই যুবককে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে হেফাজত করেছেন। (আহমাদ-তিবরানী)

পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদা

পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যার সাথে সম্পর্ক রাখলে মানুষের হায়াত বৃদ্ধি পায়, উপার্জনে বরকত হয়, মানুষ ধনী হতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবলমাত্র পিতামাতা। হযরত আনাছ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের দীর্ঘ হায়াত এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

একজন মুসলমান যতো বেশী হায়াত লাভ করে, সে ততবেশী সওয়াব অর্জনের সুযোগ পায়। মহান আল্লাহ একজন মুসলিমকে সে সুযোগ করে দিয়েছেন তার পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে। হযরত মুয়াজ বিন আনাছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো যে, আল্লাহ তা'য়ালা তার হায়াত বৃদ্ধি করবেন।

পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা, মনমাতানো ব্যবহার করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর এই প্রিয় কাজটি মহান আল্লাহর যে বান্দাহ্ করে, তার ওপরে আল্লাহ কতই না খুশী হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, যে নামায সময় মতো আদায় করা হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, পিতামাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বোখারী)

পিতামাতাও মানুষ, তারাও ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন। তাদের কোনো ভুলের কারণে সন্তান তাদের সাথে অশোভন আচরণ করবে, এই অধিকার সন্তানের নেই। পিতামাতার প্রতি সন্তানকে যে দায়িত্ব পালন করতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর

www.pathagar.com

রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালন করতে হবে। তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন সন্তানকে পূরণ করতে হবে। তারা যদি সন্তানের কোনো অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাহলে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে আন্তরিক পরিবেশে তাদের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ-নিষেধ এবং হিদায়াত মানা অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতা-পিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি পিতামাতা সম্পর্কিত আল্লাহর হুকুম ও হিদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি পিতামাতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। যদি বাড়াবাড়ি করে থাকেন তাহলেও। (তআ'বুল ঈমান)

বর্তমান যুগে একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত ও গোনাহ্ মাফের আশায় মাজারে ধর্ণা দেয়, পীরের দরবারে হাদিয়া-তোহ্ফা দেয়। পীর সাহেবের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা উপার্জন করেছে, সেই টাকা তথাকথিত পীরের পায়ে ঢেলে দেয়। হতভাগা আর কাকে বলে! পৃথিবীর যত বড় আলেম হোক, পীর হোক, তাদের খেদমত করলে জান্নাত লাভ করা যাবে, গোনাহ মাফ হবে, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেনি। এমন দাবীও যদি কেউ করে তাহলে সে নিশ্চয়ই বড় শয়তান। আর মা-বাপের খেদমত করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন, আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে– এ নিশ্চয়তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও সন্তানের জন্যে পিতামাতার দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতা-মাতার বাধ্য এবং অনুগত সন্তান পিতা-মাতার প্রতি ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করলে তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য একটি সহীহ কবুল হজ্জ লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন যদি সে প্রতিদিন ১০০ বার দৃষ্টিপাত করে? আল্লাহর রাসূল বললেন– হাঁ, আল্লাহ তা'য়ালা মহান ও মহাপবিত্র।

www.pathagar.com

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন– এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের প্রতি পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন, তাঁরাই তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, (তিনবার বললেন)। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে এরপর তাদের খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করলো না। (মুসলিম)

হযরত তাইলাহ বিন মিয়াছ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের এক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, একবার আমি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি গোনাহ্ করি, যা আমার দৃষ্টিতে কবিরা গোনাহ্ ছিলো। আমি অত্যন্ত অস্থির হলাম এবং সুযোগ বুঝে তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বলতো কি হয়েছে? যা ঘটেছে আমি তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, এটা তো কবিরা গোনাহ্ নয়। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– কি ভাই, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছা রাখো? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ আমি তা-ই চাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আম্মাজান জীবিত আছেন। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তুমি মাতার সাথে নরম ও সম্মানের সাথে কথা বলো, তাঁর প্রয়োজনের কথা খেয়াল রাখো তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

সুতরাং পীরের দরবারে বা মৃত মানুষের কবর-মাজারে অর্থ বিলিয়ে ক্ষতি ব্যতীত লাভ হবে না, নিজের কষ্টার্জিত টাকা পয়সা পিতামাতার সেবা-যত্নে ব্যয় করতে হবে। প্রাণভরে পিতামাতার খেদমত করতে হবে। এর মধ্যেই সন্তানের সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। পিতামাতার খেদমত করার কারণে পথের ফকির হয়েও সৎ পথে প্রভূত অর্থ বিত্ত, বাড়ী গাড়ীর অধিকারী হয়েছেন এমন ঘটনার অভাব নেই। অন্য কারো দোয়া কবুল হবে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুরীদের জন্য পীর সাহেব দোয়া করলেন। তার সে দোয়া যে কবুল হবেই–এমন নিশ্চয়তা কোনো পীর সাহেবই দিতে পারেন না। কিন্তু সন্তানের জন্যে পিতামাতার দোয়া যে কবুল হবেই হবে, এ নিশ্চয়তা দিয়েছেন আল্লাহর নবী। পৃথিবীতে এমন পীর বা আলেম ছিলেন না এখনো নেই, কিয়ামত পর্যন্তও আসবেন না, যার দিকে একবার মমতাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু পিতামাতা সম্পর্কে নবীজী ঘোষণা করেছেন, যে সুসন্তানই পিতামাতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব দান করেন। পিতামাতার সেবা যত্ন করা, তাদের প্রাণভরে খেদমত করা জিহাদ এবং হিজরাতের মতো অধিক সওয়াবের কাজের চেয়েও বেশী সওয়াবের কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বললো, আল্লাহর শোকর যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর কাছে নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, আল্লাহর কাছে প্রতিদান চাই। নবীজী বললেন, তাহলে পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, একব্যক্তি পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেন, পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো। (আবু দাউদ)

একজন মানুষ প্রাণের তাগিদে মাইলের পর মাইল দূরত্ব অত্যন্ত কষ্টের সাথে পাড়ি দিয়ে এসেছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। মনে আশা ছিল প্রিয় নবীর সান্নিধ্যে থাকবেন, প্রাণভরে ঐ চেহারা দেখবেন, যে চেহারা ঈমানের সাথে একবার দেখলে আল্লাহ খুশী হয়ে যান। মনে বড় আশা, রাসূলের নেতৃত্বে জিহাদ করবেন। কিন্তু নবীজী তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এসবের চেয়ে পিতামাতার খেদমত করলে আল্লাহ বেশী খুশি হবেন। ইয়েমেন থেকে একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে তোমার কি কেউ আছে? সে বললো, আমার পিতামাতা রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বললো, না। এ সময় তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি ফিরে যাও এবং উভয়ের কাছ থেকে অনুমতি নাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে অংশগ্রহণ করো। নতুবা তাঁদের কাছে উপস্থিত থেকে সুন্দর আরচণ করতে থাকো। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

পিতামাতার গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে তাদের বন্ধুদের সম্মান-মর্যাদাও আল্লাহ্ তা'য়ালা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতার অনুপস্থিতির সময় অথবা পিতার মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়জন বা বন্ধুদের প্রতি সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত আছে। (তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতামাতার প্রতি গালি দান বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। লোকজন (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ কি নিজের পিতামাতাকে গালিও দেয়? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ! মানুষ অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয়। তাহলে (ফিরে) তার পিতামাতাকে গালি দিয়ে দেয়। সে অন্যের মা'কে খারাপ নামে স্মরণ করে। তাহলে সে তার মা'কে গাল-মন্দ করে। (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

অন্য কারো পিতামাতা সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য বা তাদের নামের পূর্বে কোনো খারাপ বিশেষণ ব্যবহার করা কোনো ক্রমেই জায়েজ নয়-এটা স্পষ্ট হারাম। সন্তানের কারণে পিতামাতাকে যদি অপদস্ত হতে হয়, অপমানিত হতে হয় এবং তাহলে সে জন্যে দায়ী হবে সন্তান। মহান আল্লাহর দরবারেও ঐ সন্তান অবশ্যই পাকড়াও হবে।

একবার হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দু'জন লোককে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি তোমার কে হন? সে বললো, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি বললেন, দেখ কখনো তাঁর নাম ধরে ডেকো না। কখনো তাঁর আগে চলবে না এবং কোনো মজলিসে তাঁর আগে বসার চেষ্টা করবে না।'

সুতরাং পিতামাতার খেদমত করার গুরুত্ব কতটুকু তা এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো। শ্বশুর-শাশুরী বা স্ত্রীর কথায় যে সন্তান নিজের পিতামাতাকে কষ্ট দেবে, তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আল্লাহ তা'য়ালা এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

www.pathagar.com

সন্তানের অর্থ-সম্পদ ও পিতামাতা

এই পৃথিবীতে মানুষ নানা পথে ধন-সম্পদ উপার্জন করে নিজের পরিবার-পরিজন বিশেষ করে সন্তান-সন্ততির সুখের আশায় এবং তারা কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ সন্তানের সুখ-শান্তি, আরাম আয়েশ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ব্যয় করে থাকেন। এরপর সন্তান পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, সে সম্পদ প্রয়োজনে অবশ্যই পিতামাতার জন্য ব্যয় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ-قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

হে রাসূল! লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে। তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তা করবে পিতামাতার জন্য নিকটাত্মীয়দের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্য। (সূরা বাকারা-২১৫)

এই পৃথিবীতে সন্তান আগমনের একমাত্র মাধ্যম হলো পিতামাতা এবং তারাই অসীম ত্যাগ তীতিক্ষা ও কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। এই সন্তান যখন উপার্জনশীল হয় এবং তারা যে অর্থ-সম্পদের মালিক হন, এর মধ্যে সর্বপ্রথম অধিকার হলো সন্তানের পিতামাতার। তাদের হক আদায় করে তারপর সন্তান অন্যত্র অর্থ ব্যয় করবে। সন্তানের অর্থ-সম্পদে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার করো। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অর্থ-সম্পদ রয়েছে আর সন্তান-সন্ততিও রয়েছে। এই অবস্থায় আমার পিতা এসে আমার কাছে অর্থ-সম্পদ দাবী করছে। এ সম্পর্কে আপনি মতামত দিন। আল্লাহর রাসূল স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন– তুমি এবং তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ এ সব কিছুর অধিকারী তোমার পিতা। (ইবনে মাজাহ্)

এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গবেষক ও চিন্তাবিদগণ বলেছেন, পিতা তার সন্তানের অর্থ সম্পদের অংশীদার এবং সন্তান অনুমতি দিক আর না-ই দিক, পিতা তার সন্তানের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। সন্তানের সম্পদ পিতা নিজের সম্পদের মতোই ব্যবহার করতে পারে। তবে ক্ষতিকর পথে কোনো

www.pathagar.com

অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না এবং অপব্যয়ও করতে পারবে না। সন্তান অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে আরাম-আয়েশে জীবন কাটাবে, আর তারই পিতামাতা অর্থ কষ্টে থাকবেন-ইসলাম এ অধিকার সন্তানকে দেয়নি। সন্তানের সম্পদের প্রথম অধিকারী হলো তার পিতামাতা।

একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এলো এবং নিজের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, ইচ্ছা হলেই তিনি আমার সম্পদ নিয়ে নেন। আল্লাহর রাসূল সেই ব্যক্তির পিতাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। এরপর লাঠির ওপর ভর দিয়ে এক অথর্ব-দুর্বল বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হলো। তিনি বৃদ্ধকে তার সন্তানের অভিযোগ জানালেন।

বৃদ্ধ করুণ কণ্ঠে বলতে থাকলো– হে আল্লাহর রাসূল! এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার সন্তান অসহায় আর দুর্বল ছিলো। তখন আমি ছিলাম শক্তিশালী। প্রচুর অর্থ-বিত্তও আমার ছিলো। আমার সন্তান ছিলো কপর্দকশূন্য। সে ইচ্ছে অনুসারে আমার অর্থ-সম্পদ থেকে ব্যয় করেছে, আমি কখনো বাধা দিইনি। আজ আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমার দেহে উপার্জন করার শক্তি নেই। আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি আর আমার সন্তান সুঠাম দেহের অধিকারী এবং শক্তিমান। সে আজ সম্পদশালী আর আমি কপর্দকশূন্য। সে তার অর্থ-সম্পদ আমাকে দেয় না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধের কথা শুনছেন, তাঁর পবিত্র চোখ থেকে বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি অভিযোগকারী সন্তানকে আদেশ দিয়ে বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার। তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পিতা প্রচুর অর্থ-সম্পদ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার জীবিতকালেও তাদের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিলেন। পিতার ইন্তেকালের পরে অন্যান্য হকদাররা নিজেদের অংশের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তিনি নিজের অংশ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না উঠিয়ে অন্যান্য অংশীদারকে জানিয়ে দিলেন, পিতা কোনো ঋণ রেখে গিয়েছেন কিনা এটা সর্বপ্রথম দেখতে হবে। যদি তিনি ঋণ রেখে যান তাহলে তার ঋণ পরিশোধের পরেই পিতার রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ বন্টন হবে। তিনি ঋণী আছেন কিনা তা জানার জন্য প্রত্যেক হজ্জ মৌসুমে হজ্জে আগত লোকদের সম্মুখে ঘোষণা দিবেন।

এভাবে তিনি পরপর চার বছর হজ্জ মৌসুমে লোকদের সম্মুখে নিজের পিতার ঋণের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন। ঋণের ব্যাপারে কিছু জানা না গেলেও নগদ লাভ যেটা

www.pathagar.com

হলো, তাহলো হচ্ছে আগত লোকজন তাঁর পিতার ইন্তেকাল সংবাদ শুনে মাগফিরাতের দোয়া করলো। এভাবে করে তিনি নিজের পিতার মাগফিরাতের দোয়া আল্লাহর ঘরে আগত মেহমানদের মাধ্যমে করিয়ে নিলেন। পিতামাতা কোথাও কোন ঋণ করে গেছেন কিনা-সন্তানদেরকে এব্যাপারে অবশ্যই পিতামাতার ঘনিষ্ট মহলে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোথাও কোন ঋণ থাকলে তা তারা পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।

পিতামাতার অবাধ্যতা ঘৃণ্য অপরাধ

হযরত আবু বাকারাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তিনটি বড় এবং জঘন্যতম গোনাহ সম্পর্কে কেনো সর্তক করবো না? উপস্থিত আমরা সকলেই বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কেনো নয়, অবশ্যই আপনি তা করবেন। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা এবং পিতামাতার হক আদায় না করা। তিনি হেলান দিয়ে বসা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন, খুব ভালো করে শুনে নাও, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা। তিনি বারবার একই কথা বলতে থাকলেন। আমরা বলতে থাকলাম, আহা! তিনি যদি নীরব হয়ে যেতেন। (বোখারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা শিরক ছাড়া অন্য যাবতীয় গোনাহ্ যতটা ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার শাস্তি তাকে মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীতেই দিয়ে থাকেন, অথবা পিতামাতার জীবদ্দশাতেই তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। (শুয়াবুল ঈমান)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়েমেনবাসীদের জন্য হযরত আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মাধ্যমে একটি স্মরণীয়পত্র প্রেরণ করেছিলেন। সেই পত্রে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে- দেখ, আখিরাতের দিন মহান আল্লাহর কাছে সবথেকে বড় গোনাহ্ হবে (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) অন্যায়ভাবে মু'মিনকে হত্যা করা, (৩) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে পালিয়ে আসা, (৪) পিতামাতার হক আদায় না করা, (৫) সতী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, (৬) জাদু-মন্ত্র শেখা, (৭) সুদ খাওয়া এবং (৮) ইয়াতিমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা।

হযরত মায়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়ত করেছেন, আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবে না। যদি তোমাকে হত্যাও করা হয় এবং আগুনে জ্বালিয়েও দেয়া হয়

www.pathagar.com

এবং কখনো পিতামাতার নাফরমানী করবে না। যদি তারা নিজের সম্পদ এবং পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয় তবুও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, পিতামাতাকে কাঁদানোর অর্থ হলো তাদের নাফরমানী করা এবং এই আচরণ মারাত্মক গোনাহের কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তিনটি গোনাহ্ এমন যে, তার সাথে কোনো নেকী কাজ দেয় না। (অর্থাৎ সমস্ত নেকী ধ্বংস করে দেয়) প্রথম শিরক, দ্বিতীয় পিতামাতার অবাধ্যতা এবং জিহাদ থেকে পালিয়ে আসা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং তিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করি, রামাযানের রোযা পালন করি। এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল বললেন, যে এ কথা বলে শেষ করলো সে আখিরাতের ময়দানে নবী, সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথী হবে (তিনি দু'আঙ্গুল উঠালেন), শর্ত হলো সে যেন পিতামাতার অবাধ্য বা নাফরমান না হয়।

মৃত পিতামাতার অধিকার

সন্তান পিতামাতার হক আদায় করবে এবং হৃদয়-মন ঢেলে দিয়ে তাদের সেবা-যত্ন করবে। সেবা-যত্নের মধ্যে কোনো ত্রুটি হলো কিনা, এ ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করবে। কোনো ত্রুটি চোখে ধরা পড়লে তা দূর করার চেষ্টা করবে। আল্লাহর কাছে সন্তান দোয়া করবে, আল্লাহ এবং তার রাসূল যেভাবে পিতামাতার হক আদায় করতে বলেছেন, সেভাবে সে যেন হক আদায় করতে পারে। পৃথিবী থেকে যখন পিতামাতা বিদায় নিয়ে চলে যাবে, তখনও সন্তান পিতামাতা সম্পর্কে উদাসীন থাকবে না। সন্তান প্রত্যেক নামাযের শেষে অশ্রুধারায় নিজেকে সিক্ত করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এভাবে দোয়া করতে থাকবে–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا–

হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (বনী ইসরাঈল–২৪)

হযরত আবু উসাউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো-হে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল! পিতামাতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নবীজী বললেন, হ্যাঁ। তুমি মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার করবে, তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পুরণ করবে, পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের সম্মান-মর্যাদা দেবে, তাদের প্রতি যত্ন নেবে এবং তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে ও সুন্দর আচরণ করবে, যারা পিতামাতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন। (আ-আদুবুল মাফরুজ)

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন– মৃত্যুর পর যখন মৃত ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে– এটা কেমন করে হলো? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তোমার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বস্তু এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয় তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয় সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

হযরত ইবনে শিরীন (রাহঃ) বলেছেন, একরাতে আমরা হযরত আবু হুরায়রার খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে ক্ষমা করো, আমার মা'কে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে ক্ষমা করো, যারা আমার ও আমার মাতার ক্ষমার জন্য দোয়া করে। হযরত ইবনে শিরীন বলেন, আমরা আবু হুরায়রাহ্ এবং তাঁর মাতার পক্ষে ক্ষমার দোয়া করতে থাকি যাতে আমরা আবু হুরায়রার দোয়ায় সামিল থাকি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু সাদকা করি তাহলে কি তাঁর কোনো উপকারে আসবে? আল্লাহর নবী বললেন, অবশ্যই উপকারে আসবে।

হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হযরত আসয়াদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন– হে আল্লাহর রাসূল!

www.pathagar.com

আমার মাতা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি? নবীজী বললেন, কেনো নয়। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

হযরত আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো এমনকি জীবিত থাকার আর আশা রইলো না। সে সময় হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁর সেবার জন্য উপস্থিত হলেন। হযরত আবু দারদা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে কি করে এলে? ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, শুধু আপনার সেবার জন্যই আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। কেননা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আপনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একবার সফরে ছিলেন। এ সময় মক্কার এক গ্রামবাসীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। গ্রামের লোকটি হযরত ইবনে ওমরকে খুব ভালোভাবে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি হযরত ওমরের পুত্র? হযরত ইবনে ওমর জবাব দিলেন-জী হ্যাঁ। আমি তাঁরই পুত্র। এ সময় তিনি নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে তাঁকে দিলেন এবং নিজের বাহনের উপর সম্মানের সাথে বসালেন। হযরত ইবনে দিনার বললেন, আমরা সবাই বিস্ময়ের সাথে এসব দেখতে লাগলাম এবং পরে ইবনে উমরকে বললাম- সে তো একজন গ্রামবাসী। আপনি যদি দু' দেরহাম দিয়ে দিতেন সেটাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, তাই তাঁর পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং নবীজী বলেছেন, পিতার বন্ধুদেরকে সম্মান করো এবং এই সম্পর্ক নিঃশেষ হতে দিও না। যদি করো, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আলো নির্বাপিত করে দেবেন।

হযরত আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি যখন মদিনায় এলাম তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আবু বুরদাহ! তোমার কাছে কেনো এসেছি তা কি তুমি জানো? আবু বুরদাহ বললেন, আমি তো তা জানি না। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কবরে অবস্থিত নিজের পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করতে চায় তার উচিত পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। এরপর তিনি বললেন, ভাই! আমার পিতা হযরত ওমর এবং আপনার পিতার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি সেই বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক তাঁর হক আদায় করতে চাই।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজীবন পিতামাতার নাফরমানী করে এবং তার পিতামাতা অথবা তাঁদের উভয়ের কেউ ইন্তিকাল করেন তাহলে তার উচিত অব্যাহতভাবে পিতামাতার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া। ফলে আল্লাহ নিজের রহমতে তাকে নেক লোকদের মধ্যে লিখে দেন।

হযরত আবু উসাইদ সা'ঈদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম, এমন সময় সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মত আমার পক্ষে করণীয় কিছু আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে, তাঁদের জন্য দোয়া করতে থাকা, তাঁদের অসীয়ত পালন করা ও তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করতে থাকা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পিতামাতার অবাধ্য থাকা অবস্থায় যদি কারও পিতামাতার মৃত্যু ঘটে এবং সেই ব্যক্তি সর্বদা তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে পিতামাতার বাধ্য অনুগত সন্তানের অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। (শুআ'বুল ঈমান)

পিতামাতা জীবিত থাকতে যেসব সন্তান তাদের সাথে বেয়াদবী করেছে, তাদের হক আদায় করেনি, তাদের সাথে নাফরমানী করেছে, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পায়নি, তাদেরকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। পিতামাতার জন্য চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সাধ্যানুযায়ী পিতামাতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য দান-সাদকা করতে হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেবেন।

তিরমিযীর একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি এসে আল্লাহর রাসূলকে জানালো, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-সদকা করি তাহলে আমার মরহুম পিতা কি উপকৃত হবেন? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ, উপকৃত হবে। তখন ঐ ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার একটি বাগান আছে। আমি উক্ত বাগান আমার পিতামাতার পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে সাদকা করে দিলাম।

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন লোক আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মৃত পিতামাতার মাগ্‌ফিরাতের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম তাঁকে জানালেন, তুমি তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁরা যে ওসিয়ত করে গিয়েছেন, তা আদায় করো এবং পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত-ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলো।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেমন সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে, মৃত ব্যক্তিও সাহায্যের আশায় উদগ্রীব থাকে। তারা কবরে তথা আলমে বারযাখে প্রতীক্ষা করতে থাকে, কেউ তার জন্য সাহায্য প্রেরণ করে কিনা। যখন কেউ কিছু তাদের জন্য পাঠায়, তখন তারা এমন খুশী হয় যে, গোটা পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও যদি তাদের হস্তগত হতো, তবুও তারা এত খুশী হতো না।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনায় মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া, রাস্তা-পথ, পানির ব্যবস্থা করা, কোরআন, কোরআনের তাফসীর, হাদীস বা অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য কোথাও দান করা, অথবা যে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেয়া উচিত। এসব থেকে যতদিন মানুষ উপকৃত হতে থাকবে, ততদিন মৃত ব্যক্তি কবরে সওয়াব লাভ করতে থাকবে। এ ছাড়া নফল নামায-রোজা, হজ্জ, কোরবানী, দান-সদকা, কোরআন তিলাওয়াত করে এর সওয়াব রিসানী করা উচিত। এসব কাজ অন্যকে দিয়ে না করিয়ে নিজেই করা উচিত। কাউকে টাকা-পয়সা দিয়ে ভাড়া করে এনে কোরআন খতম দেয়া উচিত নয়। মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য নিজেই আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত।

ইসলাম বিরোধী পিতামাতার অধিকার

সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীতে চিরন্তন। একদল মানুষ ধন-সম্পদ ও প্রাণ কোরবানী দিয়ে হলেও মহাসত্য ইসলামী জীবনাদর্শের গর্বিত পতাকা উড্ডীন রাখার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আরেকদল মানুষ মহাসত্যের এ পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরাম। একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা মহাসত্য অনুধাবন না করার কারণে অথবা পিতৃ-পুরুষের নিয়ম, প্রথা ও আদর্শ আঁকড়ে থাকার কারণে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা ইসলামী আদর্শ নিজেরাও গ্রহণ করেনি, অন্যকেও গ্রহণ করার পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সাথে বিরোধিতা করে আসছে। ইতিহাসে দেখা যায়, পিতামাতা ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করেছে কিন্তু সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করেনি। আবার সন্তান-সন্ততি মহাসত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, পিতামাত সাড়া দেননি।

ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায়, পিতামাতা ইসলামী আদর্শ নিজেরা অনুসরণ করেন এবং এই আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন।

www.pathagar.com

অপরদিকে সেই পিতামাতার সন্তানই ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে চেষ্টা করছে তথাকথিত পশ্চিমা ভোগবাদী গণতন্ত্র বা পুঁজিবাদ অথবা নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। আবার হয়ত সন্তান সংগ্রাম করছে-আন্দোলন করছে পৃথিবীতে ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসানোর জন্য বা পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী মতবাদ হিসেবে কায়েম করার জন্য। কিন্তু পিতামাতা এর বিপরীত পথেই অগ্রসর হচ্ছেন।

সন্তান অথবা তাদের পিতামাতা নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবীও করেন, হয়ত নামায-রোযা ও হজ্জও আদায় করেন কিন্তু তারা ইসলামী আন্দোলন পছন্দ করেন না। ইসলামের বিপরীত আদর্শে পরিচালিত অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো দলকে পছন্দ করেন। তাহলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যে সন্তান, সে সন্তান এই ধরনের পিতামাতার সাথে কেমন আচরণ করবে। অথবা সন্তান ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়েছে, পিতামাতা অমুসলিমই রয়ে গেছে, এ অবস্থায় পিতামাতার সাথেই বা মুসলিম সন্তান কেমন আচরণ করবে।

বর্তমান পৃথিবীতে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে করে মুসলিম নামে পরিচিত পরিবারেও এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সারা পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নিয়ম-প্রথাই মানুষের ওপরে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। মুসলিম বিশ্বও এর ব্যতিক্রম নয় এবং মুসলিম দেশসমূহেও সরকারী পর্যায়ে ইসলামী আদর্শের মূলভাবধারা মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার কোনো উদ্যোগ নেই। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে যে স্বভাব-প্রকৃতির মুসলমান গড়ে ছিলেন, সেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোথাও বাস্তবায়ন নেই। ফলে ইসলামের নামে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঐ স্বভাব-প্রকৃতির মুসলিম বের হচ্ছে না, যেমনটি গড়ে ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এই কারণেই মুসলিম পরিবারের পিতামাতা হয়ত নিজের উদ্যোগে অথবা কোরআনের অনুসারী প্রকৃত ইসলামী সংগঠনের স্পর্শে এসে কোরআন বুঝার চেষ্টা করে নিজেকে সেই কোরআনের বিধান অনুসারে গড়ার চেষ্টা করছেন এবং কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান বা প্রচলিত রাজনৈতিক আদর্শে প্রভাবিত সন্তান পিতামাতার এই উদ্যোগ মেনে নিতে পারছে না।

www.pathagar.com

আবার বিষয়টি ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীতও হচ্ছে। সন্তান এ ধরনের কোনো সংগঠনের স্পর্শে এসে বা ইসলামী কোনো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নিজের উদ্যোগে কোরআন বুঝার চেষ্টা করছে, ইসলামী বিধান পালন করার চেষ্টা করছে এবং সমাজ ও দেশে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করছে। পিতামাতা এই সন্তানের কার্যক্রমের সাথে বিরোধিতা করে যাচ্ছে। এই অবস্থায় দ্বীনি আন্দোলনে নিয়োজিত সন্তান ইসলামের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী পিতামাতার সাথে কেমন ব্যবহার করবে।

এই সমস্যা পৃথিবীতে নতুন নয়। অধিকাংশ নবী-রাসূলকে নিজেদের পরিবারে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের পরিবারের সদস্যরা ইসলামী আদর্শ মেনে নিতে পারেনি। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের পরিবারের কোনো কোনো সদস্যও আল্লাহর দ্বীন কবুল করেনি। ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারী তাঁর সন্তান যখন মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করছিলো, তখন তিনি সেই সন্তানকে নৌকায় আরোহণ করে আত্মরক্ষার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা পছন্দ করেননি এবং কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ–قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ–اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ–فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ–اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ–قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ–وَاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ–

নূহ তাঁর রবকে ডেকে বললো, হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমারই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার অঙ্গিকারও সত্য। আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক। জবাবে বলা হলো, হে নূহ! সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতীক। সুতরাং তুমি সেই ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন করো না, যার মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসিহত করি, নিজেকে জাহিলদের মত বানিও না। নূহ সাথে সাথে আবেদন করলো, হে আমার রব! যে বিষয় আমার জানা নেই, সেই বিষয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করা হতে আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো তা হলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, ৪৫-৪৭)

www.pathagar.com

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও নিজের পিতাকে মহাসত্য গ্রণ করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

يَاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا- يَاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ-اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا-يَاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا-قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ-لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا-

আব্বাজান! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করবো। আব্বাজান! আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না। শয়তান তো রহমানের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার শংকা হচ্ছে যে, আপনি রহমানের আযাবে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন, আর শয়তানের সাথী হয়ে না বসেন। পিতা বললো, ইবরাহীম! তুই কি আমার ইলাহদের থেকে বিমুখ হয়ে গেছিস? তুই যদি বিরত না হস, তাহলে আমি তোকে পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। তুই চিরদিনের জন্য আমার কাছে থেকে দূরে সরে যা। (সূরা মরিয়ম-৪৩-৪৬)

সুতরাং সত্য-মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব শুধু বর্তমানের নয়– সুদূর অতীতের এবং আগামী দিনেরও। পিতামাতা যদি অমুসলিম বা ইসলামী আদর্শের বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী হন, অথবা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী হন তবুও তাদের হক আদায় করতে হবে এবং তাঁদের সাথে সামান্যতম অশোভন আচরণ করা যাবে না।

অমুসলিম পিতামাতা বা ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারী-বিশ্বাসী পিতামাতার সাথে মুসলিম সন্তান অথবা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত সন্তান কেমন ব্যবহার করবে– এই বিষয়টিই সূরা লুকমানের ১৫ নম্বর আয়াতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, '(পিতামাতার অধিকার আদায় করতে গিয়ে মনে রাখবে) যদি তারা তোমাকে এই বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। তবে পৃথিবীর জীবনে তাদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে, আর (নির্দেশ মানার ব্যাপারে) তুমি শুধু তার কথাই মেনে চলবে যে ব্যক্তি আমার দিকে

www.pathagar.com

ফিরে এসেছে (আমার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করছে।) এরপর (পরিশেষে) তোমাদের সকলকে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো (পৃথিবীর জীবনে) তোমরা কেমন কাজ করছিলে।'

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, অমুসলিম পিতামাতা, মুসলিম নামধারী দ্বীনি আন্দোলন অপছন্দকারী পিতামাতা সন্তানকে যদি এমন কোনো আদেশ দেন-যে আদেশ ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বিধানের পরিপন্থী, তাহলে সে আদেশ কোনোক্রমেই পালন করা যাবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করেছেন, 'স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'

পিতামাতা হোক আর যে-ই হোক না কেনো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ দিলে তা পালন করা যাবে না, করলে মারাত্মক গোনাহগার হতে হবে। ইসলামের বিপরীত আদেশ আমান্য করতে যেয়েও পিতামাতার সাথে কঠিন ভাষা বা অশোভন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না। সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মিষ্টি ভাষায় পিতামাতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আপনাদের কথা বা আদেশ মহান ইসলামের বিপরীত। এ আদেশ পালন করলে আমার রব-আমার আল্লাহ, আমার প্রিয় রাসূল অসন্তুষ্ট হবেন। পরিণামে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অমুসলিম পিতামাতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের অধিকার আদায় করতে হবে। মুশরিক পিতামাতার সাথেও তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যেমন মুসলিম মাতাপিতার সাথে রাখতে হয়। পার্থিব বিষয়াদিতে তাঁদের মান-সম্মান ও খিদমতের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সকলভাবে তাঁদের আরাম দিতে হবে। কিন্তু একজন ঈমানদার হিসেবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, মাতাপিতার প্রতি সবচেয়ে বড় শুভাকাংখা এবং সুন্দর আচরণ হলো নিজের চরিত্র, আচরণ, আলাপ-আলোচনা এবং সে া-যত্নের মাধ্যমে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো। তাঁদের হিদায়াতের জন্য মন খুলে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। ইতোপূর্বে আমরা হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি, তিনি তাঁর অমুসলিম মা'কে কিভাবে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

সূরা লুকমানের এই আয়াতে সন্তানকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'তুমি শুধু তার কথাই মেনে চলবে যে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরে এসেছে।' অর্থাৎ যেসব লোক মহাসত্য গ্রহণ করেছে এবং সেই আদর্শ অনুসারে জীবন-যাপন করছে ও অন্যদেরকেও এই

www.pathagar.com

পথে আহ্বান করছে, শুধুমাত্র তাদের কথাই মেনে নিতে হবে। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, 'সর্বপ্রথমে আমি একজন মুসলমান, মহান আল্লাহর গোলাম।' এই পরিচয় সর্বত্র প্রাধান্য দিতে হবে এবং অন্য কারো কথা বা নির্দেশ তখনই অনুসরণ করা যাবে, যে নির্দেশ বা কথা হবে মহান আল্লাহর গোলামীর অধীনে।

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মেয়ে হযরত আছমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন, একদিন আমার মা আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে জানালাম, আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম পছন্দ করেন না। আমার মায়ের সাথে আমি কি আপনজন বা আত্মীয়তা সুলভ ব্যবহার করতে পারি? আল্লাহর নবী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন- অবশ্যই, তুমি নিজের মায়ের সাথে আত্মীয়তা সুলভ ব্যবহার করতে পারো। (বোখারী)

হযরত আবু হুরাইরার সাথে তাঁর মায়ের সম্পর্ক ছিলো বড়ই মধুর। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় আল্লাহর নবীর কাছে এলেন। এ সময় সেখানে আরো বেশ কয়েকজন সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। নবীজী তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে কখন এলে? ক্ষুধার্ত কণ্ঠে হযরত আবু হুরাইরা জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রচন্ড ক্ষুধা আমাকে এখানে টেনে এনেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছড়া খেজুর আনালেন এবং উপস্থিত সকলের হাতে দুটো করে দিয়ে বললেন, এই খেজুর দুটো খেয়ে পানি পান করো, এই দুটো খেজুরই আজকে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি খেজুর খেলেন এবং অন্যটি রেখে দিলেন। বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি জানতে চাইলেন, আবু হুরাইরা! খেজুর রেখে দিলে যে!

তিনি লাজনম্র কণ্ঠে জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মায়ের জন্য রেখে দিয়েছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধুর কণ্ঠে বললেন, আবু হুরাইরা! তুমি ওটাও খেয়ে নাও, আমি তোমার মায়ের জন্য আরো দুটো খেজুর দিচ্ছি।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর গর্ভধারিণী মাতা তখন পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ করেননি এমনকি তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতেন। আল্লাহর রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে গর্ভধারিণী মায়ের মন্তব্য তাঁর কলিজায় তীরের মতোই বিদ্ধ হতো। তিনি কখনো

www.pathagar.com

মায়ের সাথে অশোভন আচরণ করতেন না, শুধু নীরবে অশ্রুই বিসর্জন দিতেন আর মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন, তাঁর মায়ের হৃদয়-মনকে যেনো আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের প্রতি অনুগত করে দেন। একদিন তাঁর গর্ভধারিণী মা আল্লাহর রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করলেন। তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বিষন্ন মনে অশ্রু সজল চোখে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে অশ্রু দেখে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন।

তিনি তাঁর মায়ের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলকে জানিয়ে বললেন, আপনি আমার মায়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমার মায়ের মন যেনো হিদায়াতের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে হযরত আবু হুরাইরার মায়ের হিদায়াতের জন্য দোয়া করলেন। হযরত আবু হুরাইরা এই অবস্থায় নিজের বাড়ির দিকে ছুটলেন। দরজার কাছে এসে তিনি মা'কে ডাকলেন। সেদিন মা যে ভাষায় জবাব দিলেন, সেই জবাব শুনেই তিনি অনুভব করলেন, মায়ের কণ্ঠ মমতার সুষমা মন্ডিত– পূর্বের সেই কর্কশতা আর নেই। মায়ের মমতাভরা কণ্ঠে তাওহীদের ছোঁয়া, শিরকের পূতি গন্ধ আর নেই। মা দরজা খুলে দিলেন, মায়ের গোটা অবয়ব তাওহীদের আলোয় উদ্ভাসিত। মুখে অপূর্ব হাসি টেনে বললেন– বাবা আমি গোছল করেছি। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। আমি তাওহীদের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই।'

মুমিনের সম্মুখে একজন মুশরিক আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে অশোভন উক্তি করলে মুমিনের পক্ষে তা সহ্য করা মৃত্যু যন্ত্রণার শামিল। কিন্তু মায়ের সম্মান-মর্যাদার কারণে হযরত আবু হুরাইরা তা সহ্য করে নিজের মুশরিক মায়ের সেবা-যত্ন ও অন্যান্য যাবতীয় হক আদায় করতেন। কখনো মায়ের সাথে উচ্চকণ্ঠে কথা পর্যন্ত বলেননি। নিজের উত্তম আচরণ দিয়ে মায়ের মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছেন। এভাবেই মুসলিম সন্তান অমুসলিম পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করবে এবং তাদের পার্থিব অধিকার আদায় করবে।

বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধের ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে ভোট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ জয়ী হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে নিজের আদর্শের কথা বলে। সুতরাং ভোট ব্যবস্থাও এক ধরনের যুদ্ধ। এই ভোট যুদ্ধ মুসলমানদেরকে সুযোগ এনে দেয় ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করার। যাদের ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে তারা সবাই ভোট যুদ্ধের সৈনিক। যাকে ভোট প্রদান করবেন সেই ব্যক্তি যদি ইসলামপন্থী না হন, তাহলে তাকে ভোট দেয়া পরিষ্কার হারাম। সে ব্যক্তি যে-ই হোক না কেনো, নিজের পিতামাতা, ভাই বা অন্য যে কোনো আত্মীয়-স্বজন, তারা নামাযী, হাজী যাই

www.pathagar.com

হোক, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যদি তারা চেষ্টা-সংগ্রাম না করেন, তাহলে তাদেরকে ভোট দেওয়া জায়েজ হবে না। যদি কেউ দেয় তাহলে তারা গোনাহগার হবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ–وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতা ও ভাইকেও আপন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তোমাদের যে কেউ এই ধরনের লোকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে-ই জালিম হবে। (সূরা তওবা-২৩)

সূরা লুকমানের ১৪ ও ১৫ নম্বর উভয় আয়াতের শেষেই বলা হয়েছে, 'তোমাদের সকলকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।' ১৫ আয়াতে অতিরিক্ত যে কথাটি বলা হয়েছে তাহলো, 'তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো পৃথিবীর জীবনে তোমরা কেমন কাজ করছিলে।'

অর্থাৎ আদর্শগত এই যে বিরোধ, এই বিরোধে তোমাদের মধ্যে কে মহাসত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলে আর কে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে ছিলে, তা সেদিন তোমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তোমরা যারা শিরকে নিমজ্জিত ছিলে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজের হাতে প্রস্তুত মাটির মূর্তি, বৃক্ষ-তরুলতা, পাথর, নদী-সাগর, আকাশের তারকাপুঞ্জ, চন্দ্র-সূর্য ও পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী মানুষকে নিজেদের মা'বুদ মনে করতে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তোমাদের পৃথিবীর জীবনের অবসান ঘটবে এবং আখিরাতের ময়দানে আমার সম্মুখে যখন তোমাদের উপস্থিত করা হবে, তখন দেখতে পাবে মহান আল্লাহর সাথে শিরক করতে যারা নিষেধ করতো, তারাই প্রকৃত সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

তোমরা যারা এক শ্রেণীর পীরকে বা মাজারে শায়িত মৃত লোকদেরকে আশা আকাঙ্খা পূরণকারী মনে করে তাদের কাছে প্রার্থনা জানাতে, আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে যারা পৃথিবীর চিন্তা নায়কদের মন-মস্তিষ্ক প্রসূত আইন-কানুন ও বিধান অনুসরণ করতে, তারাও সেদিন নিজের চোখে দেখতে পাবে, কিভাবে তোমরা শিরকের পংকে নিমজ্জিত ছিলে।

পিতামাতার হক আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আয়াতের শেষে 'তোমাদের সকলকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো পৃথিবীর

www.pathagar.com

জীবনে তোমরা কেমন কাজ করছিলে।' এই কথাটি বলে মানুষকে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান সেদিকে সন্তানের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এ কথাই সন্তানকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পিতামাতার প্রতি জন্মগত প্রবল আকর্ষণ ও রক্ত সম্পর্কের খাতিরেও তাদের কোনো অবৈধ আদেশ পালন করা যাবে না। আল্লাহর আদেশের বিপরীতে তাদের আদেশকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

সেই সাথে পিতামাতা ও সন্তানের মনে সেদিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেদিন সব কিছুর চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। পিতামাতার হক সে যথারীতি আদায় করছে কিনা অথবা তাদের হক আদায় করতে গিয়ে সীমালংঘন করছে কিনা, পিতামাতাও সন্তানকে আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো আদেশ দিচ্ছে কিনা– এই বিষয়টি পিতামাতা ও সন্তান যেনো সবসময় স্মরণে রাখে এ জন্যই বলা হয়েছে, পৃথিবীর জীবন শেষে আমারই কাছে তোমাদেরকে আসতে হবে। অতএব যার যা ভূমিকা তা সীমার মধ্য অবস্থান করেই পালন করো। সীমালংঘন করলে পরিশেষে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং গ্রেফতার হয়ে শাস্তির আবাসস্থল জাহান্নামে যেতে হবে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার

পিতামাতার কাছে সন্তানের সর্বপ্রথম অধিকার হলো, সন্তানকে পিতামাতা নিজেদের জন্য বোঝা এবং আরাম-আয়েশ, সুখ-সম্ভোগের পথে অন্তরায় মনে করবে না। বরং সন্তান যে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া অমূল্য নে'মাত একথা তারা স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এ কথা স্মরণে রাখতে হবে, পৃথিবীতে আম্মু-আব্বু ডাক শোনার সৌভাগ্য সবার হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা অসীম অনুগ্রহ করে সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবেই আসে। সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা পিতামাতাকে অনুধাবন করতে হবে। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সন্তানের অন্যান্য অধিকার যথারীতি আদায় করতে পারবে না।

সন্তানের পিতামাতা যদি সন্তানের মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে তাদের পক্ষে সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করাও সম্ভব নয়। সন্তান পারিবারিক জীবনের আকর্ষণীয় সুগন্ধি। পিতামাতার কর্মের অনুপ্রেরণা হলো সন্তান এবং পৃথিবী ও আখিরাতের কল্যাণের মাধ্যমও তারাই। সুসন্তান পৃথিবী ও আখিরাতে পিতামাতার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তাদের জীবনের সাহায্যকারী। সন্তান পিতামাতার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি ও আদর্শকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। তাদের সুন্দর আশা-আকাংখা বাস্তবায়নে সন্তান হয় সহায়তাকারী।

www.pathagar.com

বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কারণে মানুষের আয়ের উৎস হয়েছে সংকীর্ণ। ফলে শুধু স্বামীর রোজগারে সংসার যথারীতি চলে না। বাধ্য হয়ে স্ত্রীকেও অর্থ উপার্জনে নামতে হয়। ফলে একশ্রেণীর মানুষের হাতে গড়া নিষ্ঠুর সভ্যতা মানুষের মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল করে দিচ্ছে যে, এক বা দুয়ের অধিক সন্তান দারিদ্রতা বয়ে আনবে। সন্তান সুখের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। সুতরাং সন্তানকে পৃথিবীতে আসতে দেয়া যাবে না। সন্তান যাতে গর্ভেই প্রবেশ করতে না পারে, প্রবেশ করলেও গর্ভপাত ঘটানো অথবা গর্ভেই সন্তানকে হত্যার ব্যবস্থা করতে হবে।

অতীতকালে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক ঘৃণ্য ব্যবস্থা না থাকায় সন্তান জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই হত্যা করা হতো। ইসলাম এই জঘন্য পাপ থেকে মানুষকে শুধু বিরতই করেনি, পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের জীবনের মূল্য ও মর্যাদার প্রবল অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে বলতে বলেছেন–

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا–وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ–نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ–

(হে নবী) তাদেরকে বলুন যে, এসো আমি তোমাদেরকে বলি যে, তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ভুর আচরণ করবে। দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। আমিই তোমাদের রিযক দেই তাদেরও দেবো। (সূরা আনআ'ম-১৫১)

অতীতকালে সন্তান হত্যা করা একটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল। ইসলাম সেই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দেয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে বস্তুবাদের পূজারীরা সন্তান হত্যা করে ভিন্ন কৌশলে। প্রাচীন রোমে কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রকাশ্যে সন্তান হত্যা করা হতো। গোটা আরবে সন্তান হত্যার নিষ্ঠুর কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করেছে। ভারতে সেই প্রাচীন কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্তও সন্তানকে হত্যা করার অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা চালু রয়েছে। নানা কারণে সন্তানকে হত্যা করা হতো। বিবেক বর্জিত এক শ্রেণীর নারী পুরুষ সন্তানকে ধর্মের নামে হত্যা করতো। তাদের পূজনীয় দেবদেবী নাকি নররক্ত না পেলে সন্তুষ্ট হতো না। এ কারণে জড়বাদী মূর্খের দল পাষাণ দেব-দেবীর পদতলে নিজের কলিজার টুকরাকে নিষ্ঠুরভাবে বলী দিত। আবার কেউ কেউ পূজনীয় দেব দেবীর উদ্দেশ্যে মানত হিসেবেই সন্তানকে হত্যা করতো।

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে একজন নারী এসে জানালো, আমি মানত করেছিলাম যে, আমার নিজের শিশু সন্তানকে আমি কোরবানী দেবো। তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করে ঐ নারীকে জানালেন– সাবধান! এমন করবে না। মানত করেছিলে এ কারণে কাফফারা দিয়ে দিও।

পৃথিবীতে জড়বাদী মূর্তিপূজক সম্প্রদায় মূর্তির পদপ্রান্তে নরবলী দিয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার আইন প্রণয়ন করে নরবলী বন্ধ করার চেষ্টা করেও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যর্থ হয়েছে। এখনো তারা গোপনে অপরের সন্তান চুরি করে অথবা নিজেদের সন্তানকে মূর্তির সামনে বলী দেয়। এই মুশরিকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ–

এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। (আনয়াম-১৩৭)

সন্তান থাকলে তার পেছনে অর্থ ব্যয় হবে, এ আশঙ্কায় বর্তমানে অনেকেই সন্তানকে অপদ মনে করে সন্তান গ্রহণ করতেই চায় না। তেমনই অতীতেও করা হতো। দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করা হতো নিষ্পাপ অবোধ শিশু সন্তানকে। ইসলাম এই ঘৃণ্য কর্মের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে খাদ্যের মালিক তোমরা নও। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে খাদ্য দান করেন। তিনি যে প্রাণসমূহ পৃথিবীতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার খাদ্যের যাবতীয় দায়িত্ব ঐ আল্লাহরই। তাকে পৃথিবীতে প্রেরণের বহু পূর্বেই তিনি খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ–نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا–

দারিদ্রতার ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দিই এবং তোমাদেরকেও। প্রকৃত ব্যাপার হলো সন্তান হত্যা করা মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩১)

সন্তান জন্ম নিলে সংসারে টানাটানি বাধবে, অর্থ সংকট দেখা দেবে, খরচ কুলিয়ে ওঠা যাবে না এমন চিন্তা মনে স্থান দেয়াও মারাত্মক গোনাহ। মুসলিম পিতামাতা

www.pathagar.com

সন্তানের আগমনকে অন্তরের খুশী দিয়ে স্বাগতম জানাবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। হতে পারে সে সন্তান পুত্র অথবা কন্যা। সন্তান হলো কলিজার টুকরা। হৃদয় বাগানে ফোটা প্রিয় ফুল। মুসলিম পিতামাতা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে ওঠে। বারবার সে মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করতে থাকে। একজন মুসলিম পুরুষ কিভাবে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তা মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا–

হে আমাদের রব! আমাদের সন্তানদেরকে ও আমাদের স্ত্রীদেরকে বানিয়ে দিন আমাদের জন্য চোখ শীতলকারী এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম। (সূরা ফুরকান –৭৪)

প্রকৃত অর্থে স্ত্রী ও সন্তানের চরিত্রে যদি উৎকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটানো যায়, তাহলে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অন্তরে নিবিড় প্রশান্তি নেমে আসে। আল্লাহভীরু সন্তান ও স্ত্রী একজন পুরুষের জন্য মহান আল্লাহর অমূল্য নে'মাত। এ জন্য প্রত্যেক পরিবারের প্রধান নিজের উদ্যোগে পরিবারের সকল সদস্যকে ইসলামকে জানা ও অনুসরণের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পারিবারিকভাবেই চালু করতে হবে। ধৈর্যের সাথে এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু রাখলে ক্রমশ তাদের চরিত্রে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে এবং এই ভীতিই তাদেরকে উৎকৃষ্ট চরিত্র গড়তে অনুপ্রাণিত করবে।

সন্তানের প্রয়োজন পূরণ পিতামাতার দায়িত্ব

অর্থোপার্জন বা জীবিকার ব্যবস্থা করার কঠিন দায়-দায়িত্ব মহান আল্লাহ পুরুষ জাতির উপরে অর্পণ করেছেন। পুরুষকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সৃষ্টিও করেছেন সেভাবেই। জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় বস্তু সরবরাহের দায়িত্ব পুরুষের। নারীকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসব কঠিন ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখেছেন। নারীর মর্যাদার কারণেই নারীকে জীবিকার্জনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি।

অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব সন্তান প্রতিপালন করা। এ দায়িত্ব যেন সে পালন করতে পারে সে যোগ্যতা দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে সৃষ্টিই করেছেন যার যার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের উপযোগী করে। পুরুষের দায়িত্ব সে সংসারের যাবতীয় খরচ বহন করবে। নারী তার দায়িত্ব পালন করে যদি সময় সুযোগ পায় তাহলে উপার্জন করবে নতুবা নয়।

www.pathagar.com

সন্তান গর্ভে আসার পরপরই তার জন্য পিতার খরচ শুরু হয়ে যায়। মা'কে ডাক্তার দেখানো, ঔষধ পথ্যাদি ও উত্তম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। সন্তানের জন্য কাপড়া দান করা পিতার উপরে ওয়াজিব। এক কথায় সন্তান জীবিকা অর্জনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত সন্তানের যাবতীয় খরচ বহন করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা পিতার হৃদয়ে পিতা সুলভ মমতার অসীম আবেগ উচ্ছাস সৃষ্টি করে দিয়ে পিতার ও সন্তানের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন।

পিতা হিসেবে একজন মানুষ তার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ সন্তানের জন্য ব্যয় করবে শুধুমাত্র এই ধারণার কারণে সন্তানের অধিকার আদায় করা ছিল অসম্ভব। সন্তানের প্রতি অসীম প্রেম ভালবাসা মায়া-মমতা পিতার অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি সৃষ্টি না করতেন তাহলে কোনো পিতাই বোধহয় একটি পয়সাও সন্তানের পেছনে ব্যয় করতো না।

সন্তানের জন্য পিতা উদার হস্তে খরচ করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের রক্ত পানি করে পিতা অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ সন্তানের পেছনে ব্যয় করার পরে পিতা যখন সন্তানকে হাসি-খুশী দেখতে পায় তখন পিতার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়। অমুসলিম পিতা সন্তানের পেছনে অর্থ ব্যয় করে পৃথিবীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে, আর মুসলিম পিতার দৃষ্টি থাকে আখিরাতের দিকে। সন্তানের পেছনে যে ব্যয় তা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান এবং পরকালে সওয়াব পাওয়ার জন্য পরিবার পরিজনের উপর ব্যয় করে তাহলে তার এ ব্যয় (আল্লাহর দৃষ্টিতে) সাদকা হিসেবে পরিগণিত হয়। (বোখারী, মুসলিম)

একজন মুসলমানের সকল কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং মুসলিম পিতা সন্তানের জন্য খরচ করে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। মানুষকে মহান আল্লাহ যে সম্পদ দান করেছেন, সে সম্পদের প্রথম হকদার হলো তারই সন্তান। পিতামাতার সম্পদে সর্বপ্রথম যার অধিকার সে হলো তাদেরই কলিজার টুকরা সন্তানের।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো বর্তমানের এই যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে এমন এক পশু স্তরে নামিয়ে দিয়েছে যে, মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করতে চায় না। এ ব্যাপারে তারা ভীষণ কার্পণ্য করেন। তাদের বক্তব্য হলো, কি হবে এই অবাধ্য ছেলেমেয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করে।

www.pathagar.com

সন্তান অবাধ্য– এই অজুহাত দেখিয়ে তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে দান করে দেন। পশ্চিমা দেশ সমূহে তো অর্থ-সম্পদ থেকে সন্তান-সন্ততিকে বঞ্চিত করে বাড়িতে সখ করে যে সমস্ত কুকুর-বিড়াল পোষা হয়, সেসব কুকুর বিড়ালের নামে অর্থ-সম্পদ দান করা হয়। পিতামাতা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, সে অর্থ তারা ক্লাবে বা পার্টিতে অকাতরে ব্যয় করেন। কিন্তু তাদেরই কিশোর সন্তান-চাঁদের মতো ফুট ফুটে সন্তান মাত্র একটি ডলারের জন্য কোনো রেষ্টুরেন্ট বা হোটেলে বয়-বেয়ারার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে, কন্যা নিজের নারীত্ব অর্থের জন্য বিলিয়ে দিচ্ছে, এ দিকে পিতামাতার দৃষ্টি নেই।

পক্ষান্তরে মুসলিম পিতামাতার প্রতি ইসলামের কঠোর নির্দেশ, সন্তানের জন্য ব্যয় করো। সর্বপ্রথম সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করো, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করো। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তাহলে অন্যস্থানে দান করো। মুসলিম পিতামাতার কাছে এটা ইসলামের দাবী। নিজের সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় না করে, তাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী করে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে, মসজিদ-মাদ্রাসায়, স্কুলে বা অন্য কোনো ব্যাপারে দান খয়রাত করে, তার সে দান খয়রাত ইসলাম মোটেও পছন্দ করে না।

দান খয়রাত করতে করতে অবস্থা এমন হয়ে যাবে যে, নিজের সন্তানের জন্য ব্যয় করার মতো অর্থ থাকবে না-আল্লাহর নবী এটা পছন্দ করতেন না। আপনি সৎপথে দান করছেন-অথচ আপনার সন্তানের চিকিৎসার টাকা নেই, তার স্কুলের বেতন বাকী, তার পোষাক নেই, এ অবস্থা ইসলাম মেনে নেয় না। আপনি নিজের সুখ্যাতির জন্য, নিজের নাম চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অথবা আপনার ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য অবারিত হস্তে অর্থ ব্যয় করবেন। আর আপনার সন্তান পেট ভরে খেতে পারবে না, কষ্টে জীবন-যাপন করবে-এটা আল্লাহ তা'য়ালা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবেন।

আপনি সর্বপ্রথম আপনার অর্থ সম্পদ হতে আপনার সন্তানের হক আদায় করবেন। নিজের আরাম-আয়েশের পরিবর্তে সন্তানের আরাম-আয়েশের দিকে নজর দিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সাদকা তার যার পরও স্বচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বপ্রথম তাদের উপর খরচ করো যাদের ব্যয়ভার বহন তোমাদের জিম্মায় অর্পণ করা হয়েছে। (বোখারী)

কার্পণ্যতা ইসলামে ঘৃণার বিষয়। অর্থ-সম্পদ থাকলে তা অবশ্যই বৈধ পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান-সাদকা করতে হবে। দান-সাদকা করা কোরআন হাদীসের

www.pathagar.com

নির্দেশ। কিন্তু এ দান-সাদকা নিজের পরিবার-পরিজনদেরকে উপোস করে নয়। মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে সন্তান-সন্ততির জন্য। সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করেও মানুষ তৃপ্তি পায়, অনাবিল আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় তথা বস্তুবাদী সভ্যতা যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে এ আনন্দ নেই। পিতামাতার মন থেকে সন্তানের প্রতি ব্যয়ের আনন্দ মুছে গিয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের মনে এ আনন্দ সার্বক্ষণিক রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। পিতামাতা যদি সন্তানের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাহলে এটাই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যাদের খাওয়া পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গোনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব কারো উপরে বর্তে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গোনাহ হবে। (নাসায়ী)

নিজের সন্তান হোক বা অন্য কেউ হোক, কোনো ব্যক্তি যদি সামর্থ থাকার পরও তার অধীনস্থদের প্রয়োজন পূরণ না করে, তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী। যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এ অপরাধ করে, আদালতে আখিরাতে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। এমন কিছু মানুষ রয়েছে তারা ধারণা করে, ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করলে সওয়াব হবে। এরা অনেক ক্ষেত্রে নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের অভাবে রেখে নানা ভালো কাজে সওয়াবের আশায় দান করে। এই কাজ ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অর্থ হচ্ছে সেটি, যা সে ব্যয় করে তার পরিবারবর্গের জন্য, যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্য এবং যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী-সাথীদের জন্য।

এ হাদীসে প্রথমেই সন্তান-সন্ততির জন্য যে অর্থ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে তাই হচ্ছে সর্বোত্তম অর্থ-টাকা-পয়সা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক আশরাফী যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছো, এক আশরাফী যা তুমি কোনো গোলামের গোলামী থেকে মুক্তির জন্য খরচ করেছো, এক আশরাফী যা তুমি কোনো গরীবকে সাদকা হিসেবে দিয়েছো এবং এক আশরাফী যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছো। এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বড় সওয়াব সে আশরাফীর যা তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছো।

www.pathagar.com

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, মানুষ যত ভালো কাজেই অর্থ ব্যয় করুক না কেনো, এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী সওয়াব হলো নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য অর্থ ব্যয় করা, এটাই সর্বোত্তম ব্যয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে– সবচেয়ে উত্তম আশরাফী সে আশরাফী যা মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করে থাকে এবং সে আশরাফী যা মানুষ আল্লাহ্‌র পথের সওয়ারীর জন্য খরচ করে এবং সে আশরাফী যা মানুষ আল্লাহ্‌র পথের সঙ্গীদের জন্য খরচ করে। আবু কালাবা (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি সন্তান-সন্ততির উপর খরচ করা থেকে শুরু করেন এবং বলেন, সে ব্যক্তি থেকে বেশী সওয়াব ও পুরস্কার কে পেতে পারে যে নিজের ছোট ছোট সন্তানের জন্য খরচ করে। যাতে আল্লাহ্ তাদেরকে হাত পাতা থেকে বাঁচায় এবং সচ্ছল অবস্থায় রাখেন। (জামে তিরমিজী)

বস্তুত মানুষ স্বাভাবিক কারণেই, তার মনের তাগিদেই পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ জন্য বিশেষ কোনো যুক্তি বা দলীলের প্রয়োজন হয় না। তবুও ইসলাম এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিয়েছে এ কারণে যে, শয়তান মানুষকে যেন এ দায়িত্ব পালনে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

পিতামাতা কতদিন পর্যন্ত সন্তানের যাবতীয় খরচ বহন করবে-এটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত হলো, পুত্র সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সন্তান পূর্ণ বয়স্ক হলেও যদি সে শারীরিকভাবে উপার্জনে সক্ষম না হয়, উপার্জনের পথ পেতে দেরী হয়-এসব ক্ষেত্রেও সন্তানের ব্যয়ভার পিতাই বহন করবে।

নবী করীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল মাধ্যমে দুনিয়া অনুসন্ধান করলো, যাতে নিজেকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রুজির ব্যবস্থা করলো এবং নিজের প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করলো সে কিয়ামতে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যেন তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করছে এবং যে ব্যক্তি হালালভাবে এ জন্য দুনিয়া অর্জন করেছে যে, অন্যদের চেয়ে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে যে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হবেন। (বায়হাকি)

নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তানের জন্যে ব্যয় করা অত্যন্ত মর্যাদা ও সওয়াবের ব্যপার। মহান আল্লাহ এ সম্মান ও মর্যাদা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত করে

www.pathagar.com

দেননি। স্বামীর বর্তমানে অথবা অবর্তমানে হোক সামর্থবান নারী তার সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে চাকরি করে, বাড়িতে বসে হাতের কাজ করে নারী অর্থ উপার্জন করতে পারে। সে অর্থ তার সন্তান, মা, বোন, ভাই বা অধীনস্থদের জন্য ব্যয় করলে আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময় অবশ্যই দিবেন। শুধু তাই নয়-এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী সওয়াবের অধিকারী হবে। কেননা সে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছে, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের কারণে তার সওয়াবও অতিরিক্ত হবে।

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আবু সালমার পুত্রদের জন্য ব্যয় করার জন্য সওয়াব পাবো? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না যে, তারা অভাবগ্রস্তের মত পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। তারা তো আমারও পুত্র। তিনি বললেন, হাঁ তুমি তাদের জন্য যে ব্যয় করবে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্ববান মা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল হযরত আবু সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি ওহুদের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। আরোগ্য লাভ করেননি। পরে শাহাদাতবরণ করেন। তিনি চারটি শিশু সন্তান রেখে যান। হযরত উম্মে সালমা পরে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তার পূর্বের স্বামীর সন্তানের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথম স্বামীর সন্তান তাঁর কাছেই তিনি রাখতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরে তিনি সীমাহীন দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। ইসলামের কারণে তাঁকে স্বামী ও শিশু সন্তানের কাছ থেকে প্রায় একবছর বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অসীম। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। সন্তানের ব্যাপারে তার চিন্তা-চেতনা মুসলিম নারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত পথ দেখাবে।

www.pathagar.com

কন্যা সন্তান মহান আল্লাহর নে'মাত

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে তাঁর কোন্ বান্দাকে নিঃসন্তান রাখবেন, কোন্ বান্দাকে শুধুমাত্র পুত্র সন্তান অথবা কোন্ বান্দাকে শুধুই কন্যা সন্তান বা কোন্ বান্দাকে পুত্র এবং কন্যা সন্তান– উভয়টিই দান করবেন, এ ফায়সালা একমাত্র তিনিই করে থাকেন। ইসলামী আদর্শের অনুসারী মুসলিম পরিবারে কন্যা অথবা পুত্র সন্তান যা-ই জন্মগ্রহণ করুক না কেনো, তারা আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করে। মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম মোটেও অমর্যাদাকর নয় বরং কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক। ইসলামের অনুসারী পিতামাতা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আনন্দ প্রকাশ করবে আর কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে মুখ কালো করবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না।

কোরআন-সুন্নাহর অনুসারী পিতামাতার কাছে পুত্র বা কন্যা সন্তানের সম্মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব সমান। এদের মধ্যে কোনো ব্যবধান তারা করেননা। কারণ ব্যবধান করা বা পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে। পুত্র বা কন্যা হোক, এক সন্তানের উপরে আরেক সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া মারাত্মক গোনাহ।

নামধারী কিছু মুসলিম পরিবার রয়েছে, যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্তান সুন্দর বা কুৎসিত, কন্যা বা পুত্র হবে এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। পিতামাতার অন্তরে সন্তানের ব্যাপারে কামনা বাসনা যা-ই থাক, তাদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। কোন্ বান্দাকে কন্যা দান করলে তার কল্যাণ হবে অথবা অকল্যাণ হবে, আর কোন্ বান্দাকে পুত্র দান করলে কল্যাণ অথবা অকল্যাণ হবে তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

মুসলিম পিতামাতা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুত্র বা কন্যা কামনা করে দোয়া করতে পারেন। কিন্তু দোয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন– এ ধারণা সঠিক নয়। বান্দার জন্য যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাই করেন। কারো ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহ তা'য়ালা কাজ করেন না। তাঁকে বাধ্য করার মতো কোনো শক্তির অস্তিত্ব নেই। তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা কারো নেই। মহান আল্লাহর যা ইচ্ছে তাই তিনি করেন। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা বানিয়ে দেন।

www.pathagar.com

স্বামী তার ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বা কন্যা সন্তানের ভ্রূণ স্থাপন করতে পারে না। এ ব্যাপারে মানুষ অত্যন্ত অসহায় এবং যতবড় কামিল পীর সাহেবই হোক না কেনো, তার পানি পড়ায় বা তাবিজ কবজেও পুত্রের ক্ষেত্রে কন্যা আর কন্যার ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে না। এটা যদি সম্ভব হতো তাহলে পীর সাহেব নিজেই নিজের চাহিদা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতেন। আল্লাহ যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তার কোনো বান্দাকে তিনি সন্তান দিবেন না এ ক্ষেত্রে– পীর-মাজারের ক্ষমতা নেই কারো স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দেয়া। মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সন্তান দিতে পারে, এ কথা কেউ যদি বিশ্বাস করে তাহলে তার পক্ষে মুসলিম থাকা অসম্ভব।

মানুষের জ্ঞান-কোষাগারে এমন কোনো জ্ঞান মওজুদ নেই, যে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে জানতে পারবে, পুত্র সন্তান তার জন্য উপকার বয়ে আনবে অথবা কন্যা সন্তান তার জন্য ক্ষতিকর হবে। আল্লাহ তা'য়ালার ফায়সালা থাকলে, পুত্র-কন্যা যা-ই হোক যে কোনো সন্তানই কল্যাণকর হতে পারে অথবা অকল্যাণকরও হতে পারে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত অনুগ্রহ করে পুত্র বা কন্যা দান করে থাকেন। মানুষকে যখন কেউ কিছু দান করে, তখন তার কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মহান আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মু'মিনের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নে'মাত দিতে হবে এবং তিনিই নিজের জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মু'মিনের কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে এক ব্যক্তি বসেছিল। লোকটির কয়েকটি মেয়েছিল। সে আক্ষেপ করে বলছে– হায়! এসব মেয়ে যদি মরে যেতো তাহলে কতই না ভালো হতো! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং তাকে বললেন, তুমি কি তাদের রিযিক দাও?

কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর নবী স্বয়ং ছিলেন কন্যা সন্তানের পিতা, কন্যা সন্তান সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে সাহাবী হযরত ইবনে ওরায়েত কত সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করেছেন, 'আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যখন কারো গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা!

www.pathagar.com

তোমাদের প্রতি সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।' আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَاتَكْرَهُوا الْبَنَاتِ فَاِنِّىْ اَبُو الْبَنَاتِ–

কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।

তিনি আরো বলেছেন– কন্যারা অত্যন্ত মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ এবং কল্যাণ ও খায়ের বরকতের হয়। (কানযুল উম্মাল)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যৌবনে না পৌঁছানো অথবা স্বামীর বাড়ী না যাওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি এভাবে একত্রে থাকবো। এ কথা বলে তিনি হাতের অঙ্গুলসমূহ একত্রিত করলেন। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারোও কন্যা সন্তান হলে যদি সে তাকে জীবন্ত দাফন না করে, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবহেলা না করে, পুত্র সন্তানদেরকে তার তুলনায় বেশী মর্যাদা ও অগ্রাধিকার না দেয়, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন। (আবু দাউদ)

ইসলাম কন্যা সন্তানকে জাহান্নামে প্রবেশের প্রতিবন্ধক এবং জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছে। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় আল্লাহর কাছে কন্যা সন্তানের কত বিশাল মর্যাদা। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, জান্নাতে যাওয়ার পথ অত্যন্ত কঠিন এবং কন্টকাকীর্ণ। সে পথ অত্যন্ত সহজ-সরল কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে যাবে কন্যা সন্তানের কারণে। পুত্র সন্তানকেও যে আল্লাহ রিযক দান করেন ঐ একই আল্লাহ কন্যা সন্তানকেও রিযক দান করেন। কন্যা সন্তানকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিয়ে তাকে পরহেযগার পাত্রের হাতে অর্পণ করার অর্থ হলো জান্নাতে নিজের আবাস নির্মাণ করা।

পৃথিবীর সর্বত্রই কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেখানে কন্যা সন্তানকে লজ্জা, অপমান, অমর্যাদার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তিনিই নারী জাতিকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে টেনে উঠিয়ে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। ইসলামী পরিবারে কন্যা সন্তানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অসীম। পুত্র সন্তানের

www.pathagar.com

তুলনায় কন্যা সন্তানের মর্যাদা বেশী। কিয়ামতের দিন মসিবতের সময় আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হতে পারা যে কত সৌভাগ্যের বিষয় তা কল্পনাও করা যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসঙ্গে থাকবো। (মুসলিম)

শুধু নিজের কন্যা সন্তানই নয় নিজের বোনের ব্যাপারেও একই কথা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভালো স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করে, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে। (তিরমিযী)

বিয়ের পরে কারো বোন বা মেয়ে যদি স্বামীর বাড়ি থেকে ফেরৎ আসতে বাধ্য হয়, সেই মেয়ে বা বোনের ব্যাপারে ব্যয় করাকে বলা হয়েছে সর্বোত্তম দান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–তোমাকে সর্বোত্তম দানের কথা বলবো কি? তাহলো তোমার কন্যাকে যদি বিয়ের পর তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তখন তার জন্য উপার্জন করার তুমি ছাড়া কেউ না থাকে, তাহলে তখন তার প্রতি তোমার কর্তব্য হবে অতীব উত্তম সাদকা। (ইবনে মাজাহ্)

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে। সে তিন মেয়েকেই নিজের অভিভাবকত্বে রেখেছে। তাদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করেছে এবং তাদের প্রতি রহম করেছে। তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কোনো গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু' কন্যা হয়। তিনি জবাব দিলেন, যদি দু' কন্যা হয় তাহলেও এ সওয়াব পাওয়া যাবে। (আল-আদাবুল মাফরুজ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মন্তব্য করেছেন, মানুষ যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি মাত্র কন্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করতো, তাহলে তিনি একমাত্র কন্যার ব্যাপারেও সুসংবাদ প্রদান করতেন। (মিশকাত)

কন্যা সন্তানের পিতামাতার হাতেই তাদের জান্নাত। তারা যদি পুরোপুরি কন্যা সন্তানের হক আদায় করেন, তাহলে নিশ্চিত জান্নাত লাভ করবেন। আর হক আদায় না করলে নিজেরাই দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন। কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক। পৃথিবীর কোনো আদর্শ বা তথাকথিত ধর্ম কন্যা সন্তানকে কোনোই মর্যাদা দেয়নি।

www.pathagar.com

কন্যা শয়তানের সঙ্গী, সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক, নরকের দরজা, কন্যা মানুষের মধ্যে গণ্য নয় ইত্যাদী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহর নাজিল করা জীবন বিধান একমাত্র ইসলামই বলেছে, কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দাস-দাসীকে, মহিলাকে বা পশুকে কোনদিন নিজের হাতে আঘাত করেননি। তিনি বাইরে থেকে যখন ঘরে আসতেন তখন তাকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখা যেত। তার মুখে যেন চাঁদের হাসির বন্যা বয়ে যেত।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমার কাছে এক মহিলা দুইজন কন্যাসহ সাহায্যের জন্য এলো। সে সময় আমার কাছে একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। খেজুরটি আমি তার হাতে দিলাম। সে খেজুরটি অর্ধেক করে নিজের দু'কন্যাকে দিয়ে দিল, নিজে কিছু খেলো না। এরপর সে চলে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে এলেন তখন আমি এ ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তিকেই এ কন্যার মাধ্যমে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেছে। তাহলে এ কন্যারাই তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। (বোখারী, মুসলিম)

সন্তানের প্রতি মায়ের যে কত মমতা এটাই প্রকাশ পেয়েছে উল্লেখিত হাদীসে। মা অভুক্ত থেকে সন্তানকে খাওয়ায়। তবুও কন্যা সন্তান। যার কাছ থেকে পুত্র সন্তানের ন্যায় বিনিময় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ এই কন্যা সন্তানই পিতামাতাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে হেফাজত করবে-যদি সত্যিকারভাবে কন্যা সন্তানের অধিকার আদায় করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি নিজের কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সম্পর্কে বলতেন, আমার দেহের একটি অংশ হলো ফাতিমা। যে তাকে অসন্তুষ্ট করবে সে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে। (বোখারী)

আল্লাহর নবী কন্যাদেরকে অত্যন্ত সম্মানও করতেন। বিয়ের পরে মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার সাথে যখনই দেখা করতে আসতেন, মেয়েকে দেখার সাথে সাথে তিনি মেয়ের সম্মানে মুখে মধুর হাসি টেনে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন। মধুর সম্ভাষণে মেয়েকে সম্ভাষণ জানাতেন। মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে মেয়েকে নিজের জায়গায় বসাতেন। (আবু দাউদ)

কিন্তু আফসোস্ আল্লাহর নবীর এই শিক্ষা তার অনুসারীরা ভুলে গিয়েছে। মেয়েকে যতদ্রুত সম্ভব নিজের বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে

www.pathagar.com

মেয়ের অভিভাবক। বছরে মেয়েকে দু একবার দেখতে যাবার সময় হয় না তাদের। এ জন্য অবশ্যই আদালতে আখিরাতে জবাবদিহী করতে হবে। মেয়ের চেহারা মলিন দেখলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাও মলিন হয়ে যেত। হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, একবার তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার গৃহে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষন পর সেখান থেকে অত্যন্ত হাসিখুশী অবস্থায় বের হয়ে এলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন কন্যার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং যখন ঘর থেকে বের হলেন তখন হাসি খুশী অবস্থায় বের হলেন, ব্যাপার কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি উভয়ের মনোমালিন্য দূর করে দিয়েছি। তারা উভয়েই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে নিজের কাছাকাছি রাখার জন্যে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। হিজরতের পরে মদীনায় আল্লাহর রাসূল হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বেশ দূরে থাকতেন। তিনি একদিন মেয়ের বাড়ীতে গেলেন। কথা প্রসঙ্গে মেয়েকে জানালেন, মা! তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকো। আমার মন চায় তোমাকে আমি আমার কাছাকাছি রাখি।

হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পিতাকে বললেন, আব্বা! হারিছ ইবনে নোমানের বেশ কয়েকটি বাড়ী আছে। আপনি যদি তাকে একটি বাড়ীর কথা বলেন তাহলে সে অবশ্যই আপনার কথা রাখবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– মা! আমি তাকে এ কথা বলতে লজ্জা অনুভব করি।

এ কথা যে কোনোভাবেই হোক হযরত হারিছ ইবনে নোমানের কানে গেল। তিনি দেরী না করে দ্রুত আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি জানতে পারলাম আপনি আপনার মেয়েকে আপনার অবস্থানের কাছাকাছি কোনো বাড়ীতে নিয়ে আসতে চান। হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাপ আপনার পবিত্র কদম মোবারকে উৎসর্গ হোক! আমার সমস্ত বাড়ী আপনার খেদমতে পেশ করলাম। যে বাড়ী আপনার ইচ্ছা, সেটা আপনি গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আপনি যে বস্তুই আমার কাছ থেকে গ্রহণ করবেন, সেটা আমার কাছে থাকার চেয়ে আপনার কাছে থাকা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তুমি যথার্থ বলেছো। মহান আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত ও বরকত নাজিল করুন।' এরপর তিনি হযরত হারিছ ইবনে নোমানের একটি বাড়ী গ্রহণ করে সে বাড়ীতে কন্যা ফাতিমাকে নিয়ে এলেন, এরপর থেকে তিনি সফরে যাবার সময় একে একে সবার সাথে সাক্ষাৎ করে সবশেষে কন্যা ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করে সফরে বের হতেন। সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে নফল নামায আদায় করে সর্বাগ্রে কন্যা ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তারপর অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

সুতরাং কন্যা সন্তানকেও তার অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে এবং কোনো ব্যাপারেই কন্যা সন্তানকে অবজ্ঞা করা যাবে না। তাদের তুলনায় পুত্রদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। কন্যা সন্তান যেন স্বাবলম্বী হতে পারে, এ জন্য তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা করতে হবে। তবে সর্বপ্রথমে তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে হবে এবং পিতামাতার কাছে এটা তাদের অধিকার। এই অধিকার আদায় না করলে আখিরাতের ময়দানে পিতামাতাকে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তান-সন্ততির বিয়ের অধিকার

সন্তানের প্রতি পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তাদেরকে বিয়ে দেয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেছেন তার কাজ হলো, তার ভালো নাম রাখা, তাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং যখন সে উপযুক্ত বয়সে পৌছে তখন তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া। উপযুক্ত বয়সে পৌছার পর যদি সে সন্তানের বিয়ে না দেয় এবং সন্তান কোনো গোনাহতে লিপ্ত হয় তাহলে তার শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে। (বায়হাকী)

সন্তান পুত্র-কন্যা যা-ই হোক, সে যখন উপযুক্ত বয়সে উপনীত হয়, তখনই তার বিয়ের চিন্তা করা পিতামাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালন না করলে এক অশুভ পরিণতির সম্মুখিন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। সন্তান-সন্ততির বিয়ের ব্যাপারে পিতামাতা অবশ্যই তাদের মতামত নেবে, কেননা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন কোনো সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক নয়–এটা চিরস্থায়ী ব্যাপার। হঠাৎ করেই এ ধরনের চিরস্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি হতে যেমন পারে না আর হলেও তা টিকে থাকার নিশ্চয়তা নেই।

এ কারণে ইসলামের বিধান হলো কারো সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ পরস্পরে প্রস্তাব দিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। অথবা ছেলে বা মেয়েও তাদের নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলাইবাব নামক এক সাহাবীর জন্য এক আনসারী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব কন্যার পিতার কাছে পেশ করেন। কন্যার পিতা তার স্ত্রী অর্থাৎ কন্যার মায়ের মতামত জেনে এর জবাব দেবেন বলে ওয়াদা করেন। লোকটি তার স্ত্রীর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এ বিয়েতে তার মত নেই বলে জানিয়ে দেয়।

কন্যা আড়াল থেকে পিতামাতার কথোপকথন শুনতে পায়। তার পিতা যখন আল্লাহর রাসূলের কাছে বিষয়টি জানাতে যাবেন, এমন সময় মেয়েটি পিতামাতাকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে চাও? তিনি যদি বরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করে থাকেন তবে তোমরা এ বিয়ে সম্পন্ন করো। এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মেয়ে নিজে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত ছিল এবং পিতামাতার কাছে তার মতামত যা গোপন ও অজ্ঞাত ছিল, যথাসময়ে সে তা জানিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

পিতামাতা বা অভিভাবকই শুধু পাত্র বা পাত্রী দেখে সন্তানের বিয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন না। কেননা দাম্পত্য সম্পর্ক চিরস্থায়ীভাবে যার সাথে স্থাপন করা হবে, তাকে পরস্পর দেখে নেবে। এ ক্ষেত্রে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীকে ইসলাম স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক পাত্র-পাত্রী পছন্দ করবে আর পাত্রী হয়ত পাত্রকে পছন্দ করবে না অথবা পাত্র পছন্দ করবে না এ সুযোগ নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।'

এ হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তারপর তাকে গোপনে দেখে নেয়ার জন্য আমি চেষ্টা চালাতে শুরু করি। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে। এরপর তাকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করি। (আহমাদ)

দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে মেয়েকে যেমন ছেলে দেখবে তেমনি দেখবে ছেলেকে-মেয়ে। ছেলে-মেয়ের যতদিক পছন্দ করবে অনুরূপভাবে মেয়েও ছেলের বিভিন্ন দিক পছন্দ বা অপছন্দ করবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কোনো কুৎসিৎ কদর্য চেহারার ছেলের নিকট বিয়ে দিও না। কেননা মেয়ের দেহের যে সব অংশ একজন

www.pathagar.com

ছেলের নিকট আকর্ষণীয় অনুরূপভাবে একজন মেয়ের নিকটও একজন পুরুষের ঐ সব অংশ আকর্ষণীয়।' অতএব মেয়ে অবশ্যই দেখবে কোন্ ধরনের পুরুষের সাথে তার বিয়ে হচ্ছে। মেয়ের অমতে বা পছন্দের বাইরে তার বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক তাকে বাধ্য করতে পারে না। মেয়ে তার বিয়ের পূর্বেই যার সাথে সে বিয়ে করবে, তার সমস্ত দিক দেখে জেনে বুঝেই বিয়ে করবে।

বিয়ের সময় পাত্রীর যে সমস্ত গুণাবলী দেখা জরুরী, তার মধ্যে পাত্রী ধার্মিক কি না সেটা দেখা সবথেকে বেশী জরুরী। পাত্রীর মধ্যে অন্যান্য গুণাবলী অল্প মাত্রায় যদি থাকে আর সে পাত্রী যদি আল্লাহভীরু হয় তাহলে তাকেই বিয়ে করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয়। তার অর্থ-সম্পদ, তার বংশ গৌরব-সামাজিক মান-মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই গ্রহণ করো।'

এই হাদীসের নির্দেশ হলো, দ্বীনদারীর গুণসম্পন্ন পাত্রী পাওয়া গেলে তাকেই যেন স্ত্রীরূপে বরণ করা হয়, তাকে বাদ দিয়ে অপর কোনো গুণসম্পন্ন মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। দ্বীনদার ও ধার্মিক মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। সদ্বংশজাত ও সুন্দরী রূপসী হওয়াও মেয়ের বিশেষ গুণ এবং এর যে কোনো একটি গুণ থাকলেই একজন মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ মুখ্য ও প্রধান নয়–গৌণ। চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদার হওয়ার গুণটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিয়ের সময় পাত্র আল্লাহভীরু পাত্রীকে বিয়ে করবে আর পাত্রী যে কোনো চরিত্রের পাত্রের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ইসলামের নির্দেশ তা নয়। বরং পাত্রীও অনুসন্ধান করবে দ্বীনদার পাত্রের। নারী যখন একজন পুরুষের সাথে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হবে, তখন সে অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না। কোরআন-হাদীসের অনুসরণ করে না। হালাল-হারামের পরোয়া করে না। যার চরিত্র বলতে কিছুই নেই এবং চিন্তা-চেতনা ইসলামী আদর্শের বিপরীত– এমন পুরুষের সাথে কোনো মুসলিম নারী কিছুতেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। পাত্রপক্ষ যেমন পাত্রী পক্ষের নানা ধরনের সৎ গুণাবলী চাইবে, অনুরূপ পাত্রী পক্ষ পাত্রের ঐ ধরনের গুণাবলীই চাইবে যে ধরনের গুণাবলী তারা পাত্রীর মধ্যে চায়। বিয়ে তথা দাম্পত্য জীবন গ্রহণের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর প্রতি ইসলামের এটাই নির্দেশ এবং এই নির্দেশ পালন করা অত্যন্ত জরুরী।

www.pathagar.com

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি একত্রিত করবেন

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, মহাগ্রন্থ আল কোরআনের গবেষকগণ তা ৯টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই উপদেশমালা হযরত লূকমান যে যুগে তাঁর সন্তানকে উপলক্ষ্য করে দিয়েছিলেন, কথাগুলো শুধুমাত্র সেই যুগের উপযোগীই নয়– এই উপদেশমালা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানের সকল যুগের মানব সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য। এই উপদেশ অনুসরণ করলে যেমন পূর্ণ মুসলিম হিসেবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করে মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা যাবে এবং সফলতা ও কল্যাণ লাভ করা যাবে, তেমনি এই পৃথিবীতেও একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ এবং পরস্পরের প্রতি বিনয়ী সমাজও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

যেসব কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলতা, অশান্তি, পরস্পরের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-মারামারি সৃষ্টি হয় এবং সমাজকে কলুষিত করতে পারে, সেসব কারণ দূরীকরণে হযরত লূকমানের উপদেশ মূখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে মানবমন্ডলীকে অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন।

ইতোপূর্বে আমরা মহান আল্লাহর সাথে শির্ক না করা সম্পর্কিত প্রথম উপদেশটি এবং আল্লাহ তা'য়ালা পিতামাতা ও সন্তানের অধিকার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তার ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে দ্বিতীয় উপদেশে যে কথাগুলো বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَااللّٰهُ–اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ–

(আর লুকমান তার নিজের পুত্র সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরো বললো) হে পুত্র! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানার মতোও (ক্ষুদ্রও) হয় এবং তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতরে, আকাশে অথবা পৃথিবীতে কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা (হাশরের ময়দানে) বের করে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত আছেন। (সূরা লূকমান)

হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে সরিষার উপমা দিয়েছেন। সরিষার উপমা হয়ত তিনি এ জন্যই দিয়ে থাকবেন যে, সে সময় পর্যন্ত মানুষের কাছে সরিষাই সবথেকে ক্ষুদ্র বস্তু বলে গণ্য হতো। দৃশ্যমান সরিষার থেকেও ক্ষুদ্র বা

www.pathagar.com

অদৃশ্যমান ক্ষুদ্র অনু-পরমাণুর বিষয়টি তখন পর্যন্ত হয়ত মানুষের জানা ছিলো না। তিনি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিষয়টি সন্তানের সম্মুখে এভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, অনু-পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র কোনো জিনিস, যা মানুষের পক্ষে এই চর্মচোখে দেখা সম্ভব নয় বা যা দেখতে কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই ধরনের কোনো বস্তু যদি বিশাল বিস্তীর্ণ পাহাড়, সাগর-মহাসাগর, ঠিকানাহীন মরুপ্রান্তরের বালুকা রাশির মধ্যে অথবা মহাকাশের কোনো স্তরে পড়ে থাকে, মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে তার অবস্থান জানা মোটেও অসম্ভব নয়।

অদৃশ্য কোনো বস্তু নয়– দৃশ্যমান সরিষার একটি দানা যদি আটলান্টিক মহাসাগরে বা বিশাল মরুভূমির বালুকা রাশির মধ্যে অথবা আন্দেজ পর্বতমালার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়, সরিষার এই দানাটি অক্ষত অবস্থায় খুঁজে বের করার মতো কোনো টেক্‌নোলজি বর্তমান বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অর্থাৎ এ ধরনের বিষয় মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং মহান আল্লাহর কাছে তা খুবই সহজ।

কারণ দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান কোনো বস্তু যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি, তেমনি তার অবস্থান তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে নয়। যেখানে যা রয়েছে, মানুষ তা কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হোক বা না হোক, সবই আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তিনি ইচ্ছা করার সাথে সাথে তা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে বাধ্য। আল্লাহ সুব্‌হানাহু তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কুদরতের বিষয়টি হযরত লুকমান তাঁর সন্তানের হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সেই সাথে তিনি তাঁর সন্তানের দৃষ্টির সম্মুখে আদালতে আখিরাতের দৃশ্যও একজন নিপুণ শিল্পীর মতোই অঙ্কন করেছেন। শেষ বিচারের দৃশ্য এমন ভয়ঙ্করভাবে নিজ সন্তানের সামনে উপস্থাপন করেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে সন্তানের কলিজা কেঁপে ওঠে এবং সে যেনো নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অপরাধ থেকেও গুটিয়ে নেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনে সে যেনো মহান আল্লাহর জানার ক্ষমতার বিষয়টি স্মরণে রাখে। অর্থাৎ মনের গহীনেও কল্পনার জগতেও যেনো কোনো ধরনের অপরাধ বৃত্তিকে প্রশয় না দেয়।

হযরত লুকমানের দ্বিতীয় এই উপদেশের মধ্যেও শির্‌ক পরিহার ও তাওহীদের আকীদা অনুসারে জীবন পরিচালনার বিষয়টি জড়িত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যে এক, একক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার অংশীদার যে কেউ নেই, এই বিষয়টি তিনি সন্তানের মন-মানসিকতায় এভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহই হলেন মানুষের ইলাহ এবং তিনি অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের

www.pathagar.com

অধিকারী। তাঁর জানার বাইরে কোনো কিছুই নেই। ঝড়-ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ঘন তমসাবৃত রজনীতে বজ্রপাতের গগন বিদারী শব্দের মধ্যেও ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকা হেঁটে যাওয়ার শব্দও মহান আল্লাহর জানার বাইরে নয়। তাঁর এই অসীম ক্ষমতায় অন্য কারো সামান্যতম অংশ নেই। তিনি একাই যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে এই বিশ্বাসই মানুষকে সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য অপরাধমূলক কাজ ও চিন্তা থেকে বিরত রাখে এবং আদালতে আখিরাতে বিচারের দিনে অণু-পরমাণু পরিমাণ কাজ– তা ভালো-মন্দ যা-ই হোক না কেনো, তার পরিণাম ফল ভোগ করার অনিবার্যতা মানুষের মন-মস্তিষ্কে দৃঢ়মূল করে দেয়।

হযরত লুকমানও নিজের সন্তানের ব্যাপারে এই চেষ্টা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যেক পিতাকেই নিজের সন্তানের মন-মস্তিষ্কে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করে দেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। সন্তানের মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা, তাঁর ভয় এবং আদালতে আখিরাতের ভয় দৃঢ়মূল করে দেয়াও পিতামাতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। নিজ নিজ সন্তানের ব্যাপারে এই দায়িত্ব যদি প্রত্যেক পিতামাতা পালন করতেন, তাহলে বর্তমানে সর্বত্র যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হতাশা, চুরি-ডাকাতী, ছিনতাই, হত্যা-রাহাজানী বহুলাংশে হ্রাস পেতো– সন্দেহ নেই।

পিতা সন্তানের সম্মুখে আখিরাতের বিচারালয়ের চিত্র উপস্থাপন করে তার মধ্যে আখিরাতে সকল কাজের জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইতোপূর্বে আমরা তাফসীরে সাঈদীর অন্যান্য খন্ডে আখিরাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার ক্ষেত্রে এ কথা বলেছি যে, আখিরাতের বিষয়টি মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে মানুষের চরিত্র কিছুতেই ভালো হতে পারে না এবং মানুষ অপরাধমুক্ত বা অপরাধের চিন্তামুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ সেই মানুষের মনে আদালতে আখিরাতের বিচারালয়ে জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত না থাকে। এই অনুভূতি মানুষের মনে জাগ্রত করার জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে যেমন আখিরাতের বিষয়টি সবথেকে বেশী উল্লেখ করেছেন তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আখিরাতের বিষয় সম্পর্কিত আলোচনাসমূহ একত্রিত করলে ত্রিশ পারা কোরআনের দশ পারার সমান হবে।

একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত ব্যাপক আলোচনা এ জন্যই করা হয়েছে যে, মানুষ যেনো পরকালে জবাবদিহির চেতনায় এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করে। অর্থাৎ মানুষ অপরাধমুক্ত থাকে এবং এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ-রাষ্ট্র। ঠিক এই লক্ষ্যেই হযরত লুকমান তাঁর সন্তানের মনে আখিরাতের ভীতি

www.pathagar.com

সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তিনি সরিষার দানার সাথে তুলনা দিয়ে বলেছেন, তা যদি পাথর খন্ডের মধ্যেও লুকায়িত থাকে, আল্লাহ তা'য়ালা তা বের করে আনবেন। এই ছোট্ট কথার মধ্য দিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যাপক বিষয় সন্তানের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথা পবিত্র কোরআনের আলোচনা সূচনাতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ কথা কোরআন অধ্যয়নকারী লোকদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আমি তাকে সুক্ষ্মজ্ঞান দান করেছিলাম।'

এই পৃথিবীতে অনেক বড় বড় উচ্চ শিক্ষিত লোকদেরও আমরা দেখে থাকি যে, যথারীতি গুছিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে কোনো বিষয় শ্রোতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারেন না। গুরুতপূর্ণ কথাগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অল্প কথার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন না– প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান, শ্রোতা মন্ডলী বিরক্ত বোধ করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁরই এক মাহ্বুব বান্দা লূকমানকে এমন সুক্ষ্মজ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন, যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ করলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হতো, সেই কথাগুলোই তিনি খুবই ছোট্ট ছোট্ট বাক্যের মধ্যে দিয়ে এমন হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, যা শ্রোতার মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর কথামালার মধ্যে কোনো বাহুল্য শব্দ বা ভাব নেই। প্রত্যেকটি শব্দই বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে এবং প্রত্যেক শব্দই শ্রোতার মন-মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

হযরত লূকমানকে দেয়া সুক্ষ্মজ্ঞানের বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে যেনো এ কথাই মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন– দেখো, আমি আমার বান্দা লূকমানকে অতি সামান্য জ্ঞান দিয়েছি এবং তোমরা তাঁর জ্ঞানের প্রশংসা করছো এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী তাঁকে নিয়ে চর্চা করছো। এবার তোমরা সেই জ্ঞানদাতার অসীম জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো, তাঁর কি কোনো শরীক থাকতে পারে?

মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার বিষয়টি বছরের পর বছর ব্যাপী আলোচনা করলেও শেষ হবে না। অথচ এই বিশাল ও ব্যাপক কথাগুলোই হযরত লূকমান খুব ছোট্ট একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে এভাবে প্রকাশ করলেন, 'হে আমার সন্তান! সরিষার থেকেও ক্ষুদ্র কোনো বস্তু যদি পাথরখন্ডে, আকাশ সাম্রাজ্যে বা পৃথিবীর অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকে, মহান আল্লাহ তা বের করে আনবেন।'

এই মহাবিশ্বের কোথায় কোন্ বস্তু অবস্থান করছে, তা সবই মহান আল্লাহ তা'য়ালা জানেন– শুধু এই বিষয়টিই উক্ত কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়নি। বরং তাঁর ন্যায় বিচার ও ইনসাফ থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো বিষয়ও বাদ পড়বে না, মানুষের ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

কোনো কাজ– যা অন্যের চোখে পড়েনি। যার অস্তিত্ব মানুষের চোখে পড়ে না, যা দৃশ্যমান নয় এবং মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, থাকতে পারে তা মহাকাশের অগণিত গ্রহের কোনো এক স্তরে বা মাটির অতল তলদেশে। এমন ক্ষুদ্র বিষয়ের সাথে যদি কোনো মানুষ জড়িত থাকে, তাহলে তাকে আদালতে আখিরাতে আল্লাহ তা'য়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا–وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا–

কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ পরিমাপ করার জন্য ন্যায়দন্ড স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম জুলুম হবে না। যার কণা পরিমাণও কোনো কর্ম থাকবে তা-ও আমি সামনে আনবো। (সূরা আম্বিয়া-৪৭)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি এমন পাথরের (ঘরে) মধ্যে অবস্থান করে কোনো কাজ করে, যার কোনো দরজা-জানালা নেই এবং কোনো ছিদ্রও নেই, তবুও আল্লাহ তা'য়ালা তা মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন, সে কাজ ভালো-মন্দ যা-ই হোক। (ইবনে কাসীর)

মহাকাশের ঐ বিশাল শূন্যমার্গে, তারকাপুঞ্জ বা গ্রহের অভ্যন্তরে, মহাকর্ষের শূন্য বলয়ে, গভীর আগ্নেয় গিরির শেষস্তরে, মহাসাগরের তলদেশে, মৃত্তিকার সর্বনিম্ন ভাগে, অগণিত পর্বত পরিবেষ্টিত পিপীলিকার ক্ষুদ্র কোনো গুহায় বা বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালুকা রাশির মধ্যে মানুষের বিন্দু পরিমাণ কোনো কর্মের স্পর্শ জড়িয়ে থাকে, এসব কিছুকেই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থিত করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه –وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه–

যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও সৎকাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে এবং যে বক্তি বিন্দু পরিমাণও অসৎকাজ করেছে সে-ও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল-৭-৮)

হযরত লূকমান এভাবেই তাঁর সন্তানের মনে মহান আল্লাহ তা'য়ালার শক্তি, ক্ষমতা, অসীম জ্ঞান ও কুদরত সম্পর্কিত বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই সাথে সন্তান যেনো আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গড়ে, সেই উপাদানও তিনি সরবরাহ করেছেন।

www.pathagar.com

প্রকৃত অর্থে পিতামাতার কাছে সন্তানের যতগুলো অধিকার রয়েছে, এর মধ্যে সবথেকে বড় অধিকার হলো পিতামাতা সন্তানকে এমন সব উপাদানের ভিত্তিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিবেন, সন্তান যেনো আপন মনিব মহান আল্লাহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে পারে এবং আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গড়তে পারে। এসব উপাদান সন্তান শুধুমাত্র পিতামাতার কাছ থেকেই লাভ করার অধিকারী নয়– সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে, তাদের কাছেও নতুন প্রজন্ম উল্লেখিত উপাদান লাভ করার অধিকারী।

এসব উপাদান লাভ করা থেকে বঞ্চিত নতুন প্রজন্ম অবশ্যই আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে না, তারা ধ্বংস ও ক্ষতিকর পথেরই পথিক হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, আখিরাতের দিন এরা যখন কৃত অপরাধের কারণে জাহান্নামে যাবে তখন বলবে–

رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنَ اَضَلّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الاَسْفَلِيْنَ-

হে আমাদের রব! সেইসব জিন ও মানুষ আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (সূরা হামিম আস্ সিজ্‌দা-২৯)

এই পৃথিবীতে নবজাতক যারা আসছে, তাদের হক শুধু মাত্র পিতামাতার প্রতিই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের কাছেই তাদের নানা ধরনের হক রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে যারা নেতৃত্বের দায়িত্বে অবস্থান করছেন, তারা অবশ্যই শিশু-কিশোর ও তরুণ-যুবকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং এবং তাদেরকে শিক্ষাব্যবস্থাসহ অন্যান্য গণমাধ্যম ব্যবহার করে সঠিক জ্ঞান দান করবেন– এটা নতুন প্রজন্মের অধিকার। এই অধিকার পিতামাতাসহ অন্যরা যদি পালন না করেন, তাহলে ভুল পথ অবলম্বন করার কারণে নতুন প্রজন্ম যখন আখিরাতে গ্রেফতার হবে, তখন তারা মহান আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে–

رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ-رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো। (সূরা আহ্‌যাব-৬৭-৬৮)

www.pathagar.com

হযরত লূকমানের দ্বিতীয় উপদেশের শেষের কথাটি হলো, 'আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত।' তিনি তার সন্তানকে আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা, জ্ঞান ও কুদরত সম্পর্কে জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে অবগত।'

এই কথাটি স্বয়ং হযরত লূকমানের না আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, হযরত লূকমান আল্লাহ তা'য়ালার গুণ-বৈশিষ্ট্য সন্তানকে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে এই কথাটি বলেছেন। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক স্থানে এই কথা এবং এ কথার অনুরূপ অনেক কথাই বলেছেন।

মানুষ সাধারণত আল্লাহ তা'য়ালার শক্তি-মত্তা বা অসীম জ্ঞান এবং তাঁর সকল বিষয়ে অবগত থাকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যেমন বলে থাকে, তিনি সুক্ষ্ম বিচার করে থাকেন, তিনি সবকিছুই দেখছেন, তাঁর কাছ থেকে কিছুই গোপন করা যাবে না।'

মূলত এসব কথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষের মুখ-উচ্চারিত হলেও কথাগুলো কোরআনের এবং নবী-রাসূল ও কোরআন-হাদীস থেকেই মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা লাভ করেছে। আদালতে আখিরাতে মহান মালিক মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজেরও হিসাব গ্রহণ করবেন, এই কথাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই শেষের কথায় রাব্বুল আলামীনের ঐ বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনিই একমাত্র সুক্ষ্মদর্শী ইলাহ, রব, মা'বুদ– যিনি সকল বিষয়ে অবগত রয়েছেন। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি এক, একক, অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য। সুতরাং দাসত্ব একমাত্র তাঁরই করতে হবে, কেননা তিনিই একমাত্র দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী।

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব অর্পণ

হযরত লুকমান প্রথমে তাঁর সন্তানকে মহান আল্লাহ সম্পর্কে অর্থাৎ তাওহীদ সম্পর্কে ধারণা দিলেন। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দিলেন। এবার সেই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য কি এবং পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে, সে ব্যাপারে তিনি বলছেন–

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْبِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَااَصَابَكَ -اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ-

হে পুত্র! নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো। তোমার ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়লে ধৈর্য ধারণ করো, আর এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা লুকমান)

উল্লেখিত আয়াতে তিনি তাঁর সন্তানকে নামায প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। এরপর মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার কথা বলেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে মানুষকে নানামুখী বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলা করতে হয়, এসব বিপদ-মুসিবত এলে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন এবং সেই সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সৎকাজের আদেশ-নিষেধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে।

নামায সম্পর্কে আমি আমার লেখা 'চরিত্র গঠনে নামাযের অবদান' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং উক্ত গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ করেছি যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রশিক্ষণই হলো নামায। মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে– এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নামাযই মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের উপযোগী করে প্রস্তুত করে। আল্লাহর দাসত্ব করতে হলে মানুষের মধ্যে যে ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকা প্রয়োজন, নামায তা মানুষের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করে। মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, নামাযের মাধ্যমে মানুষ সেই যোগ্যতা অর্জনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

রোগাক্রান্ত মানুষকে রোগমুক্ত করার কাজে যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন, প্রথমে তাদেরকে রোগ ও কোন্ রোগের কোন্ ওষুধ– এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয় এবং চিকিৎকসার কাজে ব্যাপক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

www.pathagar.com

যথারীতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরই চিকিৎসক মূল কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, এই দায়িত্ব কোনো মানুষের পক্ষ থেকে অন্যান্য মানুষের প্রতি অর্পণ করা হয়নি।

বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে মহান আল্লাহর আদেশ এবং তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদাতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ধরনের গুণাবলী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, নামাযের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রশিক্ষণই মানুষকে দেয়া হয়ে থাকে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন, তা কোরআন নির্দেশিত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত নামাযই মানুষের মধ্যে সরবরাহ করে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালন করতে হলে মানুষকে সর্বপ্রথমে চারটি গুণে গুণান্বিত হতে হয়। এ গুণসমূহ হলো, ঈমান, আমলে সালেহ্, হক-এর দাওয়াত এবং ধৈর্য অবলম্বন।

মূলত এই চারটি গুণ অর্জন করা ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষেই পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ এবং সফলতা অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের ছোট্ট একটি সূরা– সূরা আসরে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তাফসীরে সাঈদী–সূরা আল আসরের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বস্তুত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালনের ওপরই মুসলমানদের যাবতীয় কল্যাণ নির্ভর করে। প্রত্যেক নবী-রাসূলই এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এই দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং তাঁরা অনুসারীদের এই প্রশিক্ষণই দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবায়ে কেরামকে নামাযের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করেই সারা দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই নীতি অবলম্বন করাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় কর্ম-চাঞ্চল্যের কেন্দ্র বিন্দু। এটাই ছিল তাদের সর্বাগ্রে পালনীয় দায়িত্ব। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এ কথা চরম সত্য যে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম মিল্লাত এই দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে ইতোপূর্বে বনী ইসরাঈলীরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছিলো বলে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং তারা মহান আল্লাহর

www.pathagar.com

গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। লাঞ্ছনা আর অপমান হয়েছে তাদের ললাট লিখন। যে কারণে ইয়াহূদীরা নেতৃত্বের পদ থেকে পদচ্যুত হয়েছে এবং ঘৃণা ও লাঞ্ছনার জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, সেই একই কারণ যদি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে ইয়াহূদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালা যে আচরণ করেছেন, সেই একই আচরণ তিনি মুসলমানদের সাথেও করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়াহূদীদের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে (নাউযুবিল্লাহ) এমন শত্রুতা ছিলো না যে, তিনি তাদের প্রতি অকারণে গযব চাপিয়ে দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সাথেও মহান আল্লাহর এমন কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই যে, তারা ইয়াহূদীদের ন্যায় আচরণ করতে থাকবে আর আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন রাখবেন এবং ক্রমাগতভাবে তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেই যাবেন।

এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে মুসলমানরা অতীতের সেই ইয়াহূদীদের তুলনায় মোটেও সুখকর আচরণ করছে না। ইসলামের বিপরীত যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের চরিত্রে বিকশিত হয়ে পৃথিবীময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোয় রাস্তা-পথে যান-বাহন চলাচলে শৃংখলা রক্ষা ও সাধারণ জনগণের শান্তি-স্বস্তির সাথে পথ চলা নিশ্চিত করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে অবহেলা প্রদর্শন করে, তাহলে রাস্তা-পথে চরম বিশৃংখলা দেখা দেবে। নিষিদ্ধ যান-বাহন পথে নেমে আসবে, তা থেকে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকর গ্যাস ও ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে। যানজটের কারণে সাধারণ মানুষ শান্তি ও স্বস্তির সাথে পথ চলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। যান-বাহন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে, মানুষ প্রাণ হারাবে, পঙ্গুত্ববরণ করবে এবং সম্পদের হানী ঘটবে।

পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তারা গোটা পৃথিবীর প্রত্যেক দিক ও বিভাগের শৃংখলা এবং মানব জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করবে–এটাই ছিলো তাদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। তাদের প্রতি এই দায়িত্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য যে ক্ষমতা ও পদের প্রয়োজন হয়, তা-ও মহান আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন। ক্ষমতা ও পদ অর্জনের জন্য বেশ কয়েকটি গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ক্ষমতা ও পদ কোনটিই আল্লাহ তা'য়ালা দেন না। কারণ মহান আল্লাহর নীতি হলো, তিনি অপাত্রে ক্ষমতা ও পদ দেন না।

www.pathagar.com

মুসলমানদের মধ্যে অতীতকালে সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিলো, তারা ক্ষমতা ও পদ লাভের গুণ অর্জন করেছিলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তখন অনুগ্রহ করে মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও পদ দুটোই দান করেছিলেন। যখনই তারা নিজেদের অযোগ্যতার কারণে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'য়ালাও ক্ষমতা ও পদ নামক নে'মাত দুটো তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা ছিলো ট্রাফিক পুলিশের অনুরূপ, তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মহান আল্লাহর ভাষায়–

اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ–

যদি দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসো, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মক ধরনের ভাঙ্গন ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল-৭৩)

আর যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় নেমে আসবে তা থেকে সমাজের ঐ লোকগুলোও নিরাপদ থাকবে না, যারা ইসলাম বিরোধিদের চতুর্মুখী আক্রমণ সাহসের সাথে মোকাবেলা না করে মসজিদ আর খানকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ নিজেরাই শুধু ইসলামের সাধারণ বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করেছে, জাতিকে আল্লাহ বিরোধী পথ থেকে বিরত রাখার কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিরত থেকেছে। নিজেরাই শুধু অসৎকাজ থেকে বিরত থেকেছে কিন্তু সমাজ ও দেশের বুকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। ঈমানদার যে সমাজে বাস করবে, সে সমাজে বাতিল মাথা উঁচু করবে, ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ড চলতে থাকবে, আর ঈমানদার নীরবে তা সহ্য করবে এবং কোনো প্রতিবাদ করবে না, এটা স্বাভাবিক নয়।

কোনো সরকারের প্রতিনিধিত্ব যিনি করেন, প্রথমে তাকে সেই সরকারের আনুগত্য করতে হয় এবং সরকারের কোন্ বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তার সরকারের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। মানুষ মহান আল্লাহর খলীফা অর্থাৎ তাঁর প্রতিনিধি। মানুষ যার প্রতিনিধি এ জন্য তাকে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় জানতে হবে, তাঁর শক্তি, ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে। এরপর তাঁর আনুগত্য করতে হবে। পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়টি স্মরণে রাখুন এবং হযরত লুকমান কর্তৃক তাঁর সন্তানকে দেয়া উপদেশের প্রতি দৃষ্টি দিন। তিনিও সর্বপ্রথমে সন্তানের কাছে মহান আল্লাহর পরিচয়

www.pathagar.com

পেশ করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর সেই আল্লাহর গোলাম হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বলেছেন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হলে প্রথমে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে হয়। আর নামাযই মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়। আপন সন্তানকে তিনি কঠিন দায়িত্ব পালন করার উপদেশ দেয়ার পূর্বে নামাযের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এরপর তিনি সন্তানকে উপদেশে দিয়েছেন, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মানুষকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো।

যাঁর পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাঁর ক্ষমতা, জ্ঞান ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে সন্তানকে আখিরাত ভিত্তিক চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানের অন্যতম শাখা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস– এই বিশ্বাস সন্তানের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে– অন্য কারো নয়, এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মানুষের চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে তাকে আল্লাহর দাস হিসেবে গড়ার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব পালনের উপযোগী হিসেবে তাকে গড়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যেই তিনি সন্তানকে নামায প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন।

যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা হয় এবং যিনি দায়িত্ব অর্পণ করেন, এই দুইজনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতেই হবে। নতুবা দায়িত্ব পালনকারী কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে না। একদিকে তিনি সন্তানকে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ' পালন করতে বলছেন, অপরদিকে দায়িত্ব যে আল্লাহ তা'য়ালা অর্পণ করেছেন, তাঁর সাথে নামাযের মাধ্যমে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

এই দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। মানুষ যখন কোনো কঠিন কাজ করতে অগ্রসর হয়, স্বাভাবিকভাবেই সে কঠিন কাজ সহজ করার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকের সাথে পরামর্শ করে সহজ পথ সম্পর্কে জেনে নেয়। এরপর কোনো শক্তিমান লোকের সাহায্য গ্রহণ করে কঠিন কাজ সমাধা করে।

মানুষ যে কঠিন দায়িত্ব পালন করবে, এই দায়িত্ব পালন করার সঠিক পথ ও পদ্ধতি জানার মাধ্যম এবং দায়িত্ব পালনকালে কোন্ শক্তিমান সত্তা তার পৃষ্ঠপোষক-বন্ধু বা

www.pathagar.com

সাহায্যকারী হিসেবে তার সাথে থাকবেন, এই বিষয়টি হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি প্রচন্ড ক্ষমতাবান, তাঁর এতই শক্তি ও ক্ষমতা যে, মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি গোচরে রয়েছে। অসীম তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান।

সুতরাং তুমি যখন দায়িত্ব পালনকালে ময়দানে অবতীর্ণ হবে, তখন প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নিজেকে শক্তিহীন বা একা মনে করো না। মহাজ্ঞানী ও অসীম শক্তিশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার সাথে অবশ্যই রয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। সূরা লুকমানের ১৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতা ও তাঁর সুক্ষ্মদর্শী হওয়া এবং যাবতীয় বিষয়ে তাঁর অবগত থাকার বিষয়টি উল্লেখ করে, পরোক্ষভাবে এই দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

স্রোতের বিপরীতেই বীরের সংগ্রাম

সূরা লুকমানের ১৭ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার আদেশ পালন করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।' অপরদিকে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বনী ইসরাঈল জাতি মহান আল্লাহর বিধান অমান্য করা শুরু করলো, তখন তাদের আলিম-ওলামা তাদেরকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করলো না। এরপর তাদের আলিম-ওলামা (তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ না করে) তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে একত্রে সহবস্থান করতে থাকলো। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উভয় দলের অবস্থা এক করে দিলেন। (অর্থাৎ আলিমদের হৃদয়ও পাপীদের হৃদয়ের মত পঙ্কিল ও কালিমাময় হয়ে গেল)। আর তাদের এ পাপকার্য ও সীমালংঘনের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে অভিশম্পাত দিলেন।

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এই কথাগুলো আল্লাহর রাসূল হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় বলছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন– না, (তোমাদেরকে বনী ইসরাঈলদের অনুরূপ হলে চলবে না।) আমি আল্লাহ তা'য়ালার শপথ করে বলছি, যার মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ। নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। আর তোমরা যালিমের বাহু ধরে তাকে হক কাজ করতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না করো, তাহলে তোমাদের

www.pathagar.com

মন-মানসিকতাও আল্লাহ বিরোধিদের মনের অনুরূপ হয়ে যাবে। তারপর তোমরাও বনী ইসলাঈল জাতির মতো অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হবে। (বায়হাকী, মিশকাত)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে তাহলে সে যেন কথার মাধ্যমে নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক নিষেধও করতে না পারে তাহলে যেন মনে মনে এই কাজ উচ্ছেদ করার চিন্তা করে। আর মনে মনে চিন্তা করাটা হলো ঈমানের সব চেয়ে দুর্বলতম লক্ষণ।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে একজন ব্যক্তিও আল্লাহর বিধানের বিপরীত কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং কল্যাণকর কাজের জন্য লোকদেরকে উৎসাহ দিবে। অন্যথায় এক সামগ্রিক আযাবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। অথবা তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে নিকৃষ্টমত পাপী লোকদেরকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করবেন। এরপর তোমাদের সৎ লোকেরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

এই আদেশ সম্পর্কিত বিষয়টি পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করে মুসলমানদের সতর্ক ও সজাগ করার প্রচেষ্টা অত্যন্ত লক্ষণীয়। ইতোপূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি, এই দায়িত্ব পালন করা মামুলী কোনো বিষয় নয় এবং এই দায়িত্ব যথারীতি পালনের মধ্যেই মুসলমানদের যাবতীয় কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে। আর এই কাজে যারা নিজেদেরকে নিয়োজত করবে, তাদেরকে অবশ্যই সাহস ও বীরত্বের যে কোনো পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে হবে। ভীরু ও কাপুরষদের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। মানুষের চারিত্রিক সংশোধনের ও সমাজ-রাষ্ট্রকে সমস্যা মুক্তকরণের কাজ সাহসহীন ভীরু লোকদের পক্ষে পৃথিবীর কোনো দেশে বা কোনো যুগেই সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

যিনি যে আদর্শের অনুসারী, সেই আদর্শের রঙে মানবতাকে রঙিন দেখতে চাইলে বা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেই রঙে রঙিন করতে চাইলে মামুলী ধরনের কর্মসূচী ও পন্থা অনুসরণ করে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আরাম-আয়েশের জিন্দেগীতে অভ্যস্ত বিলাসী-ভীরু লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। নেতৃত্বের আসন ভীরু-কাপুরষদের জন্য নয়- এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য যে, অসীম সাহসী, ত্যাগী আর বীর পুরুষদেরকেই নেতৃত্বের আসন বার বার স্বাগত জানিয়েছে আর ভীরু-বিলাসী লোকদেরকে আস্তা কুড়োয় ছুড়ে দিয়েছে।

মুসলমানদেরকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে হবে এবং নামায থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে নেতৃত্বের উপযোগী করে গঠন করতে হবে। এরপর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে মানুষকে সৎকাজের আদেশ তথা ইসলাম যেসব কাজ করার আদেশ দিয়েছে, তা জারী করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা যে আইন-বিধান দিয়েছেন তা প্রশাসনিক শক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর ইসলাম যেসব কাজ থেকে মানুষকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে, তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এবং এই নিষেধাজ্ঞাও প্রশাসনিক পন্থায় বাস্তবায়িত করতে হবে।

এটাই হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং এই দায়িত্ব পালন করা আর না করার মধ্যেই মুসলমানদের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে আর এই দায়িত্বের বিষয়টিই হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে আগত সন্তানদের তাদের অভিভাবকদের কাছে এটা তাদের মৌলিক অধিকার যে, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে অভিভাবকগণ সজাগ-সচেতন করবেন।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত দেশ ও মুসলিম পরিচিতির অধিকারী মানুষগুলো সর্বত্র সন্দেহ-সংশয়, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পাত্রে পরিণত হয়েছে। মুসলিম পরিচিতি বহন করে প্রত্যেক দিন যেসব শিশু মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, তারা যেনো অমুসলিমদের অস্ত্রের খোরাক হিসেবেই পৃথিবীতে আগমন করছে। প্রত্যেক দিন ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় মুসলিম নামে পরিচিত মানুষের লাশের মিছিল প্রদর্শিত হচ্ছে। নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম অত্যাচার ভোগ এদের যেনো ললাটের লিখনে পরিণত হয়েছে।

অমুসলিম দেশসমূহের বিমান বন্দরে কারো মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি অথবা পাসপোর্টে মুসলিম নামের গন্ধ পেলেই তাকে সন্ত্রাসী সন্দেহে অপমান করা হচ্ছে। মুসলমানদের

www.pathagar.com

এই অবস্থার একমাত্র কারণই হলো, তারা নামায থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে না এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন থেকে নিজেদেরকে অনেক দূরে রেখেছে।

মহান আল্লাহর অসীম রহমত যে, তিনি তাঁর এই গোলামকে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে কোরআনের আহ্বান পৌছানোর সুযোগ দিয়েছেন– আল হাম্‌দু লিল্লাহ্‌। দেশ-বিদেশে সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই নেতৃত্বের আসনে মুসলমানদের আসীন হওয়া প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন করে থাকেন। এসব প্রশ্ন শুধু আমার সম্মুখেই উত্থাপন করা হয়নি। ইসলামকে একটি জীবন বিধান হিসেবে পাবার আশায় যারাই নিজেদের কণ্ঠ সোচ্চার করেছেন এবং তৎপরতা চালিয়েছেন, তাঁদেরকে প্রত্যেক যুগেই অনুরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইসলামের বিপরীত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবল স্রোত দেখে একশ্রেণীর মুসলিম পরিচিতির অধিকারী লোকজন যেসব প্রশ্ন করেন এবং পরম শুভাকাংখীর মতো পরামর্শ দিয়ে থাকেন তার সমষ্টি হলো– 'আপনি ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব?

সারা পৃথিবীতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রচন্ড ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং কর্তৃত্ব করছে। এই ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে যারা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করছে, তারাই বর্তমান পৃথিবীতে উন্নতি আর প্রগতির স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়েছে। এরা অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নীতি নৈতিকতার বন্ধন মানে না। পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বন্ধন মানে না। ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রেও কোনো বন্ধনে আবদ্ধ নয়। আবহমান কাল ধরে যেসব প্রথা চলে আসছে, তারা তার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।

যেসব বিষয় ছিলো মানুষের একান্ত গোপনীয়, তা তারা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত করছে এবং এই পথ অনুসরণ করেই তারা পৃথিবীব্যাপী নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। অপরদিকে মুসলমানদের শক্তি-মত্তা বলতে কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই এবং তারা রণক্লান্ত সৈনিকের মতোই পর্যদুস্ত। আপনারা কোরআনের বিধান অনুসরণের কথা বলেন, কিন্তু কোরআনের বিধান কি বর্তমান যুগে অনুসরণ করা সম্ভব?

সারা দুনিয়া ব্যাপী পুঁজিবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক শক্তি বিজয়ীর আসনে আসীন হয়ে মুসলিম নামে পরিচিত লোকদের জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগকে

www.pathagar.com

পরিবেষ্টন করেছে। পুঁজিবাদী পশ্চিমা সভ্যতা-যাকে আপনার মতো ইসলামপন্থী ব্যক্তিত্বগণ নোংরা সভ্যতা নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। এই পশ্চিমা সভ্যতাই মুসলমানদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব বলয় থেকে কোনো একটি মুসলিম পরিবারও মুক্ত নেই এবং মুক্ত থাকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন।

বর্তমানে পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদ প্রভাবিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যেই উন্নতি নিহিত। আমরা যদি কোরআন প্রদর্শিত পথের কথা বলে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি এড়িয়ে যেতে চাই, তাহলে পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাবো। জীবনের গতিপথ প্রত্যেক যুগে একই পথে প্রবাহিত হয় না। যুগের বাতাসে তা পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তিত পথেই উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা মুসলমানরা যদি নিজেদেরকে অপরাপর জাতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে অক্ষম হই, তাহলে আমরা সার্বিক দিক দিয়ে পিছিয়ে যাবো। কারণ আমাদের সেই শক্তি-সামর্থ নেই, যা দিয়ে আমরা অপরাপর জাতির ওপর প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম। বর্তমান পৃথিবীতে পূর্বের মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ডের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অমুসলিম হিসেবে পরিচিত উন্নত জাতিসমূহ তাই অনুসরণ করে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এ ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে আমাদেরকেও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, আর উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে অনিচ্ছুক হলে পুরনো প্রথা-পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে অন্যান্য জাতির দাস হিসেবে টিকে থাকতে হবে। ইসলাম যেসব বিধি-বিধান দিয়েছে, তার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যত-সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা যথাস্থানে রেখে যতটুকু অসামঞ্জস্য রয়েছে, তা ঢেলে নতুন আঙ্গিকে সাজাতে হবে। এর মধ্যেই রয়েছে বর্তমান মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণ।'

উল্লেখিত কথাগুলো যারা বলে থাকেন, তারাও নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিয়ে এমন ভাব ও ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেন, শুনে মনে হবে তারা মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তায় অস্থিরতার মধ্যে রয়েছেন। এই ধরনের কথা শুধু বর্তমান যুগেই আসছে না, অতীতে প্রত্যেক যুগেই দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের সামনে এসেছে এমনকি নবী-রাসূলদের সম্মুখেও একশ্রেণীর লোকজন কল্যাণকামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'কিছু দাও এবং কিছু নাও Give and take' ধরনের প্রস্তাব পেশ করেছে।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনের সূরা কাফিরুন এ ধরনের পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং এ বিষয়ে আমরা তাফসীরে সাঈদী-সূরা কাফিরুনের তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই ধরনের প্রশ্ন ও প্রস্তাব এবং শুভাকাংখী দলের অস্তিত্ব অতীতেও মুসলিম নামের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের মধ্যে ছিলো এবং বর্তমানেও যেমন রয়েছে, কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদের প্রশ্ন ও প্রস্তাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি– পরিবর্তন যা হয়েছে তা ভাষাগত ও চেহারার।

নবী-রাসূলদের সম্মুখেও ঐ একই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, 'বর্তমান পৃথিবীতে যে বাতাস বইছে, তুমি তো সেই বাতাসের গতি পরিবর্তন করতে চাও। তোমার শক্তি-সামর্থ বলতে কিছুই নেই, তুমি কিভাবে যুগের বাতাসের গতি পরিবর্তন করবে? বরং তুমি তোমার আদর্শকে যুগের বাতাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে নাও।'

এ প্রস্তাব শুধু নবী-রাসূলের সম্মুখেই উত্থাপিত হয়নি। নবী-রাসূলদের মিশন নিয়ে পরবর্তীতে যারাই সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের কাছেই এই প্রস্তাব নানা আঙ্গিকে দেয়া হয়েছে। ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও লোভ-লালসা দেখানো হয়েছে। মূলনামের পূর্বে আলিম বা মাওলানা বিশেষণধারী লোকদের মধ্যে যারাই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তাদের নামের পূর্বে প্রগতিশীল, উদার, নরমপন্থী ইত্যাদি বিশেষণ জুড়ে দিয়ে তাদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

আর যেসব মর্দে মুজাহিদ ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের সাথে সামান্যতম আপোষে রাজী হননি, তাঁদের নামের পূর্বে কট্টরপন্থী, মৌলবাদী, পশ্চাৎপন্থী ও সন্ত্রাসী বিশেষণ জুড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষদের কাছে তাঁদেরকে ঘৃণা আর অবহেলার পাত্রে পরিণত করার যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো কোনো দিক গ্রহণ করে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে আল্লাহর বিধানকে ঢেলে সাজিয়ে যেসব মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীতে টিকে থাকতে চান বা উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি সেই পুরনো কথাগুলোই উচ্চারণ করতে চাই– যে কথাগুলো প্রত্যেক যুগেই ইসলামের মর্দে মুজাহিদগণ বাতিল শক্তির ক্রীড়ণকদের সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় সাহসের সাথে উচ্চারণ করেছেন।

আল্লাহর বিধানকে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে ঢেলে সাজিয়ে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তারা সময় ও শ্রম

www.pathagar.com

বিনিয়োগ করে কেনো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার এই কষ্ট স্বীকার করতে চান? বরং যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে আল্লাহর বিধানকে ঢেলে সাজাতে চান, তারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে যান। পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে রঙিন হলে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে বলে যদি বিশ্বাসই করে থাকেন, তাহলে নিজেদের নামের সাথে মুসলিম গন্ধ জড়িয়ে রাখতে কে আপনাদেরকে বাধ্য করেছে?

মানব রচিত বিধান বা পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই যারা প্রগতি ও উন্নতির একমাত্র মাধ্যম বলে বিশ্বাস করেন এবং এর আলোকেই ইসলামকে ঢেলে নতুন রূপ দিয়ে মডার্ণ ইসলাম বানাতে চান, এদের মতো শত কোটি মুসলিম (?) ইসলামের কোনোই প্রয়োজন নেই, বরং এদের গায়ে ইসলামের গন্ধ থাকলেই ইসলাম ও মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে সবথেকে বেশী। ইসলামের এমন দুর্দিন আসেনি যে, ইসলাম এদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। এ কথা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করতে চাই, আল্লাহর বিধান অন্য কোনো বিধানের অধীনে নিজেকে অস্তিত্বশীল রাখতে বা অন্য বিধানের অনুগ্রহ কুড়াতে অথবা অন্য বিধানের সাথে আপোষ করে টিকে থাকার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়নি।

বর্তমানে পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদ প্রভাবিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যেই উন্নতি নিহিত এবং আমরা যদি কোরআন প্রদর্শিত পথের কথা বলে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি এড়িয়ে যেতে চাই, তাহলে পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাবো– শুভাকাংখীর ছদ্মাবরণে যারা এই পরামর্শ দিচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট কথা হলো, কেউ তো আপনাদেরকে পেছন দিক থেকে টেনে ধরেনি, কেনো আপনারা মুসলিম পরিচয় মুছে ফেলে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন না? এই আদর্শ সর্বাগ্রে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে উন্নতি ও প্রগতির ঘোড়া কত দ্রুত ছুটে তা দেখিয়ে দিন না?

জীবনের গতিপথ প্রত্যেক যুগে একই পথে প্রবাহিত হয় না, যুগের বাতাসে তা পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তিত পথেই উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হয়– মুসলিম মিল্লাতকে যারা এই নসিহত করছেন, তারা রঙহীন পরিবর্তনশীল এবং মৌলিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়। শকুন যতোই উপরে উঠুক না কেনো তার চোখ থাকে ভাগাড়ের দিকে। এসব লোকের স্বভাবও শকুনের অনুরূপ, উত্তম মূল্যবোধে এরা সন্তুষ্ট নয়। নোংরা আবর্জনায় নিমজ্জিত থাকার মধ্যেই এরা তৃপ্তি অনুভব করে।

www.pathagar.com

প্রত্যেক যুগে মানবতা বিধ্বংসী নোংরা সভ্যতার প্রচলন ঘটবে আর এসব লোক জীবনের গতিপথ ঐ সভ্যতার নোংরা পথের দিকেই ঘুরিয়ে দেবে। স্থায়ী এবং মৌলিক মূল্যবোধে এরা বিশ্বাসী নয়। বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয়, এসব লোক সেদিকেই ছুটতে থাকে অর্থাৎ এরা আল্লাহর গোলামী পছন্দ করে না, এরা বাতাসের দাসত্ব করে।

পশ্চিমা দেশগুলোয় নারীদের পোষাক সংক্ষিপ্ত হতে হতে নগ্নতার সর্বশেষ স্তরে এসে নেমেছে। এরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুগ্রহে নিজেদের স্ত্রী-কন্যাদের পোষাক সংক্ষিপ্ত করে দেহের মধ্যভাগে এক টুকরো আর নিম্নাঞ্চলে আরেক টুকরো ন্যাকড়া জড়িয়ে পথে, মার্কেটে ও ক্লাব-পার্টিতে ছেড়ে দিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতায় মদ্যপান দোষের কিছু নয়– এরাও মদ্যপানকে আভিজাত্যের প্রতীকে পরিণত করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ যদি পরিপূর্ণ নগ্ন হওয়াকেই আভিজাত্য বলে ফতোয়া দেয়, এরাও সাথে সাথে সে ফতোয়া বাস্তবায়ন করবে। এদের কাছে হালাল-হারামের একমাত্র মানদন্ড হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। সেখানে যা বৈধ-অবৈধ, এদের কাছেও তাই বৈধ-অবৈধ। পাশ্চাত্যের বিপণী কেন্দ্রসমূহে ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নানা পদার্থের তৈরী মূর্তির গায়ে পণ্য ঝুলিয়ে রাখে। এরাও নিজ নিজ দেশের বিপণী কেন্দ্রে মূর্তি স্থাপন করে মূর্তিকে বস্ত্র আর অলঙ্কারে সাজিয়ে ক্রেতা সাধারণকে আকৃষ্ট করার পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

এ জন্য আমি বিভিন্ন স্থানে বলে থাকি, মুসলিম নামে পরিচিত এসব দেশ আল্লাহ না করুন– কখনো যদি প্রবল ভূমিকম্পে মাটির তলায় ধ্বসে যায়, আর কয়েক শতাব্দি পরে নৃতত্ত্ববিদগণ খনন কাজের মাধ্যমে যখন এসব দেশ আবিষ্কার করবে, তখন তাদের পক্ষে এসব দেশের প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মূর্তির সমারোহ দেখে তারা ধারণা করতে বাধ্য হবে যে, এসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মূর্তি পূজারী ছিলো। ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশসমূহের ইতিহাস তারা যদি পাঠ করে থাকে যে, এসব দেশ মুসলিম দেশ ছিলো। তখন তারা নতুন ইতিহাস রচনা করবে এভাবে, এসব দেশ অমুসলিম দেশ ছিলো এবং তাদের রচনার সপক্ষে তারা মূর্তিসমূহ প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

এসব লোক পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং যখন যেভাবে পরিবর্তন হয়, সেভাবেই নিজেদেরকে ঢেলে সাজাতে ইচ্ছুক। বর্তমান পৃথিবীতে সাদা চামড়া ওয়ালাদের আবিষ্কৃত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন রয়েছে। পরিবর্তনে বিশ্বাসী ও যুগের বাতাসের অনুসারী লোকগুলো সাদা চামড়া ওয়ালাদের আবিষ্কৃত সভ্যতাই

www.pathagar.com

অনুসরণ করছে। আগামী কাল যদি আফ্রিকার নিগ্রোদের আবিষ্কৃত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হয়, তাহলে এসব লোক নিজেদেরকে কালো রঙে আবৃত করে নিগ্রোদের সভ্যতাই অনুসরণ করবে, নিগ্রোরা যে ফতোয়া দেবে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। আবার ভারতীয় টিকি ও পৈতাধারী ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হলে, এরাও টিকি ও পৈতার অনুসারী হতে সামান্যতম লজ্জাবোধ করবে না।

নসিহত করা হচ্ছে– বর্তমান পৃথিবীতে পূর্বের মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ডের পরিবর্তন ঘটেছে এবং অমুসলিম হিসেবে পরিচিত উন্নত জাতিসমূহ তাই অনুসরণ করে আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে আমাদেরকেও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

এই নসিহতের বিপরীতে আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, এই পৃথিবীতে যারা সুসভ্য, সুস্থ সংস্কৃতির অনুসারী, নম্র-ভদ্র ও সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত, মানবতাকে যারা উত্তম নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন করার মহৎ কাজে লিপ্ত, পৃথিবীময় শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা অকুতোভয়, তাদেরকেই হেয়-প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার লেবেল তাদের গায়ে এঁটে দেয়া হচ্ছে, তাদের ছবি নানা ধরনের মিডিয়ায় বার বার প্রচার করে সাধারণ মানুষের কাছে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এভাবেই মানবতার দুশমনরা মূল্যবোধ ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড পরিবর্তন করেছে। আমাদেরকেও কি এই ঘৃণ্য নীতি অবলম্বন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসত্ব করতে হবে?

আপসোস, এই পৃথিবীতে যারা শান্তির শ্বেত কবুতর ওড়ানোর জন্য নিজেদেরকে পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকে দূরে রেখে দরিদ্রতা আর দুঃখ-কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছে, পশ্চিমা মূল্যবোধ আর ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড তাদেরকেই অশান্তি আর বিপর্যয়ের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করছে। আর যারা সন্ত্রাসী, বিশ্বব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে, শান্তির শ্বেত কবুতরকে যারা নিষ্ঠুর হাতে নির্মম পন্থায় হত্যা করছে, মানুষের ওপরে জুলুম অত্যাচারের রোলার চালিয়ে দিচ্ছে, তাদেরকেই শান্তির দুত হিসেবে পরিচিত করে নানা ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতার আবিষ্কৃত ন্যায়-অন্যায়ের এই ঘৃণ্য মানদন্ডই কি আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে?

www.pathagar.com

এই নসিহত যারা করছে তারা রঙহীন এবং এই ধরনের রঙহীন, পরিবর্তনশীল, দাসসুলভ মন-মানসিকতা সম্পন্ন লোকগুলোই প্রত্যেক যুগে মুসলিম নামের ছদ্মাবরণে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের সম্মুখে নানা যুক্তি দিয়ে এই পরামর্শই দিয়েছে যে, আল্লাহর বিধানকে যুগের রঙে রঙিন না করলে উন্নতি আর প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে না।

এসব লোক স্পষ্টতই মুনাফিক এবং মুনাফিক গোষ্ঠীর ইতিহাস হলো, এরা প্রত্যেক যুগেই ইসলামের দুশমনদের অনুগ্রহ কুড়ানোয় নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। নবী-রাসূলদের সমকালীন ইতিহাস এ কথাই বলে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন ইতিহাস ও নিকট অতীতের মুসলমানদের ইতিহাসও এ কথার জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বালাকোটের ইতিহাস এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসও এই মুনাফিকদের ঘৃণ্য তৎপরতায় কলঙ্কিত হয়েছে। বর্তমানেও মুসলিম দেশগুলোকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে এবং মুসলিম দেশে অমুসলিম শক্তির আগ্রাসন চালানোর ক্ষেত্রও এরাই প্রস্তুত করেছে এবং করছে।

আল্লাহর বিধানকে এরা সবসময় নিজেদের জন্য 'কারাগার'-এর অনুরূপ মনে করেছে এবং এ জন্যই তারা ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান দিয়ে আল্লাহর বিধানকে মসজিদ ও মাদ্রাসার চার দেয়ালে বন্দী করার কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এসব লোকের আবদার এবং তৎপরতার কারণে অতীতেও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেমে থাকেনি, বর্তমানেও থেমে নেই এবং ভবিষ্যতেও থেমে থাকবে না– ইন্‌শাআল্লাহ।

দৃঢ় মনোভাব, অসীম সাহস ও অকুতোভয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে, যে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন এবং হযরত লূকমানও তাঁর সন্তানকে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন, 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার আদেশ পালন করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।'

এই দায়িত্ব ঐসব লোকদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়– যারা পরিবর্তনে বিশ্বাসী, রঙহীন, ভীরু-কাপুরুষ এবং যুগের বাতাসে ভেসে বেড়ানোয় অভ্যস্ত। এ কথা স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবতার সংশোধন ও সংস্কারের জন্য যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তা রঙহীন, পরিবর্তনে বিশ্বাসী ও ভীরু-কাপুরুষদের জন্য অবতীর্ণ করেননি। ভিন্ন জাতির গোলামী বা দাসত্ব করার মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের জন্যও কোরআনের বিধান পৃথিবীতে আসেনি। যুগের বাতাসে যারা জীবনের গতিপথ পরিবর্তনে অভ্যস্ত তাদের জন্যও আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হয়নি।

www.pathagar.com

যারা মৌলিকত্বে বিশ্বাসী, আপোষহীন, দুঃসাহসী, অকুতোভয়, নির্ভীক, দৃঢ় মনোবল ও প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বিধান অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর বিধানকে যারা নিজের যাবতীয় ধন-সম্পদ ও নিজের প্রাণের তুলনায় অধিক প্রিয় মনে করে, যারা যুগের বাতাসের গতিপথকে নিজের আদর্শের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, নিজের প্রিয় আদর্শের রঙে যারা সারা দুনিয়াকে রাঙানোর দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেছে তাদের জন্যই পবিত্র কোরআনের বিধান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনের বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রাম করতে গিয়ে যারা ফাঁসির মঞ্চকে সাফল্যের স্বর্ণদ্বার মনে করে, কারাগারকে যারা বিশ্রামস্থল মনে করে, দুশমনের মারণাস্ত্রের আঘাতকে যারা সুগন্ধযুক্ত ফুলের ছোঁয়ার অনুরূপ মনে করে, পৃথিবীর জীবনে যারা সাফল্য ও ব্যর্থতার তোয়াক্কা না করে যে কোনো ক্ষতিকেই হাসি মুখে বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, আল্লাহর বিধান তাদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

পৃথিবীর জীবনের চাকচিক্যকে যারা প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর বিধান পরিত্যাগকারী নগ্ন সভ্যতার অনুসারীদেরকে যারা সাফল্যের উচ্চমার্গে আরোহণকারী বলে মনে করে, তাদের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, যে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে স্রোত ও যুগের বাতাসের বিপরীতেই অবস্থান নিতে হয়। যাবতীয় ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসাকে জয় করতে হয় এবং যে কোনো প্রকার ক্ষতিকে স্বাগত জানানোর দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করতে হয়।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এই দায়িত্ব পালনে যারাই অগ্রসর হয়েছে, নানামুখী প্রচন্ড বাধা-বিপত্তি তাদের পথরোধ করেছে। এই দায়িত্ব পালনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়– সম্পূর্ণ কন্টাকীর্ণ এবং দুর্গম। এই দুর্গম পথ যারা পাড়ি দেয়ার মতো হিম্মত রাখে তাদের পক্ষেই এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। হযরত লুকমান তাঁর সন্তানের মধ্যে এই হিম্মত সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই বলেছিলেন, 'হে আমার সন্তান! নামায প্রতিষ্ঠা করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো। তোমার ওপর কোনো বিপদ-মসিবত এসে পড়লে ধৈর্য ধারণ করো, আর এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

পিতামাতার কাছে সন্তানের এটা অধিকার যে, সন্তানের মধ্যে বীরত্ব সৃষ্টি করবে এবং সাহসী ও নির্ভীক হিসেবে গড়ে তুলবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শিক্ষা দিবে,

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী জালিমের সম্মুখে তারা যেনো নির্ভীক কণ্ঠে সত্য উচ্চারণ করতে পারে, এমন শিক্ষা দিবে। অন্যায়কে নীরবে সহ্য করার মতো কাপুরুষতা ও ভীরুতা যেনো তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়, এ ব্যাপারে পিতামাতা লক্ষ্য রাখবে। সন্তান যেনো বিলাসী ও আরাম প্রিয় না হয়, বরং কষ্ট সহিষ্ণু ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে যে কোনো বিপদ-মুসিবতের সম্মুখে দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পারে, সেই শিক্ষায় সন্তানকে গড়ে তুলবে।

অহঙ্কার বশে কাউকে অবজ্ঞা করোনা

হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলেন–

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا–اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ–

কখনো অহঙ্কার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীর বুকে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না, কারণ আল্লাহ আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান)

কোনো কোনো মুফাস্সীর এই আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ করেছেন, 'আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না।' কখনো অহঙ্কার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না। এই দুই অনুবাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। দুটো অনুবাদের সারমর্ম বা ভাবার্থ ও তাফসীর একই। হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে অহঙ্কার এবং উদ্ধত স্বভাব পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে উদ্ধত স্বভাব প্রথমে সৃষ্টি হয় না। মূলত অহঙ্কারই উদ্ধত স্বভাবের স্রষ্টা। অহঙ্কার ছাই চাপা আগুনের মতোই, অহঙ্কার যার হৃদয়ে লুকায়িত রয়েছে, তার স্বভাবে তা প্রকাশ পাবেই। মানুষের সামনে হাঁটা, চলা-ফেরা, ওঠা-বসা ও কথাবার্তায় অহঙ্কার তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সূরা লুকমানের ১৮ নং আয়াতে 'সা'আর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত উটের ঘাড়ে এমন এক রোগের সৃষ্টি হয়, যে রোগে উটের ঘাড়ের পেশীসমূহ আক্রান্ত হয়। ফলে উট তার ঘাড় সোজা রাখতে পারে না– একদিকে বাঁকা করে রাখে। অহঙ্কারী লোকগুলো নিজেদের ঘাড় রোগগ্রস্ত উটের মতোই বাঁকা করে বিষয়টি এমন নয়।

www.pathagar.com

ভদ্রতা ও নমনীয়তাকে 'সোজা বা সহজ-সরল' শিষ্টাচার হিসেবেই আবহমান কাল ধরে মানব সমাজ চিহ্নিত করে আসছে। আর অহঙ্কারকে 'বক্র বা বাঁকা' স্বভাব হিসেবেই নিন্দিত করে আসছে। আর কেউ যখন অন্য কাউকে ছোট জ্ঞান করে, অবজ্ঞা বা অবহেলার পাত্র মনে করে, তখন তার দিকে ভদ্রতা ও নমনীয়তার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে কথা বলে না, তার কথায় মনোযোগ দেয় না বা তাকে কোনো গুরুত্বই দেয় না। এই অর্থেই বলা হয়েছে, কাউকে অবজ্ঞা করে বা কারো দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না।

মানুষ যেসব কারণে অহঙ্কার নামক ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত হয়, তার কতকগুলো হলো, ধন-ঐশ্বর্য্য, রূপ-সৌন্দর্য, শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পদ ইত্যাদির কারণে। এসব জিনিস স্বয়ং খারাপ কোনো জিনিস নয়, বরং প্রশংসনীয় বস্তু এবং গুণ। কিন্তু মানুষ যখন এসব প্রশংসনীয় বস্তু ও গুণ-বৈশিষ্ট্য লাভ করে নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাবতে শুরু করে, তখনই সে মানুষ গৌরব আর অহঙ্কারের মতো নিন্দনীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে আর একেই বলে আত্মম্ভরিতা।

এই অহঙ্কারের ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো সর্বপ্রথম ইবলিস শয়তান। এই শয়তানই সর্বপ্রথমে নিজেকে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ অমান্য করেছিলো। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদমের সম্মুখে অবনত হওয়ার আদেশ দেয়ার পরে উপস্থিত ফেরেশ্তাগণ সে আদেশ তৎক্ষণাত মান্য করলো কিন্তু ইবলিস অমান্য করলো। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে প্রশ্ন করলেন–

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ–

আমি যখন অবনত হওয়ার আদেশ দিলাম, তখন কোন্ জিনিস তোমাকে আমার আদেশ পালনে বিরত রাখলো? (সূরা আ'রাফ-১২)

ইবলিস নিজের অন্তরে যে ভাব পোষণ করতো তাহলো, সে আদমের থেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। এই ভাব সে গোপন রাখলো না বরং এভাবে জানিয়ে দিলো–

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ–

আমি তার থেকে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে করেছো মাটি থেকে। (সূরা আ'রাফ-১২)

www.pathagar.com

'আমি তার থেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ' নিজের সম্পর্কে এই ধারণাই অহঙ্কার উৎপাদনের মূল কারখানা। তার তুলনায় আমি ধনী, আমার শক্তি-সামর্থ বেশী, রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারী, ক্ষমতার মসনদ আমার হাতে, আমি যা খুশী তাই করতে পারি। আমি অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেছি। অমুক অমুক ভাষায় আমি পারদর্শী, অমুক বিষয়ে সকলের তুলনায় আমিই শ্রেষ্ঠ, দেশের অধিকাংশ মানুষ আমার ভক্ত এবং সকলের ওপরে আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রিয়াশীল। এই মনোভাব এবং এর বাহ্যিক প্রকাশই শয়তানের গুণ এবং এই ঘৃণ্য গুণই মানুষকে অহঙ্কারী করে তোলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহঙ্কার সহ্য করেন না। ইবলিসের অহঙ্কারও তিনি বরদাস্ত করেননি। ইবলিসের কথা ও স্বভাবে অহঙ্কার প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ক্রোধান্বিত ভাষায় আদেশ দিয়েছিলেন–

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ–

বললেন, এখান থেকে তুই দুর হয়ে যা, তুই নিচে নেমে যা। এখানে অবস্থান করে অহঙ্কার আর গৌরব দেখানোর তোর কোনোই অধিকার নেই। বের হয়ে যা, তুই মূলত তাদেরই একজন যারা নিজেদের অপমান আর লাঞ্ছনাই কামনা করে। (সূরা আ'রাফ-১৩)

'তুই মূলত তাদেরই একজন যারা নিজেদের অপমান আর লাঞ্ছনাই কামনা করে' ইবলিসকে বলা মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই কথাটিই অহঙ্কার আর গৌরব প্রকাশের অশুভ পরিণতি কি হতে পারে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা যেসব অহঙ্কারী লোকের পদভারে প্রকম্পিত হয়েছে, তারা আজ কোথায়? দেহের অস্থি-মজ্জা গোস্ত ধূলি কণায় মিশে গিয়েছে। একান্ত প্রয়োজনে ইতিহাস তাদের নাম উচ্চারণ করলেও তা ঘৃণাভরেই উচ্চারণ করেছে।

কেউ বলেছে, আমরাই সর্বশক্তিমান, আমাদের তুলনায় আর কেউ শক্তিশালী নেই, আমরাই এই দেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা, আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করার কেউ নেই; মিসরের নদীসমূহ আমার আদেশেই প্রবাহিত হয়, আমিই জীবন-মৃত্যুর মালিক, আমার শক্তি এত বেশী যে, আমি তোমাদের বন্দী করে কারাগারে পচিয়ে মারবো। সারা দুনিয়ায় আমরা রাজত্ব করবো, অন্য সকলে হবে আমাদের আজ্ঞাবহ, দেশের সকল প্রতিষ্ঠান ও স্তরে একমাত্র আমার দলই কর্তৃত্ব করবে, দেশে একমাত্র আমার দলই সক্রিয় থাকবে অন্য কোনো দলের অস্তিত্ব সহ্য করা হবে না। সর্বত্র একমাত্র

www.pathagar.com

আমার কণ্ঠই উচ্চকিত হবে, অন্য কারো কণ্ঠ বরদাস্ত করা হবে না, আমার দেশের প্রয়োজনে পৃথিবীর যে কোনো দেশেই আমরা হামলা চালাবো– এ ধরনের দম্ভোক্তি ইতিহাস অতীতে যেমন বারবার শুনেছে, বর্তমানেও শুনছে।

দম্ভ আর অহঙ্কারী লোকদের করুণ পরিণতিও ইতিহাস বার বার দেখেছে। মূলত দম্ভ আর অহঙ্কারের শেষ গন্তব্য স্থল হলো অপমান আর লাঞ্ছনা। অহঙ্কারী লোকগুলো পরিশেষে অপমান আর লাঞ্ছনামূলক অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফেরাউনকে সলীল সমাধি বরণ করতে বাধ্য হতে হয়েছে। নমরুদকে জুতা পেটা খেয়ে লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রত্যেক যুগে যেসব ছোট বড় নমরুদ-ফেরাউন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গজিয়েছে, তারাও লাঞ্ছনামূলক জীবনে পৌঁছে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানেও যারা নমরুদ-ফেরাউনের অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে, তারাও অপমান আর লাঞ্ছনার দিকেই দ্রুত বেগে ধাবিত হচ্ছে।

অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাবই মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং মহাসত্য অনুধাবনে প্রত্যেক যুগেই প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। নবী-রাসূলদের সমকালীন ইতিহাসে দেখা যায়, পৃথিবীর যে এলাকাতেই নবী-রাসূলগণ দ্বীনি আন্দোলনের সূচনা করে সেদিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, সেই এলাকার অর্থ-বিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকগুলো তাঁদের সাথে সর্বপ্রথম বিরোধিতা করেছে।

কারণ তারা ধারণা করেছে, নবী-রাসূল হবে সমাজ বা দেশের সবথেকে অর্থ-বিত্তবান ও প্রভাবশালী ক্ষমতাবান লোকদের মধ্য থেকে কেউ একজন। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, যার কথা সকলে মানতে বাধ্য হবে এবং সকলেই তার অনুসরণ করবে।

বিষয়টি হয়েছে তার বিপরীত, কারণ দুই একজন ব্যতীত অধিকাংশ নবী-রাসূলকেই আল্লাহ তা'য়ালা চয়ন করেছেন সমাজের সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে। কেউ কৃষিনির্ভর ছিলেন, ছাগল চরিয়েছেন, কেউ কেউ নানা ধরনের হস্তশিল্পী ছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একেবারেই ইয়াতিম। এসব বাহ্যিক দরিদ্রতার কারণে অহঙ্কারী লোকগুলো তাঁদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বলেছে, 'আল্লাহ বুঝি নবী-রাসূল বানানোর মতো অন্য কোনো লোক খুঁজে পাননি, তোমাদের মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন দরিদ্র লোককে নবী বানিয়ে আমাদেরকে হিদায়াতের জন্য পাঠিয়েছে?'

www.pathagar.com

অহঙ্কার এভাবেই তাদেরকে সত্য গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করেছে। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর জাতিকে মহাসত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন সে জাতির অর্থ-বিত্তবান, প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকগুলো বিদ্রুপ করে তাঁকে বললো, ধন-দৌলত, জাঁক-জমক, দাস, দাসী, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী আমরা। নেতৃত্বের আসনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে। তোমার অর্থ-বিত্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই নেই। তুমি নিজেকে কিভাবে নবী বলে দাবী করো? তুমি কোন্ দিক থেকে আমাদের তুলনায় উন্নত? পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ–وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ–

আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ ব্যতীত আর তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের সমাজের কেবল দরিদ্র, প্রভাবহীন হীন-নীচ লোকগুলোই তো অজ্ঞতার কারণে তোমার আদর্শ গ্রহণ করেছে। আমরা তোমার মধ্যে এমন কোনো জিনিসই দেখতে পাচ্ছি না; যাতে করে তুমি আমাদের তুলনায় উন্নত হতে পারো? (সূরা হূদ-২৭)

হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর জাতির কাছে নিজেকে আল্লাহর নবী হিসেবে পরিচয় দিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন তখন সেই জাতির ধনী, প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল লোকগুলো নিজেদের জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির অহঙ্কার প্রকাশ করে বলেছিলো, তোমার তুলনায় আমরা অনেক বেশী বুঝি। তোমার কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান নেই, তুমি নির্বোধ। আল্লাহ তা'য়ালা বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন–

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ–

জাতির নেতৃবৃন্দ– যারা তাঁর আহ্বান মেনে নিতে অস্বীকার করছিলো, তারা বলেছিলো, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী। (সূরা আ'রাফ-৬৬)

www.pathagar.com

এভাবে প্রত্যেক নবী-রাসূলদের সম্মুখেই সমকালীন নেতৃবৃন্দ নিজেদের ধন-ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তির অহঙ্কার প্রদর্শন করে নিজেদেরকে মহাসত্য গ্রহণ করা থেকে দূরে রেখেছে। সুতরাং অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাবই যে, মানুষকে প্রকৃত সত্য জানা থেকে বিরত রাখে এবং আসল তত্ব ও তথ্য জানা-বুঝার ব্যাপারে অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাবই যে সবথেকে বড় বাধা, তা কোরআন এবং ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত সত্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে অহঙ্কার আর উদ্ধত স্বভাব অত্যন্ত ঘৃণিত গুণ এবং ঘৃণিত গুণ কোনোক্রমেই যেনো চরিত্রে বাসা বাঁধতে না পারে, এ জন্যই হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন, হে আমার সন্তান! কখনো অহঙ্কার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করোনা

অহঙ্কার সবথেকে ঘৃণিত গুণ

অহঙ্কারের মতো ঘৃণ্য গুণ যাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের মধ্যে এই চেতনা সব সময় সক্রিয় থাকে যে, আমিই সবদিক থেকে উত্তম বা বড় আর অন্যরা আমার থেকে অধম বা ছোট। অহঙ্কারের এই চেতনা মানুষের মধ্যে অন্যান্য খারাপ গুণাবলীর জন্ম দিয়ে থাকে। নিজেকে যারা বড় মনে করে, তারা স্বাভাবিকভাবেই এটা চায় যে, অন্যান্য সকল লোক তাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করুক, তার সম্মুখে অনুগত হয়ে বিনয়ী হয়ে থাকুক এবং সকলে একমাত্র তারই অঙ্গুলি হেলনে ওঠা-বসা করুক। অহঙ্কারী ব্যক্তি যখন এর ব্যতিক্রম দেখতে পায়, তখনই তার মধ্যে স্বৈরাচারী আর অত্যাচারীর মনোভাব সৃষ্টি হয়। যারা অহঙ্কারীর অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক নয়, অহঙ্কারী ব্যক্তি তখন তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করতে থাকে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও অন্যকে নিজের প্রতি অনুগত রাখার ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে।

একই অবস্থা অহঙ্কারী-দাম্ভিক শাসকদেরও, তারাও প্রতিপক্ষকে নানা কৌশলে নিজেদের অনুগত রাখার পন্থা অবলম্বন করে, কৌশল ব্যর্থ হলে শক্তিই হয় তাদের সর্বশেষ অস্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকবৃন্দও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেই দুর্বল দেশগুলোকে নিজেদের অনুগত রাখে। অহঙ্কারী-দাম্ভিক লোকরা পতনের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে ফলে পতনের পথ তাদের দৃষ্টি গোচর হয় না।

হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিস্ সালাম যখন অহঙ্কারী-দাম্ভিক ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে মহাসত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন তারাও অহঙ্কার প্রদর্শন

www.pathagar.com

করে বলেছিলো, আমরা এমন লোকদের কথা মেনে নিতে পারিনা, যে লোকরা আমাদের প্রজা, তারা হলো শাসিত আর আমরা শাসক। সুতরাং তাদের আর আমাদের মধ্যে অবস্থানগত ব্যবধান অনেক। আমরা শাসক শ্রেণী কখনো প্রজাসাধারণের কথা মেনে নিতে পারি না। ওদের কথা সত্য হলেও তা আমরা মানতে পারিনা, এটা আমাদের আত্মমর্যাদার ব্যাপার।

এই হলো অহঙ্কারী লোকদের মানসিক অবস্থা। অর্থ-বিত্ত, সম্মান-মর্যাদা, জনবল, শক্তি-সামর্থে যারা দুর্বল, তাদের কথা সত্য হলেও অহঙ্কারী লোক তা স্বীকার করে না অর্থাৎ অহঙ্কারই সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। ফেরাউন ও তার দলের লোকদের এই মানসিক অবস্থার বিষয়টি পবিত্র কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ–فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ–فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ–

তারা অহঙ্কার করলো এবং তারা ছিলো বড়ই আস্ফালনকারী। তারা বলতে লাগলো, আমরা কি আমাদেরই মতো দুইজন লোকের প্রতি ঈমান আনবো? আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস। এরপর তারা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করলো এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হলো। (সূরা মু'মিনুন-৪৬-৪৮)

অর্থাৎ অহঙ্কার অহঙ্কারী লোকদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, ধ্বংস গহ্বরের প্রান্তে পৌছার পরও তারা তা দেখতে পায় না। অবশেষে ধ্বংসের অতলান্তে তলিয়ে যায়। সমাজ ও দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এমনই দেখা যায় যে, সমাজের ধনী, প্রভাব, প্রতিপত্তিশালী লোকজন যে আদর্শেই বিশ্বাস করুক না কেনো, তারা চায় সমাজের সকল লোক তাদের আদর্শ অনুসরণ করুক। দেশের জনগণের চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসের সাথে মিল থাক বা না থাক, তারা শক্তির অহঙ্কারে যে কোনো আদর্শ জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। সমাজের দুর্বল শ্রেণী এবং দেশের অসহায় জনগণ আদালতে আখিরাতে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলবে–

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ–

দুর্বল ও অধীন হয়ে থাকা লোকজন অহঙ্কারী-দাম্ভিক লোকদেরকে কিয়ামতের দিন বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা তো অবশ্যই ঈমানদারদের দলে শামিল হতাম। (সূরা সাবা-৩১)

www.pathagar.com

মানুষ যদি নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করতো, তাহলে তার অহঙ্কার করার মতো যে কিছুই তার কাছে নেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যেতো। প্রথমে সে ছিলো এক বিন্দু অপবিত্র পানির মধ্যে অবস্থানকারী খালি চোখে দেখতে না পাওয়া ক্ষুদ্র একটি ভ্রূণ মাত্র। মাতৃগর্ভের এক পঙ্কিল সরোবরে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীতে সবথেকে অসহায় আর দুর্বল এক সত্তা হিসেবে এলো। অন্যের সাহায্য ব্যতীত মুহূর্তকাল সে অতিবাহিত করতে পারেনি। এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ সূরা কাহ্ফ-এ বলেছেন–

اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰكَ رَجُلاً–

তুমি সেই সত্তার বিধান অমান্য করছো যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন? (সূরা কাহ্ফ-৩৭)

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এসব পর্যায় অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করেন, সেই মানুষের পক্ষে অহঙ্কার শোভা পায় না। বিশেষ পদের অধিকারী লোককে দেখে তার অধীনস্থ লোকজন যদি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহলে বিশেষ পদের অধিকারী ব্যক্তির কোপানল তাদের ওপরে পতিত হয়। তাকে দেখলেই সম্মানার্থে দাঁড়াতে হবে এবং সালাম জানাতে হবে, এই মনোভাবের অধিকারী লোকদের লক্ষ্য করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি এ জন্য পুলক অনুভব করে যে, তাকে দেখে লোকজন সম্মানার্থে দাঁড়াবে, সে যেনো জাহান্নামে নিজের আশ্রয় স্থল বানিয়ে নেয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

শ্রদ্ধা আর ভক্তি মনের ব্যাপার, মন থেকে এটা আসে এবং যার প্রতি মনে শ্রদ্ধা আর ভক্তি জাগে, তাকে দেখলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু কারো মনোভাব যদি এমন থাকে যে, তাকে দেখলেই লোকদেরকে দাঁড়াতে হবে, তিনি কাউকে সালাম দিবেন না, সবাই তাকেই সালাম দিবে। ঐ ব্যক্তির এই মনোভাবই অহঙ্কারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট আর অহঙ্কারীর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নিকৃষ্ট পরিণতি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا–

আল্লাহ তা'য়ালা অহঙ্কারী-গৌরবকারী আত্ম শ্রেষ্ঠত্ব বোধে নিমজ্জিত লোকদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা নিসা-৩৬)

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহঙ্কার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন জানতে চাইলো, সবাই তো ইচ্ছা করে যে, তার পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক এবং পাদুকাও আকর্ষণীয় হোক। (এটাও কি অহঙ্কার?) আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহঙ্কার হলো, গর্বভরে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে হেয় বা ছোট জ্ঞান করা। (মুসলিম)

একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে বাম হাতে আহার করছিলো। তিনি লোকটিকে বললেন, ডান হাতে আহার করো। লোকটি (প্রকৃত সত্য গোপন করে) বললো, আমি পারছি না। আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি যেনো না পারো। অহঙ্কার ছিলো তার প্রতিবন্ধক এবং এরপর থেকে সে আর কখনো মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি। (মুসলিম)

হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে জানাবো না? তারা হলো, প্রত্যেক অহঙ্কারী, সীমালংঘনকারী, নিকৃষ্ট স্বভাবের ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক। (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে বিতর্ক হলো। জাহান্নাম বললো, অহঙ্কারী ও উদ্ধত প্রকৃতির যারা তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বললো, আমার মধ্যে প্রবেশ করবে ঐসব লোক, যারা দুর্বল মিসকীন ও অসহায়। আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিলেন, জান্নাত! তুমি আমার রহমত। যে বান্দার প্রতি আমি রহম করার ইচ্ছা করবো, তোমার দ্বারা আমি তার প্রতি রহম করবো। আর জাহান্নাম! তুমি আমার শাস্তি। যাকে আমি ইচ্ছা করবো, তোমার দ্বারা তাকে শাস্তি দেবো। তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। (মুসলিম)

অহঙ্কারী ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এতই ঘৃণা করেন যে, কিয়ামতের দিন তার দিকে তিনি ঘৃণায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। অহঙ্কার এবং শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই শোভনীয়– কারণ তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী। নিজেকে যারা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায় মেতে ওঠে, তারা যেনো মহান আল্লাহর জন্য যা প্রযোজ্য– তাতে অংশ নিতে চায়।

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন– সম্মান ও মাহাত্ম হচ্ছে আমার পাজামা এবং অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর। যে ব্যক্তি এই দুইটির কোনো একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষ ও বিবাদে লিপ্ত হবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো। (মুসলিম)

নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা প্রকাশ করে তারা যেনো মহান আল্লাহর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অহঙ্কার হলো মহান আল্লাহর চাদর আর কোনো মানুষ যখন অহঙ্কার করে, সে যেনো আল্লাহ তা'য়ালার চাদর ধরে টান দেয়।

সুতরাং এই ঘৃণ্য স্বভাব থেকে মুক্ত থেকে মহান আল্লাহর একজন বিনয়ী বান্দা হিসেবে নিজেকে গড়তে হবে। আর এ লক্ষ্যেই হযরত লুকমান তাঁর সন্তানকে অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ–

আল্লাহ তা'য়ালা সেই লোকদের পছন্দ করেন না যারা নিজেদেরকে খুব বড় একটা কিছু মনে করে এবং অহঙ্কার প্রকাশ করে। (সূরা হাদীদ-২৪)

পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না

উদ্ধতভাবে চলাফেরার মূলেও রয়েছে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারই মানুষকে উদ্ধত প্রকৃতিতে চলাফেরায় অনুপ্রাণিত করে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকজন! বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করো। কারণ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে ছোট মনে করে, কিন্তু লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান। আর যে ব্যক্তি গর্ব অহঙ্কার করে, সে লোকদের দৃষ্টিতে ছোট– যদিও সে নিজেকে বড় মনে করে। এমনকি সে তাদের কাছে কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট হয়ে থাকে।

প্রকৃত বিষয় হলো, মহান আল্লাহর গুণাবলীসহ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের প্রতি যে ঈমান আনে, সে ব্যক্তি হয় বিনয়ী– ঈমানদার হয় বিনম্র। তাঁর ব্যবহারে কখনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। কথায় এবং আচরণে অহংকারের ছোঁয়া থাকে না। মন-মানসিকতায় স্বৈরাচারী চিন্তাধারার উদ্রেক হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

www.pathagar.com

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا-

রহমানের প্রকৃত বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে। (সূরা ফুরকান-৬৩)

পূর্ণাঙ্গ তাওহীদের প্রতি যারা ঈমান এনে মহান আল্লাহর গোলামে পরিণত হয়, তারা কখনো অহঙ্কারের সাথে পৃথিবীতে বিচরণ করে না। তাদের চাল-চলনে ভদ্রতা ও নম্রতা প্রকাশ পায়। গর্বিত অহঙ্কারী-স্বৈরাচারী লোকের মতো নিজের হাঁটা-চলাফেরায় ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করে না। বরং এসব লোকের সার্বিক আচরণ হয় ভদ্র, মার্জিত ও প্রশংসিত স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরূপ।

এ কথা মনে রাখতে হবে, নম্রভাবে চলার অর্থ এটা নয় যে, রোগীর মতো দুর্বলভাবে চলাফেরা করতে হবে বা নিজেকে মুত্তাকী-পরহেযগার হিসেবে জাহির করার উদ্দেশ্যে চলাফেরায় কৃত্রিম বিনয় ফুটিয়ে চলাফেরা করতে হবে। প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে যে ভঙ্গিতে চলাফেরা করা হয়, তাকে আর যাই হোক, নম্রভাবে চলাফেরা করা বলা যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটা চলাফেরায় এমন শক্তভাবে পবিত্র কদম মোবারক ফেলতেন, মনে হতো তিনি ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন দেখতে পেলেন, একজন লোক মাথা হেঁট করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'মাথা উঁচু করে হাঁটো। ইসলাম রোগী নয়।' আরেক দিন তিনি দেখলেন, একজন লোক রোগীর মতো নিজেকে গুটিয়ে চলছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'ওহে জালিম! আমাদের জীবন ব্যবস্থাকে মেরে ফেলছো কেনো?'

পরহেযগারী বা মুত্তাকী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, চলাফেরার সময় রোগীর মতো আচরণ করতে হবে কোনো কারণ ছাড়াই নিজের চলাফেরায় ভিখারীর আচরণ প্রকাশ করতে হবে। ঈমানদার ব্যক্তি যদি এভাবে ভিখারীর মতো চলাফেরা করে, তাহলে ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারী লোকজন এই ধারণাই করবে, ইসলাম গ্রহণ করার পর মানুষের ব্যক্তিত্ব আর বীরত্ব মৃত্যুবরণ করে। মূল বিষয় হলো, চলাফেরা করতে হবে ভদ্র, নম্র, রুচি মার্জিত ভঙ্গিতে। যার মধ্যে সামান্যতম অহঙ্কার, দম্ভ, দুর্বলতা বা কৃত্রিম বিনয় থাকবে না।

ঈমানের আলো যার মধ্যে বিচ্ছুরিত হতে থাকে, স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে নম্রতার গুণ, বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ঈমানদার ব্যক্তির চাল-চলন হয় বিনম্রতার মাধুর্য মন্ডিত।

www.pathagar.com

অহংকারের পদভারে পাহাড়কে ধ্বসিয়ে দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا–

যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, খবরদার ! আমার যমীনের ওপরে অহংকারের পদভারে চলাফেরা করো না। তুমি এই যমীনকে পদাঘাতে ধ্বসিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না। তুমি ঐ পাহাড়ের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারো না। ক্ষমতাগর্বী ও অহঙ্কারী লোকদের মতো আচরণ করো না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মানুষের চলাফেরার মধ্যে এমনকি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাঁটা-চলাফেরা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন?

প্রকৃত বিষয় হলো, হাঁটা চলাফেরা মানুষের একটি বিশেষ ধরণ বা ভঙ্গির প্রকাশ নয়। হাঁটা, চলফেরার মধ্য দিয়ে একজন মানুষের মননশীলতা, তার মন-মানসিক অবস্থা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে। মনে যদি কোনো ব্যাপারে অস্থিরতা বা ব্যস্ততা সৃষ্টি হয়, তাহলে চলার ধরনে তা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। বর্তমানে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ চলার ধরণ দেখেও অপরাধীকে গ্রেফতার করে থাকে। রাস্তায় অসংখ্য লোক চলাফেরা করে। পুলিশ বিশেষ কাউকে থামতে বলে তার দেহ বা ব্যাগ তল্লাশী করে। ক্ষেত্র বিশেষে নিষিদ্ধ কোনো কিছু পেয়েও যায়। অর্থাৎ অপরাধীর চলার ধরনের সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ পরিচিত।

নারী, পুরুষ বা শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের হাঁটা চলাফেরায়ও বেশ পার্থক্য রয়েছে। একজন নম্র, ভদ্র ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের হাঁটা চলাফেরার ধরণ, সাহায্য প্রার্থী অভাবী লোকের চলাফেরার ধরন, চিন্তাক্লিষ্ট বা অস্থির চিত্তের লোকের চলাফেরার ধরন, চোর, ছিনতাইকারী, মাস্তান, ডাকাত গুন্ডা ও দুষ্কৃতি প্রকৃতির লোকের চলাফেরার ধরন, দাম্ভিক, অহঙ্কারী লোকের চলার ধরন, কবি, সাহিত্যিক, লেখক বা ভাবুক প্রকৃতির লোকের চলার ধরন, আবার শান্তশিষ্ট্য নম্র-ভদ্র লোকের চলাফেরার ধরণ অবশ্যই ভিন্ন হয়ে থাকে এবং হাঁটা চলাফেরার ধরনে কোন্ ধরনের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে তা অনুমান করা বিশেষ কষ্টকর নয়।

www.pathagar.com

ঠিক এ কারণেই ইসলাম হাঁটা চলাফেরার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে যে, একজন ঈমানদারের হাঁটা-চলার ধরন দেখেই যেনো অনুমান করা যায়, লোকটি ধৈর্যশীল, নম্র, ভদ্র, মানবিক সুকুমার বৃত্তির অধিকারী, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এই লোকের দ্বারা কারো কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

ঈমানদার ব্যক্তি যদি ধনাঢ্য হয়, বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয় তবুও তাঁর ভেতরে অহংকারের চিহ্নমাত্র থাকে না। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে, তাঁর এই সম্পদ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে এ সম্পদ-ঐশ্বর্য্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। বর্তমানে যিনি দেশের ধনীদের কাতারের একজন আছেন, দেশে-বিদেশে তাকে বিশিষ্ট নাগরিকের সম্মান-মর্যাদা দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে মুহূর্ত কাল পরেই তাকে কপর্দক শূন্য করে ভিখারীদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম।

মৃত্যু যদি এই মুহূর্তে তার দিকে হীমশীতল থাবা বিস্তার করে, তাহলে তার এই বিশাল সম্পদ মূহূর্তে অন্যের মালিকানায় চলে যাবে। এসব সম্পদ তাঁর কোনো কাজেই আসবে না। তাঁর কাছে যে ধন-সম্পদ রয়েছে, এসব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে কিছুই নয়। কারণ তাঁর সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে, ছিনতাই হতে পারে, খরচ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তা কখনও হারাবে না, ছিনতাই হবে না, বিনষ্ট হবে না, তিনি দান করেন, কিন্তু ফুরিয়ে যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَا–

আল্লাহ অভাবমুক্ত, তিনি সম্পদশালী এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী, অভাবী। (আল কোরআন)

আল্লাহ তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তাঁর ভান্ডার কখনও শূন্য হয় না। তাঁর সম্পদের ভান্ডার প্রতি মুহূর্ত পরিপূর্ণ। গোটা পৃথিবীবাসীকে তিনি এক মুহূর্তে অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী বানিয়ে দিতে সক্ষম। ঈমানদার তাঁর আশ্রয়স্থল মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখেন, এ কারণে অহংকারের পরিবর্তে তাঁর গোটা দেহ বিনম্রতার বর্মে আবৃত থাকে। তাঁর কথামালায় নম্রতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সম্পদের অহংকার সে করে না।

ঈমানদারের চেতনা এ ব্যাপারে শানিত থাকে যে, আল্লাহ যদি এই মুহূর্তে তাঁর দেহে এমন কোনো রোগ প্রবেশের নির্দেশ দেন, যে রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে তার

www.pathagar.com

অর্জিত ধন, সম্পদের এই বিশাল স্তূপ ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাবে, তবুও তিনি রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবেন না। আল্লাহর নির্দেশে তার মস্তিষ্কের একটি নার্ভ যদি একটির সাথে আরেকটি অর্থাৎ পরস্পরে জড়িয়ে যায়, তাহলে মুহূর্তে তার স্বাভাবিক চেতনা লোপ পাবে, ঘনিষ্ঠ মহল, পরিচিত মহলের কাছে তিনি উন্মাদ নামে আখ্যায়িত হবেন। ভোগ-বিলাসের উপকরণে সজ্জিত বিশাল বালাখানা থেকে তাকে বের করে পাগলা গারদে প্রেরণ করা হবে।

ঈমানদার ব্যক্তি শক্তির অহংকার করে না। কারণ সে জানে, আল্লাহর শক্তিই সবচেয়ে বেশী। কোনো মানুষের এ শক্তি নেই, সে আল্লাহর সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও চলে যাবে। যারা অহংকার করে, দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, শক্তিতে মদমত্ত হয়ে জাতির ওপরে জুলুম করে, তাদেরকে সাবধান করে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا–لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ–

হে জ্বিন ও মানুষ ! যদি তোমাদের এমন ক্ষমতা থাকে যে, তোমরা এই আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে যাবে, তাহলে চলে যাও। কিন্তু কোথায় যাবে, সমস্ত জায়গার সার্বভৌমত্ব আমার। (সূরা আর রাহ্‌মান)

যাবার স্থান কোথাও নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে, এই সৌর মন্ডলে দৃশ্যমান–অদৃশ্যমান যেখানে যা কিছুই রয়েছে, এসব কিছুর মহান অধিপতি হলেন আল্লাহ। এই অনুভূতি ঈমানদার বান্দার মন-মস্তিষ্কে সক্রিয় থাকে, এ জন্য মুমিন ব্যক্তি প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েও স্বৈরাচারী মনোভাব পোষণ করে না। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ তা'য়ালা দান করলে সে বারবার আল্লাহর দরবারে শোকর গুজার করতে থাকে।

দৈহিক শক্তির অধিকারী কোনো ব্যক্তি যখন ঈমান আনে তখন সে তাঁর শৌর্য-বীর্য শক্তির কারণে অহংকার করে না। কারণ সে জানে, তাঁর এই দৈহিক শক্তি যে কোন মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। আল্লাহর আদেশে তাঁর দেহের সমস্ত নার্ভগুলো অবশ হয়ে যেতে পারে। তাঁর চলৎশক্তি হারিয়ে যেতে পারে। তাঁর পূর্বে প্রচন্ড দৈহিক শক্তি দিয়ে বিভিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে। এভাবে ঈমান মানুষকে অহংকার মুক্ত করে তার স্বভাবে বিনয় ও নম্রতার আবরণে আচ্ছাদিত করে।

www.pathagar.com

ঈমানদার ব্যক্তি প্রখ্যাত জ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও সে জ্ঞানের অহংকার করে না। কারণ আল্লাহর কোরআনে সে পাঠ করেছে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার রয়ে গিয়েছে আল্লাহর কাছে। মানুষ সে–তার জ্ঞান পরিপূর্ণ নয় এবং নির্ভুলও নয়। যে সামান্য জ্ঞান সে অর্জন করেছে, মস্তিষ্কে কোনো ত্রুটি ঘটলে, স্মৃতিশক্তির কেন্দ্রস্থল বিকল হয়ে গেলে মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান তাকে সব সময় সঠিক তথ্য দান করবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁর জ্ঞান তাকে কোনো অজেয় ক্ষমতা দান করতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান তাকে চিরঞ্জীব করতে পারে না। জ্ঞানের মাধ্যমে সে রোগ-ব্যধি-জরাকে জয় করতে পারেনি। মহান আল্লাহই হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ঈমান এভাবেই মানুষকে তাঁর জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে অহংকারের আবর্জনা দূরিভূত করে বিনয় আর নম্রতার আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। ঈমান এনেছি, এ দাবি করার পরে যদি তার ভেতরে এসব গুণাবলীর সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বাতিলের মোকাবেলায় উত্তপ্ত ময়দানে টিকে থাকাও সম্ভব হয় না। চরিত্রে বিনয় এবং নম্রতা না থাকলে অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। আর নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করতে না পারলে ইসলামের দাওয়াতও কারো কাছে আকর্ষণীয়ভাবে পৌছানো যায় না।

অহঙ্কারের বিপরীতে বিনয় হলো এমনই এক সুন্দর গুণ যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিনয়ী ব্যক্তির সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন। তিনি পথ চলতে কোনো শিশু বা বালককে দেখলেও সর্বপ্রথমে সালাম দিতেন। তিনি মদীনার জীবনে যখন রাষ্ট্র প্রধানের পদে আসীন, এই আসনে আসীন থাকার পরও লোকদের বোঝা মাথায় উঠিয়ে দিয়েছেন। দাস-দাসী শ্রেণীর মানুষগুলোও তাঁর পবিত্র হাত ধরে নিজেদের কাজের জন্য নিয়ে যেতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না। বান্দার ক্ষমার গুণ দ্বারা আল্লাহ তার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করেন। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম)

সূরা লুকমানের ১৮ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা আত্মম্ভরী ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। একই কথা বলা হয়েছে, সূরা আন্ নাহ্লের ২২ নং

www.pathagar.com

আয়াতে। অহঙ্কারী লোকগুলো পৃথিবীতেও যেমন লাঞ্ছিত হয় এবং আখিরাতে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে ও চিরকাল তারা সেখানে অবস্থান করবে। পবিত্র কোরআন বলছে–

قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

বলা হবে, জাহান্নামের দরজার মধ্যে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহঙ্কারীদের জন্য এটা অত্যন্ত জঘন্য ঠিকানা। (সূরা যুমার-৭২)

অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা যাদের জন্য মহাসত্য গ্রহণ ও অনুসরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে–

ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ- اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا-فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

তোমাদের এই পরিণতির কারণ হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে মেতে ছিলে এবং সে জন্য নিজেদেরকে গর্বিত মনে করতে। এখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ করো। তোমাদেরকে চিরদিন সেখানেই থাকতে হবে। অহঙ্কারীদের জন্য তা অতীব জঘন্য স্থান। (সূরা মু'মিন-৭৫-৭৬)

অহঙ্কার শোভা পায় একমাত্র মহান আল্লাহর এবং অহঙ্কার একমাত্র মহান আল্লাহরই অধিকার। এই অধিকারে যে হস্তক্ষেপ করবে, তাকে অবশ্যই লাঞ্ছনামূলক আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কিয়ামতের দিনের পরিণতি সম্পর্কে বলছেন–

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ-

কোনো অধিকার ব্যতীতই তোমরা পৃথিবীতে যে অহঙ্কার প্রদর্শন করেছো এবং নাফরমানী করেছো সে কারণে আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে। (সূরা আহ্কাফ-২০)

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (অতীতে) একজন লোক মূল্যবান পোষাক পরিধান করে মাথায় সিঁথি কেটে ও চালচলনে অহঙ্কার আর দাম্ভিকতা প্রকাশ করে হেঁটে যাচ্ছিলো। এই অবস্থায় সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিলো। হঠাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাটির নিচে ডুবিয়ে দিলেন। এভাবে সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচের দিকেই যেতে থাকবে। (মুত্তাফিকুন আলাইহি)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বলেছেন, যার হৃদয়ে যে পরিমাণ অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা থাকে সেই পরিমাণ জ্ঞান কমে যায়।'

হযরত ইউনুস ইবনে উবায়েদ (রাহঃ) বলেন, সিজদা করার সাথে অহঙ্কার এবং তাওহীদের সাথে নিফাক বা কপটতা থাকতে পারে না। (ইবনে কাসীর)

আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা

হযরত লুকমান আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানকে সর্বশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাহলো–

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ –اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ–

হে পুত্র! পৃথিবীতে চলার সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, তোমার কণ্ঠস্বরকে নীচু করো। কেননা সব আওয়াজের মধ্যে নিকৃষ্টতম-অপ্রীতিকর আওয়াজ হচ্ছে গাধার। (সূরা লুকমান)

হাঁটা চলাফেরায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, ইতোপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে, আর এই মধ্যমপন্থা শুধুমাত্র চলাফেরায়ই নয়– জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অবলম্বন করতে হবে। নামায সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা পবিত্র কোরআন থেকে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা এই মুসলিম মিল্লাতকে একাধিকবার মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের বিধানসমূহও যাবতীয় ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করে নমনীয়তার সর্বশেষ পন্থাও নয় আবার চরমপন্থাও নয়– এ দুয়ের মাঝামাঝি মধ্যমপন্থা যা মানুষের জন্য অনুসরণ করা একান্তভাবেই সহজ, সেদিকেই পথনির্দেশনা দিয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন বেদান্ত দর্শনের কতিপয় দিক এমন রয়েছে যে, পরম স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনের জন্য মানবীয় কামনা-বাসনা, মানুষের স্বভাবগত চাহিদাকে হত্যা করে, পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোনো নির্জন জঙ্গলে বা পাহাড়ের গুহায় বসে সাধনা করতে হবে। অথবা বস্ত্রহীন হয়ে সারা দেহে ভস্ম মেখে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে সাধনা করতে হবে।

খৃষ্ট সম্প্রদায় এই সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নারীকে অছুৎ পরিগণিত করে তাদেরকে স্পর্শ না করার বিধান দিয়েছে। এমনকি নিজের মা'কেও স্পর্শ করা যাবে বলে ধারণা দিয়েছে।

বৌদ্ধ দর্শনেও স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জনে নিজেকে তিলে তিলে আত্মহত্যা করার বিধান দিয়েছে। যরথ্রুষ্ট দর্শনে ঋতুবতী নারীকে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করা থেকে দূরে থাকার বিধান দিয়েছে। এভাবে করে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল দর্শনে মানুষকে হয় চরমপন্থা অবলম্বনে নির্দেশ দিয়েছে, অথবা মানুষকে সম্পূর্ণ পশুর ন্যায় বল্গাহারা করে দিয়ে সকল নিয়ম-কানুন ও বাঁধন থেকে মুক্ত করে পশুস্তরে নামিয়ে দিয়েছে।

শুধুমাত্র ইসলামই মানুষের সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনের একাধিকবার বলা হয়েছে, 'আমি মানুষের জন্য এই কোরআনকে সহজ করেছি, আমার বিধানকে মানুষের জন্য সহজ করে দাও–কঠোর করো না। নবী-রাসূলকে বলা হয়েছে, আমি আপনাকে দারোগা করে প্রেরণ করিনি যে, মানুষ নির্দেশ মানতে না চাইলে আপনি তাদের প্রতি কঠোর হবেন। আমি আপনার মধ্যে নমনীয়তা প্রদান করেছি এই জন্য যে, মানুষ যেনো আপনার কোমল ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়।'

আল্লাহ তা'য়ালা যা হারাম করেছেন, তা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময়ের প্রয়োজনে এই মানুষের জন্যই হারাম বস্তু থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। যেমন কোনো মানুষ যদি গভীর জঙ্গল, নির্জন মরুপ্রান্তরে বা এমন কোনো অবস্থায় পতিত হয় যে, তার সম্মুখে মদ বা শুকরের গোস্ত রয়েছে। প্রাণ বাঁচানোর মতো অন্য কোনো খাদ্য যদি না থাকে বা যোগাড়ের কোনোই সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে ঐ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঐ পরিমাণ মদ বা শুকরের গোস্ত গ্রহণ করতে হবে, যে পরিমাণ গ্রহণ করলে প্রাণে রক্ষা পায়।

ঠিক একইভাবে মানুষের সার্বিক আচরণেও কল্যাণধর্মী মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকে চলাফেরার অনুমতি দেয়নি, যার মাধ্যমে

www.pathagar.com

অহঙ্কার, উদ্ধত, গর্বিত ভঙ্গি আর কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। আবার এ অনুমতিও দেয়নি যে, তার চলাফেরার মধ্যে দুর্বলতা, নীচুতা, দীনহীনতা বা রোগীর ভাব প্রকাশ পায়।

ঠিক এভাবেই কথা বলার মধ্যেও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের বোধগম্য নয় এমন অনুচ্চ স্বরে কথা বলা, এত দ্রুত শব্দসমূহ উচ্চারণ করা যা এক শব্দের সাথে আরেক শব্দ জড়িয়ে যায় এবং অন্যের জন্য বুঝতে অসুবিধা হয়, এমন উচ্চ শব্দে কথা বলা যা শ্রোতার জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে, এমন অঙ্গি-ভঙ্গিতে কথা বলা বা হাত, চোখ ও মুখের ভঙ্গি এমন করা যা শ্রোতার মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। এসব পদ্ধতি পরিহার করে নম্র, শান্ত, ভদ্র, শালিন, আকর্ষণীয় ভঙ্গি, শব্দসমূহ এমন স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা যা শ্রোতার বুঝতে কষ্ট হয় না এবং তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে– এমন ভাবে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে অনুচ্চ শব্দে বা উচ্চ আওয়াজে কথা বলার নির্দেশ সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুধাবন করে যেখানে যে নিয়ম সেখানে তাই অনুসরণ করতে হবে। কথা বলার সময় কথককে স্মরণ রাখতে হবে যে, কথার মধ্যে বাহুল্য কথা যেনো এসে না যায়, যা শ্রোতাকে বিরক্ত করে। একই শব্দ যেনো বার বার উচ্চারণ করা না হয়। ক্ষেত্র বিশেষে মুখে উচ্চারিত শব্দ বা কথার সাথে হাতের ভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই সংযোজন হয়।

এই ভঙ্গি সংযোজনের ক্ষেত্রেও কথককে সতর্ক থাকতে হবে। ভঙ্গি যেনো অশোভন না হয় এবং কথার সাথে হাতের ভঙ্গির সাদৃশ্য নেই– এদিকে কথককে সতর্ক থাকতে হবে। অস্পষ্ট বাক্য কথককে এড়িয়ে চলতে হবে। যা জানতে চাওয়া হবে অথবা যা বলা হবে, তা পরিপূর্ণ বাক্যে শেষ করতে হবে– যেনো শ্রোতা বুঝতে পারে তাকে কি বলা হলো বা কথক কি বললো।

কথার অর্ধেক মুখে উচ্চারণ করা হলো, আর অবশিষ্ট কথা ভঙ্গির মাধ্যমে বুঝানো হলো অথবা কথা শেষ না করে নিরব থাকা হলো। এই অভ্যাস পরিহার করতে হবে, তবে পরিবেশ যদি এমন থাকে যে, যেখানে পরিপূর্ণ বাক্যে কথা শেষ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে বা ভঙ্গির মাধ্যমে কোনো বিষয় প্রকাশ করাই নিরাপদ– সেখানে তা অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে এসবই পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।

কথককে মুদ্রাদোষ পরিহার করতে হবে। অনেকে কথার মধ্যে একাধিকবার একই শব্দ উচ্চারণ এবং অপ্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োগ করে থাকে। যেমন, 'সুতরাং, এবং, এ জন্য, কারণ, অতএব, ধরুন, মনে করুন, আপনার, ঠিক আছে, মানে হচ্ছে,

www.pathagar.com

তারপর, আর কি, বুঝলেন, বুঝেছেন, সর্বনাশ, সেই, ইয়ে, মানে হলো' ইত্যাদি ধরনের শব্দ কথার মধ্যে উচ্চারণ করতে থাকে এবং যত্রতত্র প্রয়োগ করে। ফলে শ্রোতা বিরক্তি বোধ করে এবং কথা শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

পিতামাতা বা অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে, সন্তানের মধ্যে যেনো কোনো দিকে কোনো খারাপ, অরুচিকর অভ্যাস সৃষ্টি না হয় এবং কথার মধ্যেও অপ্রীতিকর, শ্রুতিকটু শব্দ অথবা মুদ্রাদোষ জনিত কোনো শব্দ দেখা দিয়েছে কিনা। কথা বলার সময় সন্তান এমন কোনো ভঙ্গি অবলম্বন করছে কিনা, যা অমার্জিত অভদ্র এবং অশালীন। সাধারণত কিশোর, তরুণ ও যুবক বয়সেই এসব অভ্যাস সন্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং এই সময়ই সন্তানের প্রতি পিতামাতা বা অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

যে বাক্য যে ভাব প্রকাশ করে, কথকের বলার ধরনে তা অবশ্যই প্রকাশ পায় এবং এটাই স্বাভাবিক বাক্য রীতি। প্রশংসাসূচক বাক্য বিশেষ ভঙ্গিতে কথক প্রকাশ করে থাকে, স্নেহ-মমতা প্রকাশ বা সহানুভূতিসূচক কথামালা, ঘৃণা বা নিন্দা প্রকাশকসূচক কথা, অবজ্ঞাসূচক কথা, অবহেলা প্রদর্শনসূচক কথা অর্থাৎ কথায় যেখানে যে ভাব প্রকাশ পায়, কথকের চেহারা ও ভঙ্গিতেও তাই প্রকাশ পায় এবং এটাই স্বাভাবিক রীতি। ইসলাম এই রীতি নিষিদ্ধ করতে চায় না।

বরং আপত্তিকর বিষয় হলো, কথার মধ্যে অহঙ্কার প্রকাশ পাবে না, অন্যের মনে ভীতি সৃষ্টি করার মথো ভঙ্গিতে কথা বলবে না এবং অন্যের মনে আঘাত দেয়ার ভঙ্গিতে বা অপমানসূচক ভঙ্গিতেও কথা বলবে না। কথার ধরনে রুক্ষতা, কঠোরতা ও অবজ্ঞা-অহঙ্কারের ভাব যেনো প্রকাশ না পায়, সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে।

কথা বলার ধরনে অসৌজন্যতা প্রকাশ না পায় বা কথকের সম্মান-মর্যাদার হানী না হয় এবং কথক যেনো অন্যের কাছে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত না হয়। অন্যের কাছে কথকের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা যেনো বৃদ্ধি পায় সে ভঙ্গীতেই মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে কথককে কথা বলতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখে হাসি ফুটিয়ে কথা বলায় সাদকার সমান সওয়াব।

নিজেকে অসম্ভব রকমের গম্ভীর করে রাখাও যেমন অনুচিত তেমনি নিজের ব্যক্তিত্ব বিলিয়ে দিয়েও হাস্যকর ভঙ্গি অবলম্বনে কথা বলা অনুচিত। শামায়ের তিরমিযীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে কোন্ ভঙ্গি অবলম্বনে কথা বলতেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন,

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল তোমাদের অনুরূপ লাগাতার ও দ্রুত গতিতে কথা বলতেন না। বরং তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন এবং তাঁর কথার বিষয়বস্তু একটি থেকে অপরটি পৃথক হতো। এ কারণে কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি ভালোভাবে তা অনুধাবন করতে পারতো।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনানুসারে কোনো কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেনো শ্রোতামন্ডলী কথার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে।

সমাবেশ যদি বড় হতো বা বিষয়বস্তু কঠিন হলে তিনি ডানে-বামে ও সম্মুখে পবিত্র মুখমন্ডল শ্রোতাদের দিকে দিয়ে কথা বলতেন এবং কথার তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। যেনো শ্রোতামন্ডলী কথার তাৎপর্য অনুধাবন করে হৃদয়ে সংরক্ষিত করতে পারে।

তিনি এমন সারগর্ভ ভাষায় কথা বলতেন, যার মধ্যে শব্দ থাকতো কম এবং অর্থ থাকতো বেশী। মোল্লা আলী কারী (রাহঃ) কম কথার অধিক অর্থ– এ ধরনের চল্লিশটি হাদীস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা একটি থেকে আরেকটি পৃথক হতো এবং কোনো বাহুল্য বা ত্রুটিও থাকতো না এবং যে উদ্দেশ্য যা বলতেন তা অস্পষ্টও থাকতো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কারণে কোনো দিকে ইশারা করতেন, তখন সম্পূর্ণ হাত দিয়েই ইশারা করতেন। এ প্রসঙ্গে গবেষকগণ বলেছেন, শুধুমাত্র আঙ্গুলি দিয়ে ইশরা করা বিনয়ের পরিপন্থী অথবা তাঁর পবিত্র স্বভাব ছিলো আঙ্গুলি দিয়ে তিনি তাওহীদের প্রতি ইশারা করতেন। এ জন্য তিনি পবিত্র আঙ্গুলি দিয়ে অন্য কিছুর প্রতি ইশারা করতেন না।

তিনি যখন কারো প্রতি সন্তুষ্ট হতেন তখন তাঁর পবিত্র চেহারার ভঙ্গি এমন হতো যে, তিনি যেনো লজ্জা পেয়ে পবিত্র চোখ বন্ধ করেছেন। তাঁর পবিত্র হাসির সময় মনে হতো যেনো পূর্ণিমার পূর্ণশশী হঠাৎ করেই ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাসির সময় পবিত্র দাঁত মোবারক তেমন বিকশিত হতো না।

হঠাৎ যদি দেখাও যেতো, মনে হতো যেনো মুক্তার দানা সূর্যের কিরণচ্ছটায় ঝিকমিক করে উঠলো। অট্ট হাসি তিনি দিতেন না এবং পছন্দও করতেন না। কথা বলার সময় ক্ষেত্র বিশেষে তিনি পবিত্র হাত মোবারক নাড়তেন এবং কখনো ডান হাতের তালুকে বাম বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্য ভাগে রাখতেন।

www.pathagar.com

সুতরাং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকেই অনুসরণ করতে হবে। তিনি যেভাবে হাঁটতেন, যেভাবে কথা বলতেন, হাসতেন, কথা বলার সময় যে ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশ করতেন, তা অনুসরণ করতে হবে। আর এর মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সভ্যতা, ভদ্রতা, নমনীয়তা ও শিষ্টাচার।

উপদেশ কার্যকর করার পদ্ধতি

আমরা ইতোপূর্বে সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং সেখানে উল্লেখ করেছি, সন্তানকে আদর-ভালোবাসায় সিক্ত করে তাদের মন-মানসিকতায় ইসলামের শিক্ষা দৃঢ়মূল করে দিতে হবে। তাকে নমনীয়তা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিখাতে হবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন–যার পিতা ইন্তেকাল করেছে সে ইয়াতিম বটে, কিন্তু প্রকৃত ইয়াতিম হলো সেই ব্যক্তি যার মধ্যে জ্ঞান ও শিষ্টাচার অনুপস্থিত।

সন্তানকে আদর, ভালোবাসার সাথে শিক্ষা না দিয়ে শাসনের সাথে শিক্ষা দিলে তা তার মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করবে না। পিতামাতা বা অভিভাবক সন্তানকে সম্মান না দিলে সন্তান সম্মান দেয়ার শিক্ষা পাবে কোথায়? আল্লাহর রাসূল পিতামাতার প্রতি আদেশ দিয়েছেন, সন্তানকে সম্মান-মর্যাদা দেয়ার জন্য। তাদেরকে সম্মান করলে তারাও পিতামাতাকে সম্মান করবে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত লূকমান তাঁর সন্তানকে শুধুমাত্র হে আমার ছেলে, এভাবে সম্বোধন করেননি। তিনি সম্বোধন করেছেন, হে আমার প্রিয় সন্তান, হে আমার কলিজার টুকরা বা নয়নের মণি বলে। যেনো পিতার কথাগুলো সন্তানের মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা অনুভব করা যায় যে, তিনি তাঁর যে সন্তানকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিচ্ছিলেন, সেই সন্তান বয়সের ঐ প্রান্তে উপনীত হয়েছিলো, যে বয়স উপদেশ ধারণ করতে পারে। এ থেকে অনুমান করা যায়, তাঁর সন্তান ছিলো তরুণ বা যুবক।

যে উপদেশ সন্তানকে দেয়া হবে, তা যেনো সন্তানের মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে এবং সন্তান তা অনুসরণ করে, এই পদ্ধতি হযরত লূকমান অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মমতা সিক্ত ভাষায় এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে উপদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই পদ্ধতি কি তাঁর নিজের আবিষ্কৃত না মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর জ্ঞানের জগতে দান করেছিলেন?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নের জবাবও সূরা লুকমানের ঐ আয়াতে দেয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে– আমি লুকমানকে সুক্ষ্মজ্ঞানে ভূষিত করেছিলাম। অর্থাৎ মহাসত্যের দিকে দাওয়াত দেয়ার যে পদ্ধতি আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করেছেন, তিনিও সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবে এবং কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে উপদেশ দেবে। হতে পারে এ দুইজন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক পিতা-পুত্র, বড়ভাই-ছোট ভাই অথবা পরিচিত কেউ একজন। এই দুইজন মানুষকে যদি ইটের সাথে তুলনা করা যায়, তাহলে দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে এই দুটো শক্ত ইটকে একটির সাথে আরেকটি জুড়ে দিতে হবে।

অর্থাৎ যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন, তিনি যে আদর্শ অনুসরণ করছেন, যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তিনিও যেনো দাওয়াত দানকারীর আদর্শ অনুসরণ করেন। এভাবেই দুইজনকে একত্রিত করতে হবে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে তা করা সম্ভব?

দুটো ইটকে একত্রিত করতে হলে সিমেন্টের প্রয়োজন হয়। দুটো ইটকে পাশাপাশি রেখে এর মাঝখানে সিমেন্টের আবরণ দিলেই দুটো ইট পরস্পর জুড়ে যায়। অনুরূপভাবে দাওয়াত বা উপদেশের ভাষা ও ভাব হতে হবে মমতাসিক্ত। যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে বা উপদেশ দেয়া হচ্ছে, সে যেনো দাওয়াত গ্রহণ করে বা উপদেশ মেনে নিয়ে দাওয়াত দানকারীর- উপদেশ দানকারীর আদর্শের সাথে নিজের সম্পর্ক জুড়ে নেয়।

মহাসত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে। শ্রুতি মধুর ভাষায়, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে, সে পন্থাও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দেখিয়ে দিয়েছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ-

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রব-এর পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। (সূরা নাহল-১২৫)

যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, দাওয়াত দানকারী সর্বপ্রথমে তার মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি দেবেন। দাওয়াত দানকারীকে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। রোগী কোন্ রোগে আক্রান্ত, তা যদি ডাক্তার সঠিকভাবে বুঝতে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হন, তাহলে তার যাবতীয় চিকিৎসাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, কোন্ প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিলে সেই ব্যক্তি তার কথাগুলো চম্বুকের মতোই গ্রহণ করবে এবং তার ভেতরে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে। যারা ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে-তার সামনে শ্রোতাদের ধরন কেমন। তিনি কোন্ ধরনের শ্রোতাদের সামনে কথা বলছেন, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

শ্রোতা কোন্ ধরনের কথা ধারন করার উপযুক্ত, তার মন-মানসিকতা কথা শোনার অনুকূলে রয়েছে কিনা, তা অনুধাবন করে মহাসত্যের দাওয়াত দিতে হবে। মানুষ কেউ-ই সমস্যা মুক্ত নয়, সর্বোত্তম কথাও সমস্যার ভারে আক্রান্ত মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে কথা শুনতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তার মনে ভিন্ন চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। দাওয়াত দানকারীর কথার প্রতি সে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়।

দাওয়াত দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে। মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছে, রোগ যন্ত্রণায় অস্থির রয়েছে, জরুরী কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে কোথাও তার যাওয়া প্রয়োজন, এসব দিকে দৃষ্টি রেখে সঠিক সময় নির্ধারণ করে মহাসত্যের দাওয়াত পেশ করতে হবে। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় দাওয়াত দিলে তা কার্যকর হবে, সেই অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে জটিল কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বা কথা এড়িয়ে যেতে হবে। শ্রোতা যদি অনুভব করে যে, লোকটি তার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, তাহলে তার মনে দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।

সুতরাং এমন কোনো আচরণ বা কথা বলা যাবে না, যা শ্রোতাকে দাওয়াত গ্রহণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতা এ কথাই যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক। 'আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে পরিচালিত করার জন্য লোকটি আন্তরিকতার সাথেই আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, লোকটি সত্যিকার অর্থেই আমার কল্যাণকামী'–দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হলে দাওয়াতী কাজে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়।

www.pathagar.com

শ্রোতার ব্যক্তিত্বে, অহংবোধে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং বিষয়েরও অবতারণা করা যাবে না। দাওয়াত দেয়ার, বলার ও উপস্থাপনের ধরন হতে হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যেন শ্রোতা অতি সহজেই কথকের দিকে আকৃষ্ট হয়। এটা একটি সাধারণ বিষয় যে, মিষ্টভাষী ও বিনম্র লোকদের প্রতি অন্যান্য লোকজন সহজেই আকৃষ্ট হয়। মহাসত্যের দাওয়াত দানকারীকে এসব বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। শ্রোতা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্য সরাসরি আঘাত করা যাবে না। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে শ্রোতার মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, সত্যই তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। দাওয়াত দানকারী যখন এ কথা অনুভব করবেন, শ্রোতা অযথা বিতর্ক সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনই কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মহৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে অন্যের প্রতি প্রভাব বিস্তার করেছেন। একজন লোক তাঁর কাছে এসে জানালো, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি কিন্তু আমার একটি শর্ত রয়েছে। আল্লাহর রাসূল উক্ত ব্যক্তির শর্ত জানতে চাইলে সে জানালো, আপনি যা করতে আদেশ করবেন আমি তাই করবো। কিন্তু অন্য নারীর সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি আমাকে দিতে হবে।

একই কথা যদি পীর সাহেবের কাছে কোনো ব্যক্তি যদি এভাবে বলতো যে, আমি আপনার মুরীদ হতে পারি, কিন্তু আমাকে ব্যাভিচার করার অনুমতি দিতে হবে। তাহলে পীর সাহেব মুখ খোলার পূর্বেই উপস্থিত মুরীদরা ঐ ব্যক্তিকে দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করার সুযোগ দিতো না। কিন্তু মানবতার মহান শিক্ষক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্যতম বিরক্ত হলেন না বা উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহর রাসূলের অনুমতি ব্যতীত কোনো প্রতিবাদ করলেন না। নবীজী পরম মমতাভরে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, এই ঘৃণিত কাজে তোমার স্ত্রী, কন্যা, বোন বা গর্ভধারিণী মা যদি লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি কি তা সহ্য করবে?

লোকটি তৎক্ষণাত প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, অসম্ভব! এটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

নবীজী এবার বললেন– দেখো, তুমি যে কাজটি করার অনুমতি প্রার্থনা করছো, তা কোনো নারীর সাথে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেই নারীও তো কারো স্ত্রী, বোন, কন্যা বা মা। তাহলে তুমি নিজের স্ত্রী, কন্যা, বোন বা মায়ের জন্য যা খারাপ মনে করছো, তা অন্য কারো মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়ের জন্য কেনো ভালো মনে করছো?

www.pathagar.com

নবীজীর কথা শুনে লোকটি সাথে সাথে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে বললো– এই ধরনের চিন্তাও আমি আর নিজের মনে স্থান দেবো না।' এ কথা বলেই সে ইসলাম গ্রহণ করলো।

মদীনার একটি ঘটনা। সে সময় মদীনায় একটি নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন রয়েছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সাহাবায়ে কেরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় মসজিদে নববীর মধ্যে বসে রয়েছেন। এমন সময় একজন অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে প্রসাব করতে থাকলো। সাহাবায়ে কেরাম বাধা দিতে যাচ্ছেন, আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে নিবৃত্ত করে বললেন– লোকটিকে শুরু করা কাজটি শেষ করতে দাও। নতুবা তার শরীরিক অসুবিধা দেখা দেবে।

মসজিদে নববীর মধ্যে একজন অমুসলিম প্রসাব করছে, যাঁর পরিশ্রমে গড়া মসজিদ তিনি– আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য বীর কেশরী সাহাবায়ে কেরামও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং তাঁরা স্বচোক্ষে তা দেখছেন এবং পরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের দেশে অমুসলিম দূরে থাক, কোনো মুসলমানের নাবালেগ সন্তানও যদি মসজিদের বাইরের দেয়ালে প্রসাব করে, তা দেখে কি কেউ সহ্য করবে?

অমুসলিম লোকটির প্রসাব করা শেষ হলে লোকটিকে নবীজী কাছে ডাকলেন এবং একজন সাহাবাকে বললেন, পানি এনে প্রসাব পরিষ্কার করতে। লোকটি কাছে এলে নবীজী মমতার সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যেখানে প্রসাব করলে সে স্থানের পবিত্রতা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা রয়েছে? এই স্থান হলো মসজিদ– যেখানে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সিজ্‌দা দেয়া হয়। তোমার ধর্মীয় উপাসনালয়ে অন্য ধর্মের অনুসারী কোনো লোক যদি ঐ কাজ করতো, যা তুমি করেছো- তখন তোমার অনুভূতি কেমন হতো?

নবীজীর কথায় লোকটির মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব ঘটে গেলো। তার ভেতরের জগতটি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে চিন্তা করলো, সে যখন মসজিদের মধ্যে প্রসাব করছিলো, তখন নবীজীর পক্ষ থেকে মুখে কোনো আদেশ দেয়ার প্রয়োজনও ছিলো না। সামান্য একটু ইশারা দিলেই উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন তরবারীর আঘাতে তার দেহ থেকে মাথা পৃথক করে দিতো। কিন্তু তিনি তা না করে কি মধুর সম্ভাষণে তাকে বিষয়টি বুঝালেন।

www.pathagar.com

সুতরাং এই মানুষটি সাধারণ কোনো মানুষ নন– তিনি অবশ্যই আল্লাহর নবী। এই চিন্তার উদ্রেক হওয়ার সাথে সাথে লোকটি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। এভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অনুপম আদর্শ দিয়ে অন্য মানুষকে ইসলামের আদর্শে দিক্ষীত করেছেন। তিনি যখনই কোথাও দাওয়াতী কাজের জন্য লোক পাঠাতেন, তখন তিনি বলে দিতেন– মানুষের কাছে ইসলামকে সহজ-সরলভাবে তুলে ধরবে, কোনো বিষয় কঠিনভাবে উপস্থাপন করবে না। মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দ্বীনের পথে এনো, জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করে মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিও না।

তরুণ-যুবকদের জন্য সর্বোত্তম উপহার

সূরা লূকমানের এই তাফসীর অধ্যয়ন করে অন্তরে এ ধারণার স্থান দেয়ার অবকাশ নেই যে, হযরত লূকমান যেহেতু তাঁর পুত্র সন্তানকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, সুতরাং তা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই অনুসরণীয়– নারীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। আল্লাহর বিধান নারী-পুরুষ সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই প্রযোজ্য এবং হযরত লূকমানের উপদেশ আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে তা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় করেছেন।

তবে এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য যে, মানুষ কিশোর, তরুণ ও যুবক বয়সে যা কিছুই রপ্ত করে, তা অবশিষ্ট জীবনে অনুসরণ করে। এ জন্যই হযরত লূকমান আলাইহিস্ সালাম নিজের তরুণ সন্তানকে উল্লেখিত উপদেশসমূহ দিয়েছিলেন, যেনো তাঁর সন্তান অবশিষ্ট জীবনে এসবের অনুসরণ করে পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কারণ তরুণ ও যুবক জীবনই হলো মানুষের জীবনের স্বর্ণালী-বর্ণালী সময় এবং এই সময়ই জীবনের অবশিষ্ট জীবনের মূলভিত্তি।

বয়সের বিশেষ এক প্রান্তে পৌঁছে মানুষের পক্ষে কোনো অভ্যাস নিজের চরিত্রে রপ্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এ জন্য চরিত্রে যা কিছু উত্তম গুণের সমাবেশ ঘটানোর চমৎকার সময় হলো কৈশোর, তরুণ ও যৌবনকাল। এ সময়ে মনের শক্তি থাকে অপ্রতিরোধ্য এবং ইচ্ছারও দৃঢ়তা থাকে। হযরত লূকমান ঠিক উপযুক্ত সময়েই তাঁর সন্তানকে সঠিক উপদেশসমূহ দিয়েছিলেন। কারণ তরুণ ও যুবশক্তিই হলো জাতির মেরুদন্ড। দেহের মেরুদন্ড যদি সোজা থাকে তাহলে গোটা শরীরই সোজা থাকে। আর মেরুদন্ড যদি বাঁকা হয়ে যায় বা কোনো দূরারোগ্যে পচনশীল রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে সেই শরীর হয়ে যায় কর্মের অনুপোযোগী।

www.pathagar.com

হযরত লূকমান এই মেরুদন্ড সোজা রাখার লক্ষ্যেই তাঁর সন্তানের জন্য এমন এক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, যেনো জাতির মেরুদন্ড তরুণ-যুবশক্তি সঠিক পথে দৃঢ় থেকে গোটা জাতিকেই সফলতা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে তরুণ ও যুবশক্তিকে অত্যন্ত সচেতনভাবে অন্যায় আর অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কোনো উপাদান নেই, যে উপাদান তরুণ-যুবকদের সর্বোত্তম নৈতিক গুণসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে। একদিনে বস্তুবাদ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে তরুণ ও যুবশক্তি চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল ও নীতি-আদর্শ বিবর্জিত অবস্থায় গড়ে উঠছে, আরেক দিকে মানব রচিত মতবাদ-মতাদর্শের ধারক-বাহক ইসলামের শত্রুদের পদলেহী রাজনৈতিক শক্তিসমূহ তরুণ-যুবকদের হাতে তুলে দিচ্ছে অস্ত্র, নারী আর মাদকদ্রব্য।

ফলে গোটা তরুণ ও যুবসমাজ দ্রুত গতিতে এক ধ্বংস গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অস্থিরতা তাদেরকে অক্টোপাশের মতোই জড়িয়ে ধরেছে। নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টিতে অক্ষম এবং কর্ম বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শিক্ষাঙ্গন থেকে এক বিপুল সংখ্যক যুবশক্তি অস্থিরতা আর হতাশা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। জাতির জন্য এরা হয়ে পড়ছে বোঝা, ফলে তারা বাধ্য হয়েই চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস আর পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ যোগাড়ের অন্ধকার পথ বেছে নিচ্ছে।

তরুণ ও যুবশক্তি যেনো পথভ্রষ্ট হয়ে না পড়ে, এ জন্যই হযরত লূকমান তাঁর পুত্রকে উপলক্ষ্য করে সমকালীন যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক যুগের তরুণ ও যুবকদেরকে সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। তরুণ ও যুবকদেরকে যেমন তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের ওপর ছেড়েও দেয়া যাবে না, তেমনি তাদেরকে শাসনের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধও করা যাবে না। তাদেরকে গড়ার জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ স্নেহ-মায়া আর মমতার বাঁধনে জড়িয়ে সেই শিক্ষা দিতে হবে, যা অনুসরণ করলে তারা সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরুণ-যুবকদেরকেই সবথেকে বেশী ভালোবাসতেন। তারা যেনো পিতামাতা ও বড়দের সম্মান করে, এ সম্পর্কে তাকিদ দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার হক যেমন, ছোট ভাইদের উপর জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের হকও তেমন।

বড় ভাইকে পিতৃসমতুল্য সম্মান ও সেবা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং ছোট ভাইয়ের প্রতি পুত্রতুল্য স্নেহ করাও বড় ভাইয়ের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। তরুণ-যুবকদেরকে পরম মমতার দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তারা আবেগ-উচ্ছ্বাসের কারণে অথবা না

www.pathagar.com

জেনে ভুল-ত্রুটি করলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে না এবং সৎকাজে আদেশ দিবে না, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে না, সে ব্যক্তি আমাদের অনুগামী বা দলভূক্ত নয়। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো যুবক কোনো বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের জন্য সম্মান করলে আল্লাহ তা'য়ালা তার বার্ধক্যের সময় তার সম্মান ও সেবার জন্য লোক নিযুক্ত করে দিবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তা'য়ালাও তার প্রতি দয়া করেন না। (বোখারী, মুসলিম)

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা দয়ালু, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। পৃথিবীর লোকদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে আকাশ হতে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, অতএব, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানব সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (শুআবুল ঈমান)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি কাউকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার কোনো অভাব পূরণ করে দেয়, সে আমাকে সন্তুষ্ট করে এবং যে আমাকে সন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আর যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (শুআবুল ঈমান)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তির আবেদন শুনে তার সাহায্য করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ৭৩ টি ক্ষমা নির্ধারণ করেন। তার মধ্য হতে একটির দ্বারাই তার সমস্ত পাপ মুছে যায়। অবশিষ্ট ৭২ টি ক্ষমা দ্বারা কিয়ামতের দিন তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। (শোআবুল ঈমান)

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন প্রেমময়, প্রেমপূর্ণ পাত্রবিশেষ এবং যে ভালোবাসে না এবং যাকে ভালোবাসা হয় না অর্থাৎ যে অপরকেও ভালোবাসে না এবং তাকেও কেউ ভালোবাসে না, তার মধ্যে কিছু মাত্র মঙ্গল নেই। (আহমদ)

উল্লেখিত হাদীসসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন, এর প্রত্যেকটি শব্দ স্নেহ, মায়া আর মমতায় পরিপূর্ণ এবং তরুণ-যুবকদের চরিত্রে সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ

www.pathagar.com

ঘটানোর মতো মূল্যবান উপাদান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদার লোকদের লক্ষ্য করে বলছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا–

হে ঈমানদারগণ! তুমি স্বয়ং এবং তোমার পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (আল কোরআন)

হযরত লুকমান মহান আল্লাহর দেয়া এই দায়িত্বই পালন করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি। তাঁর এই উপদেশমালা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর তরুণ ও যুব সমাজের জন্য মূল্যবান মুক্তার মালা বিশেষ। যার প্রত্যেকটি দানার মধ্যেই রয়েছে অন্ধকার রাতে পথ দেখানোর মতো শুভ্র আলোকচ্ছটা।

নবীজী তরুণ-যুবকদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তিনি তরুণ-যুবকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তরুণ-যুবকদের কল্যাণকামী হওয়া সম্পর্কে নসিহত করছি, আদেশ দিচ্ছি। তাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে উদারতা দান করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছে তরুণ-যুবক সম্প্রদায়। আর দ্বীনি আন্দোলনে বয়োবৃদ্ধ শ্রেণী বাধার সৃষ্টি করেছে।

ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসও এ কথাই প্রমাণ করে যে, এই আন্দোলনে তরুণ-যুবকরাই তৎপর থেকেছে সবথেকে বেশী এবং তারাই ইসলামী আন্দোলন নামক বৃক্ষের গোড়ায় নিজের দেহের তপ্ত রক্ত সিঞ্চন করে এই আন্দোলনকে সতেজ-সজীব রেখেছে।

বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। রাসূলের যুগে সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করেও যারা দ্বীনি আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন তরুণ-যুবক। তরুণ-যুবকদের রক্তই হলো ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদ।

প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসূলদের সাথী হয়েছিলেন তরুণ-যুবক শ্রেণী। পবিত্র কোরআনের আস্হাবে কাহ্ফ- অর্থাৎ গুহার অধিবাসীদের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলো তরুণ-যুবক। নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য তাঁরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। সূরা কাহ্ফে উল্লেখ করা হয়েছে–

www.pathagar.com

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا-

যখন ক'জন যুবক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং তারা বললো, হে আমাদের রব! তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো। (সূরা কাহ্ফ-১০)

ইতিহাসে ইসলামের যেসব কুখ্যাত দুশমনদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই হলো বয়োবৃদ্ধ। আবু জাহিল, আবু লাহাব, ওৎবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনে খালফ্, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, রাবীআ' এসব লোক প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গিয়েছিলো।

আর আল্লাহর নবীর পবিত্র হাতে হাত রেখে যাঁরা নিজেদের তপ্ত রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, তাঁদের বয়স আট থেকে সাঁইত্রিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তরুণ-যুবকদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান-মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তরুণ সাহাবী হযরত জরীর আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর রাসূল কখনো আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে হাসি ফুটে উঠতো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোনো তরুণ-যুবককে আসতে দেখলেই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন, স্বাগতম হে যুবক! তুমি তো শুধু যুবকই নও, তুমি যেনো আল্লাহর রাসূলের চলমান উপদেশ আমার দিকে এগিয়ে আসছো। আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেনো তাঁর হাদীসসমূহ মুখস্থ করি এবং আমাদের মজলিসে যেনো যুবকদেরকে স্থান করে দেই।

অথচ বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। যুবকদেরকে সম্মান-মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। অবহেলা আর অবজ্ঞা যেনো তাদের ললাট-লিখনে পরিণত হয়েছে। তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই, তাদের কাজের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি কোনো কোনো মসজিদেও যুবকদেরকে সামনের কাতারে দাঁড়াতে দেয়া হয় না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের কতটা সম্মান-মর্যাদা দিতেন, একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল একটি সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সমাবেশে বসার স্থান ছিলো না। হযরত জারীর ইবনে বাজারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু– বয়সে

www.pathagar.com

সবেমাত্র তরুণ। অপূর্ব সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি যখন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য আগমন করতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সম্পর্কে এভাবে প্রশংসা করতেন যে, আমাদের মধ্যে চাঁদ উদিত হয়েছে।

তিনি সমাবেশে বসার স্থান পাননি, এ জন্য একদিকে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ আল্লাহর রাসূলের পবিত্র দৃষ্টি তাঁর এই তরুণ সাহাবীর প্রতি আট্‌কে গেলো। সৃষ্টিসমূহের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মহান আল্লাহর কাছে যাঁর সম্মান-মর্যাদা সবথেকে বেশী, সেই মহামানব সাধারণ একজন তরুণকে কত সম্মান-মর্যাদা দিলেন। তিনি বক্তৃতা থামিয়ে নিজের পবিত্র চাদর কাঁধ মোবারক থেকে নামিয়ে তরুণ সাহাবী হযরত জারীরের দিকে ছুড়ে দিলেন আর বললেন– জারীর! তুমি দাঁড়িয়ে কেনো, আমার চাদরের ওপর বসো।

হযরত জারীর দুই হাত বাড়িয়ে আল্লাহর রাসূলের চাদর নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বার বার সেই পবিত্র চাদরে চুমু দিতে লাগলেন। সুন্দর চোখ দুটো আনন্দ অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। কাঁদতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন– আকরামা কাল্লাহ্, কামা আকরাম তানি ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সম্মান-মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন। আপনি আমাকে সম্মান দিয়েছেন। আপনার চাদরে বসতে পারে এমন কি কেউ পৃথিবীতে আছে!

তরুণ-আর যুবকদের ত্যাগের বিনিময়েই এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তাওহীদের আওয়াজ পৌছেছে। অথচ বর্তমানে সেই মুসলিম তরুণ-যুবকদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ ছোঁয়াটুকুও বিদায় করে দেয়ার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী যেনো যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, পূজা-পার্বনের পদ্ধতিতে বেদীতে ফুল দেয়া, কোনো অনুষ্ঠান উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রদীপ জ্বালানো, মৃত ব্যক্তির মূর্তি বানিয়ে বা তার ছবির সামনে ফুল দেয়া, মৃতদেহকে ফুলে ফুলে সাজানো এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালানোর সংস্কৃতি চালু করেছে ধর্মনিরপেক্ষ মহল। অমুসলিমদের সংস্কৃতিতে মুসলিম তরুণ-যুবকদেরকে অভ্যস্থ করে তোলার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা।

অথচ এই তরুণ-যুবকরাই তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বয়সে যুবক– তিনিই মূর্তি ভাঙ্গার সংস্কৃতি চালু করলেন। কিন্তু তাঁর সন্তানদের দ্বারাই একশ্রেণীর বয়োবৃদ্ধ লোকজন মূর্তি সংস্কৃতি চালু করছে। তরুণ-যুবকদের এমন সভ্যতার দিকে

www.pathagar.com

সুকৌশলে এগিয়ে দিচ্ছে যে, তারা নিজের অজান্তেই তাওহীদের সীমারেখা অতিক্রম করে শির্কের পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) দুঃখ করে বলেছেন–

উন কো তাহজীব নে হার বন্দ ছে আযাদ কিয়া
লা কে কা'বে ছে সনম খানে মেঁ আবাদ কিয়া।

তাদের ঐ সভ্যতা-সংস্কৃতি মুসলমানদেরকে ইসলামের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। কা'বা ঘর থেকে বের করে এনে এদেরকে দিয়েই মূর্তির ঘরসমূহ আবাদ করা হচ্ছে।

হযরত লূকমানের উপদেশ মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এতই ব্যাপক যে, সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক, অসীম শক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত মানবমন্ডলীর তরুণ-যুবসমাজের জন্য একান্ত অনুসরণীয় করে দিয়েছেন। হযরত লূকমানের কথাগুলো যেন ছোট্ট একটি ঝিনুকের মধ্যে এক মহাসমুদ্র লুকায়িত থাকার মতো।

এ কথা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তরুণ ও যুবক বয়সে মানুষ যে চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যে অভ্যাস রপ্ত করে, তা-ই পরবর্তী জীবনে অনুসরণ করে। এ কারণেই হযরত লূকমান এই উপদেশের মাধ্যমে তাঁর তরুণ সন্তানের জীবনের ভিত্তি গড়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যেনো তার পরবর্তী জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বোত্তম গুণ, বৈশিষ্টসম্পন্ন এক সফল মানুষ হিসেবে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে আখিরাতের জীবনেও কল্যাণ লাভ করতে পারে।

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ যেসব বিধি-বিধানের সাথে পরিচিত হয়েছে, এর মধ্যে একমাত্র ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য জীবন বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো, অপরাধ সংঘটিত হবার পর তার শাস্তি বিধান করা। সেই সাথে এসব বিধান মানুষের অন্তর্নিহিত দুষ্প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়ার যাবতীয় পথও উন্মুক্ত করে দেয়।

অপরাধ সংঘটিত হবার পূর্বে অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার মতো কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না। কিন্তু একমাত্র ব্যতীক্রমধর্মী মহান আদর্শ হলো ইসলাম, যে যে ছিদ্র পথে অপরাধ অনুপ্রবেশ করতে পারে ও করার সুযোগ পায়, তার প্রত্যেকটিই বন্ধ করে দেয়ার বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলাম। মানুষের অভ্যন্তরে যে অপরাধ প্রবৃত্তি রয়েছে, তা দমন করে রাখার মতো অনুকূল পরিবেশও

www.pathagar.com

ইসলাম মানুষের জন্য সৃষ্টি করে। এরপরও যদি কোনো মানুষের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়, তার শাস্তি-বিধানও করে। ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেয়ার ওপর অথবা তার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণতর করে দেয়ার ওপর।

সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পাবার কারণে অথবা ভ্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে তরুণ ও যুবসমাজের দ্বারাই সর্বাধিক অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। তরুণ ও যুবকদেরকে আখিরাত ভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সর্বোত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষে পরিণত করা যায় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই তরুণ-যুবকদের দ্বারাই তিনি ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হযরত লুকমানও তাঁর সন্তানকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'মহান আল্লাহ তা'য়ালা আদালতে আখিরাতে সরিষা দানার থেকেও ক্ষুদ্র কিছু– কোনো মানুষের দ্বারা সংঘটিত হলে তা বের করে নিয়ে আসবেন।'

এই উপদেশের মাধ্যমে তিনি তরুণ-যুবকদের হৃদয়ে আখিরাতের ভীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। তরুণ-যুবকরা যেনো অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে এবং নিজেদের চিন্তা-চেতনার জগতকে অপরাধ-কল্পনা থেকে মুক্ত রাখে, সেদিকে ইশারা করেই নিজের সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি সবকিছুই অবগত আছেন।'

ইসলামের পরিপূর্ণ বিধান এই পৃথিবীর কোনো একটি মুসলিম দেশেও বাস্তবায়িত নেই। মাত্র কয়েকটি দেশে ইসলামের কিছু কিছু বিধি-বিধান চালু রয়েছে। এসব দেশের অপরাধ চিত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্যের দেশসমূহে প্রতি ঘন্টায় যে পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয়, সে তুলনায় এসব দেশে এক মাসেও সে পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয় না।

এর কারণ হলো, ইসলামের যে সামান্য প্রভাব এখন পর্যন্ত মুসলিম নামে পরিচিত লোকদের ওপরে কার্যকর রয়েছে, তা তাদেরকে অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে হযরত লুকমানের ন্যায় সন্তান-সন্ততিকে কোরআনের বিধান অনুযায়ী গড়ার মন-মানসিকতা দান করুন এবং তরুণ-যুবকদেরও কোরআনের রঙে নিজেদের রঙিন করে সমাজ ও জাতি গঠনে সর্বাত্মক ভূমিকা পালনের তাওফীক দান করুন।

www.pathagar.com

সন্তানের ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদকায়ে জারিয়া। আপনার কাজের সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি সুসন্তান রেখে যান, তাহলে ইন্তেকালের পরে আপনার আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানকে প্রশিক্ষণের অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে এ দায়িত্বের প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্য হলো, মুসলমানদের একটি পরিবারেও যেন সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করা না হয়। উদ্বুদ্ধ করণের সাথে সাথে তিনি এ ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন, যে সকল পিতামাতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

www.pathagar.com

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
www.pathagar.com